সাহিত্যসমালোচক বুদ্ধদেব বসু

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

রেখা চক্রবর্ত্তী

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং
২০০২

[redacted]

3 1 DEC 2003

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় বুদ্ধদেব বসু ঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য পরিবেশ	৩
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাক্ - বুদ্ধদেব বাংলা সমালোচনা	২৯
তৃতীয় অধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যতত্ত্ব	৪৫
চতুর্থ অধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পরিচয়	৭৬
পঞ্চম অধ্যায় বুদ্ধদেব বসু ও সমকালীন সমালোচক	২২২
উপসংহার	২৩৬
গ্রন্থপঞ্জী ও পত্রপত্রিকা	২৪০

ভূমিকা

' সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ' - এই শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভের পরিকলপনা করতে গিয়ে আমি মূলতঃ বুদ্ধদেবের সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার দর্শণকে এক বিশেষ শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর-ই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল এই প্রবন্ধগুলি। সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেবের আলোচনায় তত্ত্ব ও সমালোচনা দুই-ই প্রাসঙ্গিক । তাহলেও তিনি সাহিত্যতত্ত্বে পৃথকভাবে উৎসাহী ছিলেন না, শুধুমাত্র সমালোচনার প্রয়োজনেই সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাই, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তাঁর যে সাহিত্য ভাবনার পরিচয় পেয়েছি, তা এখানে সূত্রবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আলোচনার পরিসরে এসেছে তাঁর গ্রন্থবদ্ধ প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ - নিবন্ধ। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে হাতে পেয়েছি 'কবিতা'য় (১৯৩৫) প্রকাশিত তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ। এর আগে, হাতে লেখা 'প্রগতি' থেকে আরম্ভ করে ছাপা 'প্রগতি' বিভিন্ন সংখ্যাতে তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য গবেষনা সন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায় - 'বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য পরিবেশ ' - এখানে তাঁর ব্যক্তি - জীবন ও তাঁর সময়ের সাহিত্য পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছি। বিশেষতঃ কবি হিসাবে সাহিত্যিক জীবন শুরু করে কিভাবে অধুনিক কাব্য - আন্দোলনের পুরোধা হয়ে উঠলেন তিনি, সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় - ' প্রাক্ - বুদ্ধদেব বাংলা সমালোচনা' এখানে বাংলা সমালোচনার সূচনা থেকে মোহিতলাল পর্যন্ত সমালোচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনায় উঠে এসেছে। তৃতীয় অধ্যায় - 'বুদ্ধুদেব বসুর সাহিত্যতত্ত্ব'। এখানে তাঁর সাহিত্য চিন্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনটি সূত্রে সেগুলি সূত্রবদ্ধ - সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য , সমালোচক ও প্রকৃত সমালোচনা, কবিতা ও আধুনিকতা। এই আধুনিকতার ধারণাই তাঁর সমালোচনায় প্রযুক্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় 'বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার পরিচয় '- এখানে তাঁর সাহিত্য সমালোচনাকে বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণের মাধ্যমে এর বৈচিত্র্য দেখাতে চেয়েছি এবং বিশ্ব - যুদ্ধ পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবণতা হিসেবে আধুনিকতার যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তিনি চেষ্টা করেছেন, সেই বিশেষ মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়েছে, তাঁর সাহিত্য সমালোচনার প্রতিটি বর্গে। পঞ্চম অধ্যায় - 'বুদ্ধদেব বসু ও সমকালীন সমালোচক'। এখানে আছে বুদ্ধদেবের সমালোচনার সঙ্গে সমকালের অন্যান্য সমালোচক, বিশেষতঃ সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং জীবনানন্দের যে সামান্য কিছু লেখা ' কবিতার কথা ' য় পেয়েছি, তার প্রতিতুলনা। এখানেও সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেবের কৃতিত্বই উল্লেখযোগ্য।

এই গবেষণাসন্দর্ভ আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করেছি। তাঁর সহযোগিতা ও প্রেরণা ছাড়া একাজ সম্পন্ন হতো না। এই বিশ্ববদ্যলয়েরই প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ অশ্রু কুমার সিকদার মহাশয়ও বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পিনাকেশ সরকার মহাশয়, শ্রী স্বপন মজুমদার মহাশয় এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা বসুর কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করি। তাঁরই সুপারিশে আমি শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ মহাশয়ের কাছেও অনেক তথ্য পেয়েছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুমনা দাসের যথেষ্ট সহযোগিতা আমি পেয়েছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ ও শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের কর্মীবৃন্দ, বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত আশিষ হাজরা মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার মূল্যবান সংগ্রহ দেখতে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কোলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাহায্যও পেয়েছি। আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মলয় রঞ্জন সরকার মহাশয়কে এবং মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ও অন্যান্য কর্মীদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া, আমি আমার বাবা, মা এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার বাবা এবং ছোট্ট বোন শ্রীমতী রুনী চক্রবর্ত্তীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছাড়া একাজ আমার পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না । এছাড়া আমার বন্ধু শ্রী রঞ্জন রায়, ভগীরথ দাস, ডিব্রুগড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কুমকুম চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী মৌসুমী গোস্বামী আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এখানে মৌসুমীকে আমি পৃথকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি, আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথম অধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু ঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য পরিবেশ

কবি হিসাবেই সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন বুদ্ধদেব (১৯০৮-১৯৭৪)। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই লিখেছিলেন 'মর্মবাণী' (১৯২৩-২৪) নামের কাব্যগ্রন্থ। উৎসর্গ করেছিলেন দাদামশায়কে। অবশ্য, 'মর্মবাণী' মূলতঃ রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রতিধ্বনি। তাই কাব্য হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) - তেই তিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন নিজস্ব সৃষ্টি ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ কিশোর কবি বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে লিখেছিলেন

> কেবল কবিত্ব শক্তিমাত্র নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে,
> একদিন প্রকাশ পাবে।[১]

তিনি একথা 'মর্মবাণী' অথবা 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতা সম্পর্কে বলেন নি, বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়ে কিশোর বুদ্ধদেবের একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা হাতে পেয়ে।[২] এরপর দিলীপকুমার রায় কর্তৃক প্রেরিত বুদ্ধদেবের ছ'টি কবিতা একসঙ্গে পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হ'লো এ যেন একটি দ্বীপ।
> এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল, ফুল ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরল
> উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে একজাতীয় বেদনার উপনিবেশ।
> দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু - নিভৃত। হয়তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয়তো
> প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে 'তমালতালী - বনরাজিনীলা' তটরেখা।[৩]

কিশোর কবি বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকৃতি সত্য হয়ে উঠেছিলো। প্রথম জীবনে যিনি ছিলেন একক এবং স্বতন্ত্র, পরে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব, আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা।

। ১ ।

১৯০৮ সালের ৩০শে নভেম্বর বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়। জন্মের প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি মাতৃহারা হলেন। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু পত্নীশোকে বছর খানেকের জন্য 'পরিব্রজ্যা' গ্রহণ করলেন। ফলে, বুদ্ধদেব মাতামহ মাতামহীর কাছে আশ্রয় পেলেন। মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ এফ.এ. পাশ করে প্রথমে স্কুলে ও পরে পুলিশের চাকরী করতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের 'প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু ও ক্রীড়াসঙ্গী।'[৪] বুদ্ধদেবকে তিনি অল্পবয়সে স্কুলে ভর্তি করেননি। নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যেরকম যত্নে তিনি বুদ্ধদেবকে ইংরেজী শেখাতেন তার কোনো তুলনা হয় না। মাত্র সাত বছর বয়সের জন্মদিন থেকেই তিনি বুদ্ধদেবকে দিয়ে ইংরেজীতে রোজনামচা লেখাতে শুরু করেন।

ছয় থেকে আট বৎসরের মধ্যেই ইংরেজী কবিতার অফুরন্ত অনুরণন তাঁর কানে এসে লাগতো। একটু বড় হতে না হতেই দাদামশাই তাঁকে শার্লক হোম্‌সের কাহিনী শোনাতেন। শেকস্‌পীয়র থেকে কোনো কোনো দৃশ্য তাঁকে পড়াতেন। পোর্শিয়া শাইলক রজালিন্ড মিরান্ডার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় এই ভাবে। এই ভাবেই তাঁর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ডিকেন্স, বার্ণাডশ জন্মদিনে উপহার পেলেন তিনি। তাছাড়া 'প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা'[৫]র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তাঁর চোখের সামনে পাশ্চাত্ত্য জগৎ উন্মুক্ত হ'লো। দেশ-বিদেশ থেকে প্রভু চরণ তাঁকে পাঠাতেন প্রচুর পত্র-পত্রিকা ও নানা গ্রন্থ।

> পুরো পাশ্চাত্ত্য জগৎ, ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ,
> সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-জীবনযাত্রা, প্রাণবন্ত ভূগোল আমার
> চোখে-না-দেখা কিন্তু মনের মধ্যে বাস্তব হ'য়ে ওঠে । কত নদী
> নগর নর-নারী এই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন প্রভূচরণ, আমার
> চোদ্দ থেকে ষোলো বছরের মধ্যে, আমি যখন একটি চারা গাছের
> মতো মাটির তলা থেকে উদ্গত হচ্ছি, চাচ্ছি আমার সরু সরু
> ডালগুলোকে জগৎ জোড়া আকাশের দিকে তুলে ধরতে।[৬]

এই ভাবে তাঁর মনের মাটি পাশ্চাত্যের জীবনচিত্র রসেও ভরপুর হয়েছে। রমনার অধ্যাপক অপূর্ব কুমার চন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তিনি পড়েছেন আন্তন চেখহ্বের পত্রাবলি আর অল্ডাস হাক্‌সলির প্রথম উপন্যাস 'ক্রোম-ইয়েলো'।[৭] পরবর্তীকালে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেবের জীবনে তাঁর এই পাশ্চাত্য চর্চার সুগভীর ছাপ পড়েছিলো।

দাদামশায়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষায়ও হাতেখড়ি হয় বুদ্ধদেবের। তাঁর উৎসাহেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক ও কবিতা মুখস্থ করতেন। ছেলেবেলার এই সংস্কৃত শিক্ষা ছাড়াও স্কুলে-কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েছিলেন। সঙ্গীতের প্রতিও ছিলো তাঁর আগ্রহ। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন —

> দিদিমার পিতৃকুল সংগীতপ্রিয়, মেজো ভাই নগেন্দ্রনাথ
> ভালো হার্মোনিয়ম বাজান, তাঁর পাল্লায় পড়ে আমিও দু-একটা
> গৎ বাজাতে শিখে ফেলেছি।[৮]

শৈশব থেকেই বুদ্ধবেবের ব্যক্তিস্বভাব ও অর্ন্তচেতনার মধ্যে নৈঃসঙ্গ ও একাকীত্ব বাসা বেঁধেছিল। যৌথ পরিবারে বাস করলেও তিনি কখনোই যৌথ পরিবারের আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতেন না। দিন কাটতো নিরিবিলি, শব্দহীনভাবে।[৯] নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে, মাত্র নয় বছর বয়সে বুদ্ধদেব ছ-সাত স্ট্যান্‌জার একটি কবিতা লিখলেন ইংরেজীতে। জীবনের প্রথম কবিতাটি কেন তিনি ইংরেজীতে লিখলেন, তার কারণ জানাতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> আমার বয়স তখন নয় হবে বা কিছু বেশী, হেম, নবীন, মধুসূদনের সঙ্গে

চেনাশোনা হচ্ছে, আমি জানি এবং মানি এঁরা বড়ো কবি, 'মহাকবি'।
কিন্তু আসলে হয়তো অনেক বেশী ভালো লাগছে 'ওয়ান থাউজেন্ড
অ্যান্ড ওয়ান জেম্‌স অব ইংলিশ পোইট্রি' .... যার ছোটা ছোটো
অক্ষরে আমি প্রথম পড়েছিলাম ওঅর্ডস্বার্থ, কূপার, টমাস গ্রের এলিজি
এরিয়েল এর গান। আসলে আমার জীবনে তখনও রবীন্দ্রনাথের
আবির্ভাব হয়নি, শৈশবোত্তর বাংলা কবিতার অমৃতস্বাদ আমি পাইনি তখনও।[১০]

সেই প্রথম একটি ইংরেজী কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে কবিতার সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ গড়ে উঠলো, তার আর বিচ্ছেদ হয়নি কখনও। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

.... আমি কবিতাকে আর ছাড়তে পারলাম না, অথবা কবিতাই আর
নিস্তার দিলো না আমাকে-কিন্তু, এরপর থেকে যা-কিছু-লিখি সবই বাংলায়।[১১]

কেন বুদ্ধদেব ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় লিখতে শুরু করলেন তার কোনো কারণ তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। মাইকেলের মতো, তাঁকে কেউ এমন পরামর্শও দেননি যে, মাতৃভাষায় লিখলে তিনি খ্যাতিলাভ করবেন। এরপর তিনি ক্রমাগত লিখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন —

আমার চলন টলোমলো, ছন্দ ভাঙা-চোরা, ... কিন্তু ক্রমশ এই
ছেলে-মানুষি চেষ্টা আমাকে সুখ দিতে লাগলো, আমার কলম হয়ে
উঠলো দ্রুত সচল, ...।[১২]

যেন মনে হয় একজন কবির হ'য়ে-ওঠার ইতিহাস আছে তাঁর ছেলেবেলার এই অংশে। ততদিনে তিনি বিভিন্ন জায়গায় লেখা পাঠাতে শুরু করেছেন। অনেক লেখা ফেরৎ এসেছে। তার-ই মধ্যে একটি-দুটি ছাপাও হয়েছে।

বুদ্ধদেবের জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব এলো অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। একবার নোয়াখালির মেয়েদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব দাদামশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানেই প্রথম শুনলেন রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি, দেখলেন রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়। বুদ্ধদেব লিখেছেন,

আমার মনে লেগে রইলো সেই আবৃত্তি, সেই রচনা, 'জয়সেন'
ও 'করিছেন' শব্দের অসাধারণ মিল, 'চিত্ত,' 'তীর্থ', 'নিত্য'
প্রভৃতি সমস্বর শব্দের অনুরণন-মেয়েদের বলা ছন্দ, ভাষা,
অনুপ্রাস আমার মনে এক নতুন অদ্ভুত স্বাদ ছড়িয়ে দিল, আমি
স্পষ্টভাবে অনুভব করলাম যে,

'কৃতান্ত আমি রে তোর দুরন্ত রাবণি !
মাটি কাটি দংশে সর্পে আয়ুহীন জনে' ইত্যাদি

লাইনগুলো পড়ে শুনে বা নিজে আবৃত্তি করে ঠিক এরকম সুখ আমি
কখনো পাইনি।[১৩]

তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি প্রকাশ করেছেন বয়স বেড়ে যাওয়ার অনেক পরে। 'আমার ছেলেবেলা'র রচনাকাল ১৯৭২, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৭৩। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য কৈশোরের সেই টুকরো স্মৃতির অংশ, মনের গহনে উঁকি দিয়েছে কখনো কখনো। পরবর্তীকালে একজন পরিণত কবি ও কবিতার সমালোচক বুদ্ধদেবের সমালোচক সত্তার উন্মেষ পর্বের বীজ সন্ধান করা যায় এইসব টুকরো স্মৃতির খণ্ডে। রবীন্দ্র-কবিতার শব্দবন্ধ, সমস্বর শব্দের অনুরণণ এই বয়সে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যও অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে ঐ সময়েই। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যতটা অভিভূত করেছিলো, তার পরিচয় আছে আরেকটি রচনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চয়নিকা' শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'লে, বুদ্ধদেব লিখেছেন

> সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম, নবীন,
> মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্ক-পাঠ্য বাংলা কবিতা আমি
> পড়েছিলাম তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝরে পড়ে গেলো।[১৪]

এগারো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাসী' তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেখানে প্রতিমাসে বেরোতো। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বই ছেলেবেলায় ঝড়ের মতো তাঁর মনের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের গদ্য বইয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি পড়েছেন 'ছিন্নপত্র'। ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেলে যখন বুদ্ধদেব বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরছেন, তখনো তাঁরা একসঙ্গে আবৃত্তি করতেন 'ক্ষণিকা', 'অভ্র আবীর', 'বিদায় আরতি'। বুদ্ধদেবের নিজের বক্তব্য —

> পুরানা পল্টন ঃ রাতের অন্ধকারে মশারির তলায় শুয়ে আমি
> পাগলের মতো আউড়ে যাচ্ছি 'পুরবী' থেকে কবিতার
> পর কবিতা।[১৫]

এভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজগতে অবাধ বিচরণ আস্বাদন ও সম্ভোগে মগ্ন হতেন বুদ্ধদেব।

> তারপর থেকে সারাজীবন জুড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক আশ্চর্য
> সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বুদ্ধদেবের।[১৬]

এই সম্পর্কের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁদের পারস্পরিক চিঠিপত্রে, বুদ্ধদেবের নানা নিবন্ধে ও বিশেষতঃ 'সব পেয়েছির দেশে' বইটিতে।

কিশোর বয়সেই সাহিত্য বিষয়ক বিচিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ণ করেছেন তিনি। তাঁর পাঠ-তালিকায় একদিকে ছিলো ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসিক, রোমান্টিক গ্রন্থাবলী, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের গ্রন্থাবলী, সমকালীন মার্কিন কবিতা। অন্যদিকে ছিলো সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা, সর্বোপরি ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি-সম্ভার।

> তাঁর অন্তর্চৈতন্যে ইতোমধ্যেই স্থায়ী ছাপ ফেলেছে ইউরোপীয়
> ভাবাদর্শ, সাহিত্যবোধ ও রোমান্টিক বোধ-ব্যাকুলতা এবং ভারত পুরান।[১৭]

জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তা এই সময় থেকেই তৈরি হচ্ছে ঃ

> সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখা। শেষের দিন পর্যন্ত
> এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অপরিবর্তিত ছিল .... ।[১৮]

আধুনিক ও প্রাক্-আধুনিক বাংলা কবিতার রীতি-প্রকৃতি বিষয়েও তিনি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

> রবীন্দ্রনাথের অমোঘ প্রভাব এবং ইউরোপীয় ভাবাদর্শের
> টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে তিনি নতুন কাব্যাদর্শের সন্ধানে
> ব্যাপৃত হন।[১৯]

। ২ ।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কাব্যসাধনা শুরু করলেও বুদ্ধদেব বুঝতে পেরেছিলেন 'গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।'[২০] পাঁচ বছরের ব্যবধানে লেখা তাঁর 'বন্দীর বন্দনা'র (১৯৩০) কবিতাগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ প্রশংশা করেছিলেন

> এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের
> আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।[২১]

কবি হিসেবে বুদ্ধদেব প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ প্রেমের কবি। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে শুরু করে 'নতুন পাতা' পর্যন্ত তাঁর আবেগ সংবেদনা মূলতঃ প্রেমকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) থেকে 'শীতের প্রার্থনার বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায়ও প্রেম উপজীব্য। শেষ পর্যায়ে, প্রেমের কবিতা সংখ্যায় অল্প। বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন 'দেহবাদী সম্ভোগ সংরাগ'।[২২] প্রেমকে তিনি পূর্বতন রোমান্টিক কবিদের মতো অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবে দেখেননি, দেখেছেন মূর্ত শরীরী রূপে। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইন্দ্রিয় ঘনতার অভাব, তাঁর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মানবিক বৃত্তির পরিবর্তে দেবসুলভ সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে বেশি। আবু-সয়ীদ আইয়ুব লিখেছেন -

> He was (Buddhadev Bose) amongst the first to have
> become poetically aware of the lack of sensuous element
> in the love poems of Tagore - magnificantly beautiful
> through they are, but with a beauty that is more angelic
> than human.[২৩]

বুদ্ধদেবের প্রেম-কাব্যের নায়িকা ভাবলোকবাসী মানস সুন্দরী নয়, বাসনা-মদির রক্ত মাংসের মানবী। 'প্রেমের সাধারণ মানবিক তথা ইন্দ্রিয়ঘন (Sensuous) রূপকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন'[২৪] তিনি। আর, এই জন্য ' গোল করে তোলা ঠোঁট', 'জীভের লাল আভা', 'ছোটো শাদা দাঁত', - এই অতি সাধারণ চলতি বাংলা কথাগুলির প্রয়োগে কবি এক রোমাঞ্চকর ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশ রচনা করেছেন।[২৫]

তোমার গলার স্বর, ছেঁড়া ছাড়া কথার টুকরো, তোমার
চোখের আলো, গোল করে তোলা ঠোঁট দুটি, একটু জিভের
আভা, লাল আভা ! ছোটো শাদা দাঁত চকিতের বিদ্যুৎ ঝলক ![২৬]

- এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে কবিতায়।

পূর্বতন রোমান্টিক কবিরা শাশ্বত প্রেমে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব চেয়েছেন রোমান্টিকতার শোধন। তাই, নিজেকে তিনি 'দুর্মরভাবে রোমান্টিক' বললেও প্রথাগত রোমান্টিক প্রেমের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রেমকে তিনি বিশ্লেষণ করেন। জীবনের এই মৌল চেতনাকে অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু এর ক্ষণিকত্ব সম্পর্কে সচেতন কবি।

আমাদের ক্ষণিক মিলন -
মিথ্যা দিয়ে, মোহ দিয়ে তাহারে করেছি চিরন্তন।
অমর করেছি তারে।[২৭]

প্রেমের এই ধারণা - অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক মহিমান্বিতও নয়। এরই সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে মানুষের মনোগত লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, হীনতা, দৈন্য ও কুশ্রীতা।

আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরন্ময় প্রেম পাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দ নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা - ।[২৮]

প্রেমের সুন্দর ও কল্যাণকর রূপের বদলে বাসনা-কামনা-লিপ্ত দেহজ প্রেমের প্রকাশ বুদ্ধদেবের প্রথম পর্যায়ের প্রেম-কবিতা গুলির বৈশিষ্ট্য। এই পর্যায়ের প্রেম-কাব্যগুলিতে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক ইন্দ্রিয়বাদী কবি। অবশ্য শুধু মাত্র দেহজ প্রেমের কামনা-বাসনা মদিরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাননি কবি। কবি-আত্মার দ্বন্দ্ব ও মুক্তি-স্পৃহা রূপায়িত হয়েছে 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাতেই।

বিধাতা জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষায়
শুষ্ক হয়ে আছে তবু।[২৯]

কামনা-বাসনা প্রভৃতি জৈব বৃত্তিগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও কবি অমৃতাভিলাষী। সুন্দরের জন্য তিনিও নিরন্তর উৎসুক। বেদনা ও বিক্ষোভে কবি উচ্চারণ করেছেন -

সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ভেঙ্গে দিয়ে যায়।[৩০]

সমর সেনের কবিতা-আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে প্রেরণা আমাদের মনে
সবচেয়ে প্রবল ছিলো, আজ যদি তার কোনো নাম দিতে হয়, সেটাকে
সৌন্দর্যানুভূতি বলা যেতে পারে। সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে
যত বাধা, যত প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, একদিকে
মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা -
এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর
অভিসম্পাত। .... আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম, তার মূলে
এই কথাটাই ছিলো।[৩১]

বিধাতার দেওয়া কামনা-বাসনা-ক্লেদ-পঙ্কিলতার মধ্যেই তিনি 'স্বপ্ন-সুধা' সঞ্চারিত করে প্রেমের মূর্তি গড়ে নিতে চান।

তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রিসম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।[৩২]

প্রেমে উত্তরণের পর্যায়টি 'প্রেম ও প্রাণ' নামক সনেটেও চমৎকার রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কামনা বাসনার মধ্যে দিয়েই প্রেমে উত্তরিত হয়ে বুদ্ধদেব বুঝে নিয়েছেন —

ওগো প্রেম মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা,
মণীষায় লভ্য জ্ঞান তুমি তার চরম সীমানা।[৩৩]

বুদ্ধদেবের প্রেম কবিতার পরিপ্রেক্ষিত ভূমির পরিবর্তন ঘটেছে 'কঙ্কাবতী' কাব্যে। প্রেম কবিতার রোমান্টিক উপাদানকে চিরায়ত লোক পুরাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এখানে। দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন,

যন্ত্রযুগের চাপে শ্বাসরুদ্ধ সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনে আবেগ
সঞ্চারের জন্য কবিকে যেতে হচ্ছে পৃথিবী পরিক্রমায়।
বর্তমান থেকে সুদূর অতীত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের
কবিকর্ম থেকে তিলে তিলে সৌন্দর্য প্রেরণা আহরণ করে
গড়েতে হবে আধুনিক কাব্যের তিলোত্তমা। 'কঙ্কাবতী' হল
এই তিলোত্তমা।[৩৪]

অবশ্য এমন মনে করাও স্বাভাবিক যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের আর্থ-বাণিজ্যিক সংকটের বিরূপ অভিঘাত-স্পৃষ্ট এবং মধ্যবিত্তের হতাশা ক্লান্তি নৈরাশ্য এবং ক্রূর সময় থেকে মুক্তি-প্রত্যাশী কবি-চিত্ত রোমান্টিক বিশ্বকাব্য ঐতিহ্যে আশ্রয় নিয়েছে।[৩৫] অর্থাৎ দেহ চেতনার দ্বারা রোমান্টিক প্রেমকে ভাঙাতো গেলই না, বুদ্ধদেব যেন হয়ে পড়লেন আরো গভীরতরভাবে রোমান্টিক।

তিরিশের দশক থেকে যেসব আধুনিক কবি পৌরাণিক ভাবনাকে সফলভাবে কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা অনেকেই পাশ্চাত্ত্য গ্রীক-রোমান মিথের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধদেব আকৃষ্ট হয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্যময় পুরান প্রসঙ্গে। 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৭) 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) ইত্যাদি

ছাড়াও ১৯৪৮ সালে যখন 'দ্রৌপদীর শাড়ি' প্রকাশিত হ'লো তখন থেকে এই প্রবণতা দেখা দিল বিশেষভাবে। অবশ্য পাশ্চাত্য পুরাণের ঢেউও তাঁর চেতনার তটে পৌঁছে ছিল। এই সব পৌরাণিক কাহিনীর বিচিত্র উপাদান তাঁর কাব্য-চেতনা ও ব্যক্তিক অনুভূতির কাছে ভিন্ন অর্থে ধরা দিয়েছে। ভারতীয় পুরাণ কথাকে তিনি বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো সমকালীন জীবনাদর্শ ও সামাজিক মনকে বিশ্লেষণ করা। অর্জুন, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, উলুপী, সুভদ্রা, সীতা, সাবিত্রী, চিত্রাঙ্গদা, হনুমান প্রভৃতি চরিত্রের সুপ্রাচীন ঘটনাবলী চুম্বকের মত কবিতায় এসেছে, অথচ তার মধ্যে ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যে স্পষ্ট হয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান সময় সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয়, পৌরুষহীনতা, পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত মানসিকতা, স্মৃতিমুখরতা, কাম ও প্রেম উপভোগের পরের অতৃপ্তিবোধ।

বুদ্ধদেবের কবি-প্রতিভার আর এক দিক হল তাঁর প্রকৃতি চেতনা। ঢাকার উদার প্রকৃতি, পুরাণা-পল্টনের বিশাল প্রান্তর ও বনভূমি তাঁর কবি সত্তার উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে। বুদ্ধদেব লিখেছেন—

কত রাত্রে আসতে আসতে ডানদিকের সবুজ বনরেখার উপরে
লাল হয়ে চাঁদ উঠতে দেখেছি, আর আমার মন কবিতার রসে
আপ্লুত হয়ে গেছে।[৩৬]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন —

হঠাৎ এক টুকরো পাৎলা মেঘ এসে চাঁদের খানিকটা ঢেকে ফেললো
যেটুকু বেরিয়ে রইলো, রক্তিম দীপশিখার মতো জ্বলছে। চাঁদ,
আমি মনে মনে বললুম, তোমার ঐ শিখা থেকে আমি জ্বালিয়ে
নিলুম আমার মন, সে আগুন নিববে না।[৩৭]

প্রকৃতি এখানে বুদ্ধদেবের কবি-প্রতিভাকে প্রাণিত করেছে, সৃষ্টি কর্মের সহায়ক হয়ে উঠেছে। উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি কবির মনোভাবের বাহন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য, শুধুমাত্র প্রকৃতি চিত্র হিসেবে প্রকৃতির ব্যবহার তাঁর কবিতায় তেমন নেই। কখনো প্রকৃতি এসেছে দেহজ কামনার রূপক হিসেবে, কখনো বা এসেছে তাঁরই প্রেম স্বপ্নের উদ্বোধক হিসেবে -

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থ যাত্রীদলে
সহসা বন্যায়।[৩৮]

অথবা প্রকৃতি যখন প্রেম-স্বপ্নের উদ্বোধক —

তুমি এখানে কখনো যদি আসবে, মেয়ে,
শোনো, আসবে কখন ঃ
যবে আঁধার নামবে শাদা আকাশ ছেয়ে,

কালো আঁধার নামবে লাল আকাশ ছেয়ে,
যাবে সন্ধ্যাতারার মুখ থাকবে চেয়ে
মোর মুখের পানে
নির্ নিমেষ নয়ন -
যবে জাগবে রাতের হাওয়া উতল গানে —
তুমি আসবে তখন।[৩৯]

নিসর্গ এখানে বর্ণিত হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-স্বপ্নের প্রতিবেশ রচনার জন্য। আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব 'প্রকৃতি বিরোধী' কবি।

> বিশ্বজগৎ থেকে, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহ করেন কবিরা, কিন্তু
> বোদলেয়ারের ডান্ডিজমের দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধদেব প্রকৃতি-বিরোধী।
> কবিকে তিনি মনে করেন প্রকৃতির প্রতিপক্ষ।[৪০]

এমনও মনে করা যায় যে, বোদলেয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হবার পরই বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতি বিরোধী হয়ে পড়েন। কেননা, বোদলেয়ার উনিশ শতকী রোমান্টিকতার যেমন বিরোধী তেমনি প্রকৃতিরও বিরোধী। তাঁর সাধনা —

> প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের, অর্থাৎ শিল্পের, অর্থাৎ চেতনার।[৪১]

বুদ্ধদেবের নিজেরও বক্তব্য —

> ... মানুষ প্রকৃতিচ্যুত, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিদ্রাময় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন,
> তার চৈতন্যের প্রভাবে সে যা কিছু হতে চায়, হতে পারে, এবং
> কখনো কখনো হয়েও থাকে, তার সমস্তটাই প্রকৃতির বিরোধী।
> উনিশ শতকী কবিদের মধ্যে এই কথাটি সবচেয়ে তীব্রভাবে উপলব্ধি
> ও উচ্চারণ করেন বোদলেয়ার।[৪২]

তাঁর আরেকটি বক্তব্য —

> যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি তার মধ্যে উনিশ শতকের অবদান
> প্রচুর - তার একটি মূল সূত্র হ'লো, ... প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরুদ্ধতা।[৪৩]

'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে তীক্ষ্ণ চৈতন্যে শান দিয়েছেন তিনি। এ পর্যায়ে ফুল-পাখি-অরণ্য-পর্বত প্রভৃতি নিসর্গ দৃশ্যও তাঁর কবিতায় অস্বীকৃত। প্রকৃতি তাঁকে কিছুই দিতে পারে না -

> প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে।
> ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায় - ঘাস, মাটি, পুকুর আকাশ,
> ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস,
> ডুবে যা নিরভিমান, একতাল বিশ্বস্ত নির্বেদে।[৪৪]

এই সময় থেকে তাঁর ধারণা, কবিতা হল প্রখর চৈতন্যের ফসল। যে কাব্যভুবন তিনি নির্মাণ করেন সেখানে প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ। 'মরচে পড়া পেরেকের গান' - এও বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে যে, - যাকে সুন্দর বলা যায় তাও নেই প্রকৃতিতে, সৌন্দর্য কবিরই সৃষ্টি, কবিই তা প্রকৃতিতে আরোপ করেন। মোহিনী প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কবি স্বয়ং রচনা করেন - সৌন্দর্য ও প্রেমের কাব্য ভুবন।

.... আকাঙক্ষার পশ্চাদ্ধাবনে
মত্ত হয়ে ভোলা যায় লোলজিহ্ব হন্তা প্রকৃতির
প্রতারণা - মোহিনী ও মনোহীনা যিনি, প্রেরণায়
আদিম, অপরাজেয়। কিন্তু আমি তাঁকেও ছাড়িয়ে
সৃষ্টি করি সৌন্দর্য এবং প্রেম, অহংসর্বস্ব
এক অন্য বিশ্ব গড়ে তুলি, বায়বীয় ধারণার
উপাদানে।[৪৫]

অবশ্য কখনো কখনো ভাবনা দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়েছেন কবি।

কখনো ভেবেছি শিল্পী প্রকৃতির প্রতিযোগী, তার সব অভাব মেটান,
কিন্তু যদি প্রতিভাও প্রাণের প্রকাশমাত্র, আর প্রাণ শরীর নির্ভর,
তাহ'লে কবিতা, ছবি, কিছু নেই প্রকৃতির অধীন যা নয়।[৪৬]

তাহলেও সেই ভাবনা দ্বন্দ্বে স্থিত হন নি কবি। আসলে, প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধদেব প্রকৃতি-প্রেমিক, প্রথাগত রোমান্টিক ভাবের কবি। পরে তিনিই প্রকৃতি বিরোধী, মানব চৈতন্যের মহিমায় আস্থাশীল।

আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হ'ল বিচ্ছিন্নতা বা Alienation। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা, নৈঃসঙ্গ্য, একাকিত্ব , হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ রূপায়িত হয়েছে আধুনিক কবিতায়। এই চেতনা বুদ্ধদেবের কবি-মানসিকতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব সংকট সম্পর্কে সচেতন তিনি। সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্বের যন্ত্রণা রূপ লাভ করেছে তাঁর রচনায়। সমাজ-সংঘ-বিচ্ছিন্ন এই মনোভঙ্গি আধুনিক সাহিত্যেরই লক্ষণ। সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় সমাজ ও সমষ্টি বিচ্ছিন্ন একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-সত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। জীবনানন্দ দাশ প্রথম দিকে নিঃসঙ্গ বোধের ফলে নিমজ্জিত হয়েছেন অতীত ইতিহাস ও ধূসর ঐতিহ্যলোকে।[৪৭] বিষ্ণু দে সমষ্টি চেতনায় বিশ্বাসী। তবু তাঁর কবিতায়ও বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু আকৈশোর নিঃসঙ্গ। কবি জীবনের প্রথম থেকেই তিনি সমাজ, রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর কবি জীবনের দীর্ঘ ত্রিশ বছর বাংলা তথা ভারতবর্ষের পটভূমিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুহুর্মুহু কম্পিত হয়েছে। তবুও কবি রাজনীতি প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন। এজন্য, তাঁকে কেউ কেউ 'এস্কেপিস্ট বা জীবন পলাতক অপবাদ দিয়েছিলেন।'[৪৮] আত্মপক্ষ সমর্থন করে বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন—

আমি যদি কবি হই, তাহলে কবি হিসেবে আমার কর্ত্তব্য
ভালো কবিতা লেখা তাছাড়া কিছু নয়, জীবনের সঙ্গে

সেই আমার যোগসূত্র। আমি যদি বাণিজ্য কি রাজনীতি সম্বন্ধে
মূঢ় হই, ... তাহলে ক্ষতি কি ? আমি বরং বলবো, ভালো
কবিতা লেখবার জন্য যে রকম জীবন আমার নিজের পক্ষে
সবচেয়ে অনুকূল বলে জানি, আমি চাইবো আমার জীবনকে
সে-ভাবেই গড়তে, সেটা এস্কেপিজম নয়, সেটা শুভবুদ্ধি।[৪৯]

বুদ্ধদেবের সমগ্র সাহিত্য জীবনে এই ধারণার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাছাড়া 'দময়ন্তী'র উৎসর্গ' পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব তাঁর নিজের মানস প্রকৃতি বিধৃত করেছেন 'সমর সেন স্মরণীয়েষু' কবিতায় —

দর্শন দুর্গম অতি, রাজনীতি কর্কশ জটিল
ক্লান্ত প্রাণ ঘুরে মরে বিতর্কের গোলক ধাঁধায়,

. . .

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত,
সংঘহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।[৫০]

- 'সংঘহীন সংজ্ঞাতীত' এই একক নিঃসঙ্গ জীবনে বুদ্ধদেব অবিরত সৃষ্টিশীল কবি। আমেরিকার পিটাসবার্গে অবস্থান কালে শীতরাত্রির নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'। এই কবিতাটির রচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন -

আর, এমনি একটি রাত্রে আমার নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ ও
নির্যাতনকারী শীতের মধ্য থেকে, অতর্কিতে একটি 'শীতরাত্রির
প্রার্থনা' বেরিয়ে এসেছিলো।[৫১]

'যে আঁধার আলোর অধিক'- এও কবি বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এবং একক -

শুধু স্বপ্ন শুনে শুনে একতাল ঋতুহীন সমুদ্রের স্বর -
নিঃসঙ্গতা ! জেনেছি তোমারই নাম শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বৎসর।[৫২]

'মরচে-পড়া পেরেকের গান' এর নাম কবিতাটিতেও 'মিথকল্পের পৌরাণিক প্রচ্ছদে'[৫৩] বুদ্ধদেব রূপায়িত করেছেন আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা। বিরূপ বিশ্বে জড়বাদী সভ্যতায় একজন অনুভূতিশীল চৈতণ্যবান কবি-শিল্পীর স্থান কোথায় এই সমস্যা বুদ্ধদেবকে একজন বোদলেয়ার, একজন ইয়েটস্ বা একজন এলিয়টের মতোই কাতর করেছে।[৫৪] 'অন্যপ্রভু' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

আমি কবি ! শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত .... নির্বাসিত
... অন্ন শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে ?[৫৫]

যুদ্ধোত্তর কালের অনেক কবি শিল্পীর মতোই বুদ্ধদেবের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতাবোধ।[৫৬]

মৃত্যু বিষয়ে সংবেদনাও বুদ্ধদেবের কবি-মানসিকতার অন্তর্গত। তাঁর প্রিয় প্রতীচ্য কবি বোদলেয়ার, রিলকে এবং প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের রচনায় মৃত্যু সম্পর্কে গভীর চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

> বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের রচনায় মৃত্যু সম্পর্কে কোনো গাঢ় চেতনার প্রকাশ ঘটেনি। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তাঁর রচনায় ধীরে ধীরে মৃত্যু ভাবনা দানা বেঁধে উঠেছে। .... শেষ পর্যায়ের রচনায় বুদ্ধদেব বসু চেষ্টা করেছেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার, পুনর্বার ফিরে এসেছেন জন্মান্তর ধারণায়। জন্মান্তর ধারণাকে সামনে রেখেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন মৃত্যুকে।[৫৭]

জন্মান্তর ধারণায় বিশ্বাসী কবি লিখেছেন —

> এক জন্ম শেষ করে আরেক জন্মের আগে -
> আর কিছু নয় - শুধু চিন্তারে বিছাই
> দিনের টেবিলে আর রাতের লেপের তলে।[৫৮]

অথবা 'স্বাগত-বিদায়ে'র 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর সেতুবন্ধন রচিত হল —

> .... আমারই মধ্যে এই এক মুহূর্তে ও প্রতি মুহূর্তেই
> এক শিশু এখনো জীবন লিপ্সু, এক যুবা এখনো ধরায় চুল্লি হৃদপিণ্ডে,
> এক বৃদ্ধ হামাগুড়ি দিয়ে চলে অন্তিম শয্যার দিকে।
> যেন প্রতি মুহূর্তেই জন্ম আর মৃত্যুর সন্ধির লগ্ন,
> ঊনষাট বৎসর ধরে সেই এক মুহূর্তে পুনরাবৃত্ত -
> এক মৃত্যু, যুগপৎ নতুন জীবন।[৫৯]

বুদ্ধদেবের কবিতা আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত।

> অন্তর্চৈতন্যে উপলব্ধ স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা ও ক্ষত, বেদনা ও অচরিতার্থতা, এবং অস্তিত্ববোধ ও অস্তিত্বসংকট তাঁর কবিতায় শিল্পরূপ পেয়েছে।[৬০]

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতকেও জীবনের প্রধান সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই আধুনিক মনোভাবের সচেতন ও নির্ভীক প্রকাশ প্রথম রূপ নিয়েছিল 'বন্দীর বন্দনায়।'[৬১] সেখানে তিনি জানিয়েছেন —

> অলস আবেশে মোরা জীবনেরে দেখিনি মধুর,

ললাটে ঝরিছে স্বেদ-তারই স্বাদ মোদের অধরে,
হৃদয়ে দুঃখের যজ্ঞ-তারই জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে সে মেদুর।[৬২]

এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক হয়েছেন আধুনিকরা। বুদ্ধদেব স্পষ্ট উচ্চারণে তা ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রভাব-জগতের সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনা আর নয়, কবির রক্তব্য —

সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গন।[৬৩]

রোমান্টিক কবিরা ব্যক্তিক অনুভূতির প্রাধান্য দিলেও কবির 'সত্য-শিব-সুন্দর' সন্ধানী এক সত্তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যকে তাঁরা বৃহৎ অর্থে সমাজের মঙ্গল সাধনের সঙ্গে একীকৃত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিকেরা ব্যক্তিত্ত্বের আরো গভীরে অবতরণ করলেন, সেখানে সমাজ, সত্য, মঙ্গল প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে জেগে রইল শুধু এক আত্মা।[৬৪] বুদ্ধদেবের অন্তর্চৈতন্য -

বহির্বাস্তব বিশ্ব ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সূত্রে
আবদ্ধ নয়। .... সামাজিক রাজনৈতিক কল্যাণ চিন্তায় পরিকীর্ণ নয়
তাঁর কবিতা।[৬৫]

তাঁর কবিতায় এসেছে ইন্দ্রিয় চেতনা, প্রকৃতি-বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা (Alienation), কবির নিজস্ব চৈতন্য-মেধা-মনন-অনুভূতি ও আবেগ-সংবেদনার মাধ্যমে কবির আত্ম-আবিষ্কার।

..... তবু জেনো তুমি যাকে বলো -
সুন্দর, তা নেই ব্যাপ্ত বহুরূপী পঞ্চভূতে, নেই
চিত্রল উদ্ভিদে, কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণ সমারোহে
আছে শুধু আমারই অহমিকায়।[৬৬]

-অথবা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির বক্তব্য —

.... আমি হীন বিশ্ব নেই, চরাচরে আমিই বিম্বিতঃ
প্রকৃতি ও কাল শুধু নটনটী, আমি নাট্যকার,
এবং দ্রষ্টাও আমি - যতক্ষণ শেষে বজ্রপাতে
বিলুপ্ত নাহয় সত্তা, মহাবিশ্ব, আর ভগবান।[৬৭]

আধুনিক কবির এই 'আত্ম'ই আধুনিক শিল্পসার ঃ শুদ্ধ সৌন্দর্যরূপে উপস্থিত কবির ব্যক্তিত্ব যা তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।[৬৮]

। ৩ ।

চিরাগত রোমান্টিক কাব্যের ধারণায় একটা বিপ্লব অবশ্য ইতোপূর্বেই দেখা দিয়েছিলো। জীবনের অখণ্ডতা ও স্থিতিবোধ প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাতেই খণ্ডিত হয়েছে। কালপ্রভাবে পূর্বতন ধারণার জগতেও

31 DEC 2003

পরিবর্তন এসেছে। বিচলিত হয়েছে পূর্বতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। কবির মনোভূমিতেও দেখা দিয়েছে পরিবর্তন। এরই মধ্যে অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১) প্রমুখ কবি চিরাগত 'সৌন্দর্যচেতনা ও নিসর্গের নিষ্কুণ্ঠ রূপায়ণে, অতি তরল রোমান্টিক চেতনায় এবং অবয়ব-বিমুখ ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম চেতনার সঙ্গে একাত্ম'[৬৯] হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা মূলতঃ রাবীন্দ্রিক কাব্য-কৌশল ও কাব্যিক প্রাসাধনেরই অনুবর্তন করেছেন। সেই সময় রবীন্দ্র বলয় থেকে বাইরে বেরিয়ে কাব্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন তিন কবি - মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রোত্তর কবিতার এই ধারাই বাংলা কবিতার আধুনিক ধারা। পরবর্তী দশকে আধুনিক কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবই অগ্রগণ্য। তিনিই সর্ব প্রথম সচেতনভাবে সুদৃঢ় ভঙ্গিতে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরোধিতা করে কবিতার বাক্‌মূর্ত্তি ও ভাবমূর্ত্তি আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। আধুনিক বাংলা কবিতার এই প্রবর্তনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নিঃসঙ্গ ছিলেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত - এঁরাও সহযোগী ছিলেন। এক হিসেবে, আধুনিক বাংলা কবিতার একটি যুগকে লালন করেছেন এই কবি চতুষ্টয়। এরপর, আধুনিক বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয়ের আর অবকাশ থাকলো না। এই দশকের আধুনিকদের মধ্যে জীবনানন্দ প্রথম রবীন্দ্র প্রভাব ব্যতিরেকে কবিতা লিখেছিলেন অন্যমনে। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতায় প্রথম স্রষ্টা তিনি। কিন্তু কবিতা জগতে নতুন কোনো আন্দোলন কিংবা আধুনিক কবিতার প্রতিষ্ঠা প্রচার - এসব তাঁর চিন্তার অন্তর্গত হয়নি কখনো। অথবা চিন্তার অন্তর্গত হয়েছে গভীরভাবে, কাজের দৃষ্টান্তের নীরবতার মধ্য দিয়ে। 'নির্জনতার কবি' নীরবে নিভৃতে কাব্যচর্চা করেছেন গণ সংযোগ পর্যন্ত যেন সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?[৭০]

- এই উচ্চারণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। কিন্তু আধুনিক কবিতার যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ঐ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মধ্যবর্তী সময় (১৯৩৫ খ্রীঃ নাগাদ), যা একটি স্থায়ী চেহারা লাভ করেছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রায় একক ভাবে বুদ্ধদেব বসু। 'প্রগতি'র (জৈষ্ঠ, ১৩৩৫) 'মাসিকী'তে বুদ্ধদেব লিখেছেন -

অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব
movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি,
এবং সেই নবরসের আস্বাদ বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে
গ্রহণ করাবার ভার 'প্রগতি' নিয়েছে।[৭১]

'প্রগতি' সম্পাদনা কালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন -

বিশ্বের শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে বাংলার চিত্তের যোগস্থাপন
করতে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবন যে কোনো
মতেই ফুলে ফুলবন্ত হয়ে উঠতে পারবে না।[৭২]

আর 'কবিতা' (১৯৩৫) প্রকাশিত হ'লে সমকালীন সাহিত্য পরিবেশের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে প্রায় সংগ্রাম করতে হ'লো। এই সংগ্রামের ইতিহাস পাওয়া যায় কবিতা পত্রিকার পাতায় পাতায়। একে 'সংগ্রাম' নামেই চিহ্নিত করা যায় এই কারণে যে, 'কবিতা'র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলো, 'শনিবারের চিঠি'র লেখক গোষ্ঠী। মূলতঃ আধুনিক কবিতার স্বপক্ষে বুদ্ধদেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিপরীত মেরুতে ছিলেন সজনীকান্ত এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দ। 'শনিবারের চিঠি'র সার্থক ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে — রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরা নতুন সুরের স্রষ্টা, তাঁদের অধিকাংশ এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আক্রমনের লক্ষ্য হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর আধুনিক সাহিত্যে অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিলো ভাঙন, অনিশ্চিতি, নেতিবাচকতা। 'কল্লোল' (১৯২৩) - 'কালিকলম' (১৯২৬) - 'প্রগতি'র (১৯২৭) পথ ধরে এই নেতিবোধের কবিতাই যখন অস্তিত্বের শিকড় সন্ধানে দিশেহারা, আধুনিক বাংলা কবিতার সেই অনিকেত দিনগুলিতে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা অনেকটা প্রতিপক্ষীয় শরাঘাতকারী যোদ্ধার মতো। আধুনিক লেখকদের সরাসরি আক্রমন করা হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'তে। সজনীকান্ত নিজেও "তরুণদের কবিতার বিষয় এবং ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ"[৭৩] করবার কথা বলেছেন। তবে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগ ছিল

অশ্লীলতা, দুর্নীতি, যৌনতা, ব্যভিচার, মূল্যবোধ, বিদেশী অনুকরণ,
অক্ষমতা, রবীন্দ্র বিরুদ্ধতা, যুগসৃষ্টির দম্ভ অক্ষমতা ভাষাদৃষ্টি, বাংলা
ভাষা ব্যবহার, আত্মপ্রচার, দুর্বোধ্যতা, ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রভৃতি।[৭৪]

মূলতঃ আধুনিকদের বিরুদ্ধেই সজনীকান্তের অভিযোগ ছিল অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, আত্মপ্রচার, যৌনতা, বিকৃত মানসিকতা প্রভৃতির। রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক মনোভাবাপন্ন লেখক সম্প্রদায়ের হয়ে অবিরত মসীযুদ্ধ চালিয়েছেন বুদ্ধদেব। 'প্রগতি'র সময় থেকেই তিনি এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর 'কবিতা' প্রকাশিত হলে, এর প্রত্যেক সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যে, বিভিন্ন সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি একহাতে 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, অন্যদিকে এইসব কবিদের নবনির্মিত কবিতার ভিত্তি ভূমিটি প্রস্তুত করেছেন। 'কবিতা' সম্পাদনা কালে তিনি যেন সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

। ৪ ।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বুদ্ধদেব নিষ্ঠাবান কর্মী, সংগঠক, সম্পাদক ও সমালোচক। ছেলেবেলায় রাশি রাশি কবিতা লিখে 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামের হাতে লেখা মাসিক পত্রের সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার হয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধদেবের নিজস্ব একটি হাতে

লেখা কাগজ ছিল, তার নাম ছিল 'ক্ষণিকা'।[৭৫] এছাড়া, ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'তোষিণী'তে কলকাতার 'অর্চনা'য় লেখা ছাপা হয়েছে তাঁর। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে (বাংলা ১৩৩৪, আষাঢ়) বুদ্ধদেব ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ইতোপূর্বে হাতে লেখা 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব আই. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাওয়ায় পত্রিকা ছাপার অক্ষরে প্রকাশনার সুবিধা হ'ল। যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি তখন উনিশ বছরের যুবক। 'প্রগতি'র প্রথম বর্ষের বারো মাসের মধ্যে এগারো মাসের পত্রিকাতে 'মাসিকী' শীর্ষক একটি সমালোচনা অংশ থাকতো। এই সমালোচনায় 'প্রগতি'র নিজস্ব বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য ব্যতীতও প্রায় প্রত্যেকটিতেই সমকালীন সাহিত্য সমালোচনা থাকত। এই সমালোচনা গুলির শেষে লেখকের সম্পূর্ণ নাম না থাকলেও সাধারণতঃ নামের আদ্যাক্ষর থাকতো।'[৭৬] এই 'মাসিকী' সমালোচনা লিখতেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রভু গুহঠাকুরতা প্রমুখ। কিন্তু এর অধিকাংশই লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু নিজে।[৭৭] 'প্রগতি' পত্রিকার চার বছরেরও বেশি পূর্বে (বৈশাখ, ১৩৩০) 'কল্লোল' নামের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'প্রগতি' প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব একে 'কল্লোলে'রই একটি টুকরো'[৭৮] বলেছেন। অবশ্য 'প্রগতি'র তুলনায় কল্লোলের বিশেষত্ব ছিল।

> প্রগতি'র প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ - 'কল্লোলে' যে জিনিশটি কখনো স্থান পায়নি বা উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থান পায়নি।[৭৯]

'প্রগতি'র এই বিভাগের জন্য লেখাও পাওয়া যেতো না খুব বেশী। এ অংশও বুদ্ধদেব নিজেই লিখতেন। তাঁর মনে হয়েছে -

> সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক, এদিকে সেই সময়টাও ছিল বিশেষভাবে তর্কমুখর।[৮০]

তর্কের প্রত্যুত্তর দিতেন বুদ্ধদেবই। শুধু প্রত্যুত্তর দেবার জন্য নয়, 'নিজের কিছু বক্তব্য আছে বলেও'[৮১] তিনি সোচ্চার হয়েছেন এই সময়। অবশ্য তাঁর নিজেরই কথা —

> আমার সে সব লেখায় দাপাদাপি একটু বেশি ছিল, গদ্য ছিলো ইংরেজি বকুনি মেশানো, নড়বড়ে, ... ।[৮২]

তখন থেকেই নিজের প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় তিনি অকুণ্ঠচিত্ত। 'প্রগতি' পত্রিকাতেই প্রথম সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিলো জীবনানন্দকে। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন —

> সেই দূর সময়ে যখন 'গণ্ডার কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির অন্য কোথাও সমর্থন সূচক প্রয়াস ছিলো না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্দ্ধিত হল জীবনানন্দ ....

এবং এটাও উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটি
অতি আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা করেছিলাম।[৮৩]

বোঝাপড়া মানে —

এমন কোনো ব্যবস্থা কিংবা বলা যাক, আমাদের দিক থেকে
প্রস্তুতি, যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না
থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে
তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ ...।[৮৪]

বুদ্ধদেব নিজে তাঁদের প্রচেষ্টাকে 'রবীন্দ্র বিদ্রোহ' বলতে চাননি। তাছাড়া 'রবীন্দ্র বিদ্রোহ'ই এক মাত্র উদ্দেশ্য হ'লে এই সাহিত্যিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় হয়ে ওঠে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সাহিত্যের পক্ষেএর আবেদনও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু, রবীন্দ্র বলয়ে আবদ্ধ না থাকার যে সাহিত্যিক প্রস্তুতি-তা অবশ্যই সাহিত্যের এক নতুন অভিযাত্রা। তিনি আরেকটি জায়গায়ও উল্লেখ করেছেন —

রবীন্দ্রনাথের জাল থেকে বেরোবার চেষ্টায় আমরা কোনো বিকল্প
খুঁজছি তখন মাতৃভাষায় এমন কোনো কাব্যাদর্শ, যাতে নতুনের
ইঙ্গিত আছে।[৮৫]

নতুনের ইঙ্গিত খুঁজে খুঁজেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অনেক কবিকে। তাঁর মনে হয়েছে —

প্রতি যুগের এক-একটি কথা বলবার থাকে। ... বিভিন্ন যুগের
বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে তাকেও নব নব রূপ
নিয়ে গড়ে উঠতে হয়ে।[৮৬]

রবীন্দ্রোত্তর এই আধুনিক যুগটির কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

যুগ প্রবর্তক কে জানি নে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর থেকে একটি
সম্পূর্ণ নতুন যুগ যে বাংলা সাহিত্য জগতে এসে গিয়েছে, এ
বিষয়ে আর সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে না। ... এঁদের রচনার
বিষয়বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতা, আশা ও বেদনা পূর্বতন সাহিত্যিকদের
চাইতে একেবারে আলাদা ...।[৮৭]

অবশ্য বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে —

আধুনিকরা কেবল নূতন একটা কিছু করবেন ব'লেই এই সমস্ত
জিনিসের অবতারনা করেন নি। মর্ম্মে
মর্ম্মে জীবনের প্রতি পলে তাঁরা যা অনুভব করেছেন, তাদের
সাহিত্যেও তা-ই প্রকাশ পেয়েছে।[৮৮]

এ বিষয়ে 'প্রগতি'র 'মাসিকী'তে তিনি প্রচুর লিখেছেন। এই লেখাগুলি থেকেও তরুণ বুদ্ধদেবের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বিশেষতঃ চিরাগত সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'আধুনিক সাহিত্যে'র

বক্তব্যগত ও রূপগত পরিবর্তন[৮৯] যে সাধিত হয়েছে, তরুণ বয়সেই বুদ্ধদেব সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে 'প্রগতি'তে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বক্তব্য নিম্নরূপ —

(ক) আতি আধুনিক সাহিত্যকে Post-war সাহিত্য বললে ভুল হয়না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই Post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। .... আধুনিক লেখকরা শিশুকাল থেকে যে অর্থনৈতিক সংকটের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করেছেন বঙ্কিম বাবুর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় তাঁর চিহ্নমাত্র ছিল না। ... সেই সুখে শান্তিতে, আনন্দে কল্যানে, হাসিতে স্বচ্ছলতায় পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন গৃহ বাংলায় কি আর আছে ? দারিদ্র্য যে কত অমঙ্গলের জন্ম দেয় তার আর ইয়ত্তা নেই ....।[৯০]

(খ) আমরা মোটের উপর অনেক বেশী rational হয়েছি, খামকা একটা জিনিস খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলতে আর প্রস্তুত নই। .... একথা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়ে যাবে যে, ভগবান, ভুত ও ভালোবাসা এ তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।[৯১]

(গ) আধুনিকদের সঙ্গে পূর্বতন সাহিত্যের যে মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার জন্য বর্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। এ হচ্ছে Time spirit বা যুগধর্ম্মের ফল।[৯২]

শুধু আধুনিক সাহিত্য বিষয়েই নয়, আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও 'প্রগতি'র সময় থেকেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি মনে করেন,

> প্রত্রিকার সম্পাদনার কাজ যাঁরা গ্রহন করেন, তাঁদের হাতে একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্যের ভার থাকে - সে হচ্ছে অজ্ঞাত প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য সমাজে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[৯৩]

'প্রগতি'র সম্পাদক হিসেবে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন আনন্দের সঙ্গে। 'প্রগতি'র প্রুফ দেখা', 'প্রগতি'র পাতা ভরাবার জন্য 'কপি' তৈরী করা, আরো নানা রকম লেখায়[৯৪] তিনি মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করতেন না। মাত্র তিন বছর (১৯২৭-৩০) প্রকাশিত হয়েছিলো 'প্রগতি'। এরই মধ্যে বুদ্ধদেবের মনে হ'তো —

> .... দিন গুলি যেন গানের সুর, কোথাও একটু অসংগতি, একটু বৈষম্য নেই, আনন্দে একেবারে ভরপুর। ... সাহিত্যের উৎসাহ, নতুন সব জিনিস লেখা, কল্পনার প্রসার, ... বছর

দুই সময়ের মধ্যে আমার মন সৌন্দর্যে সাহসে দুরাশায়
আত্ম-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো।[৯৫]

'প্রগতি'র সময় থেকেই একদিকে সমসাময়িক সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব, অন্য দিকে সমকালীন লেখক গোষ্ঠীর হ'য়ে আধুনিকতার সপক্ষে অবিরত চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি।

১৯৩১ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হ'লো 'পরিচয়' পত্রিকা। প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা লিখেছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় 'পরিচয়ে'র গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিলো। বুদ্ধদেব অবশ্য 'পরিচয়'এর সাহিত্যের মজলিশে 'মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য'[৯৬] পেতেন না। তাঁর মনে হয়েছে, 'পরিচয়'-এর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর

'সকলেই যেন বড়ো বেশি বিদ্বান ও পরিপক্ব, তত্ত্বালোচনায় এঁদের
যতটা দক্ষতা সাহিত্যরচনায় ততটা নয় ....।'[৯৭]

এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখক দুজনমাত্র ঃ সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে।[৯৮] ১৯৩৫ সালে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। এই বছরের অক্টোবরে, শুধুমাত্র কবিতার জন্য প্রকাশিত হ'লো 'কবিতা' নামের একটি পত্রিকা। সম্পাদন করলেন যৌথভাবে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সহকারী সমর সেন। ইতিমধ্যে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বুদ্ধদেব। ৪৭ নং পুরানা পল্টন, রম্না, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি'ও বন্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের উৎস ও প্রকৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

'কবিতা' বের করার সময় বা পরবর্তীকালে, আমাদের সামনে
কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, একথা বললে অতিরঞ্জন হবে।
যেটা ছিলো, সেটা মনের একটা ইচ্ছে মাত্র, ... কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন
আর নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমপ্রকাশ
উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে না হয়
রঙ-বেরঙের মধ্যে, অনেক বেশী গলার জোর-ওলা-অন্যান্য
বিষয়ের মধ্যে-যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় স্বধর্মীর সঙ্গে
সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্প সংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের
কাছে ....।[৯৯]

কবিতা সম্পাদনার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

তিরিশের বছর গুলিতে যেসব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে
এসেছিলেন, যাদের ক্রিয়ার কালাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের
পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদেরই বাহন ও প্রচারক
রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ।[১০০]

তাছাড়া, আরো বেশি পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরচনায় উন্মুখ নবীনদের উৎসাহিত করতেও তিনি চেয়েছেন।[১০১] 'কবিতা'য় যাঁর রচনা প্রথম বেরিয়েছে, দু-এক বছরের মধ্যেই তাঁরা কোনো না কোনো ভাবে খ্যাতি অর্জনও করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, 'কবিতা'য় রচনা প্রথম প্রকাশিত হলে পাঠকের কাছে খ্যাত হয়েছেন, এমন কবির সংখ্যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগণ্য। রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরাই কবিতা লিখেছেন প্রায় সকলের কবিতা 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত জানিয়ে বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন —

> এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য বারোয়ারির
> দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের
> সঙ্গে এঁরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে ....।[১০২]

আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন —

> তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে মাশুল
> আছে, তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে।[১০৩]

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করে বুদ্ধদেব একাজ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। নিজে একজন সৃজনশীল লেখক হয়ে অন্য লেখকদের প্রতিষ্ঠার জন্য, রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার আদর্শ রূপায়নের জন্য নিয়মিত ভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি। সহকর্মীরা একে একে উৎসাহহীন হয়েছেন। প্রথমে ও দ্বিতীয় বছরে সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম আছে, সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তারপর থেকে সম্পাদক শুধুই বুদ্ধদেব বসু।[১০৪] একক ভাবেও তিনি আরো প্রায় কুড়ি বছর 'কবিতা' সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর-ই মধ্যে সমকালীন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ লেখকদের তিনি জায়গা করে দিয়েছেন 'কবিতা'য়, নিজে তাঁদের কবিতার সমালোচনা লিখে পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগ স্থাপন করেছেন, কনিষ্ঠ কবিরাও সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছেন 'কবিতা'য়। রবীন্দ্রোত্তর এই কবিদের কাব্যাদর্শ প্রচারের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আধুনিক কবিতার পাঠককে শিক্ষিত করবার জন্যও তাঁর চেষ্টা ছিল সীমাহীন। রবীন্দ্র জগৎ থেকে বাইরে বেরিয়ে কবিতায় নতুন সুরের সাধনা করলেও মোহিতলাল, নজরুল বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রোত্তর কোনো কাব্যদর্শ প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ কবি। সমালোচনা বা কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁরা অনুল্লেখ্য। মোহিতলাল কবি, সমালোচক ও সাহিত্য তাত্ত্বিক। কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা বা কাব্যাদর্শের কথা বিশেষ ভাবে ভাবেন নি। ভেবেছেন ব্যাক্ত ভাবে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যাদর্শের জন্য। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব কিরকম হওয়া উচিত, ব্যাখ্যা করেছেন, খাঁটি সাহিত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন, সাহিত্যের ধর্ম ও সাহিত্যের সত্যকে শিক্ষিত বাঙালির মনে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

> কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কোনো কাব্যাদর্শের কথা তিনি বলেন না,
> বরং ফিরিয়ে আনতে চান মধুসূদন বঙ্কিম লালিত আদর্শই।[১০৫]

এদিক থেকে বুদ্ধদেব ব্যতিক্রম। তিনি রবীন্দ্র পরবর্তী নতুন কবিতার স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব ও আদর্শ

প্রতিষ্ঠা জন্য নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার সমগ্র রূপটিকে দেখবার পক্ষে যাতে সাহায্য হয়, এজন্য তিনি নিরলস ভাবে পরিশ্রম করেছেন। আধুনিক কবিতা কী, আধুনিক কবিরা কী করেছেন - এই সব মৌলিক জিজ্ঞাসার উত্তর নিজেই খুঁজে নিয়েছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক কবিদের সম্পর্কে লিখেছেন -

> এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে
> নতুন সুর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর।[১০৬]

যেসব কবিরা রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন সুর এনেছেন কাব্যে, তাঁদের কাব্যাদর্শের স্বরূপ সন্ধান করেছেন তিনি। তিনিই প্রথম স্বীকৃতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে কাব্যাদর্শে ভিন্ন এইসব কবি অনেক শক্তিমান কবি, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকে নিজেরা নিজের ধরনে নবীনতর ধারণার স্রষ্টা, এলিয়টের ভাষায় 'Creator of ideas.'[১০৭]

বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ বেশির ভাগ সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ে। তবে, বিস্তার বেশি আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ক রচনার। রবীন্দ্র সমালোচনার সংখ্যাও কম নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রসঙ্গ তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায়। 'কবিতা'র প্রথম বছরের (১৯৩৫-১৯৩৬) চারটি সংখ্যায়, চারটি অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় গদ্যে, বুদ্ধদেব কবিতা বিষয়ক অনেক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। প্রবন্ধগুলি হলো - 'কবিতার দুর্বোধ্যতা', 'আধুনিকতার মোহ', 'গদ্য ছন্দ' ও 'কবিতার পাঠক'। এই পর্বে বুদ্ধদেব একদিকে নিজে সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে তরুণ লেখকদের নতুন সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতেও চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে লেখকদের মনন-মানসিকতার মধ্যেও যখন ঘটে গেছে পরিবর্তন, কবিতার সেই কালান্তর, সেই রূপান্তরও যে বাংলা সাহিত্যে জায়গা পেতে পারে, তা যে আকাশ-কুসুম নয়, এদের-ই মনন-চৈতন্য ও জীবনবোধের ফসল, তা বুঝিয়ে দেবার গুরুদায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কবিতাকে নতুন ভাবে পাদ-প্রদীপের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। এজন্য শুরু হ'লো রীতিমতো একটি আন্দোলন। এই আন্দোলন মুখপাত্র রূপে চিহ্নিত হ'লো 'কবিতা' পত্রিকা। অবশ্য, কবিতা বিষয়ে আদৌ কোনো আন্দোলন সম্ভব কি-না, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায় - যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক, বাদানুবাদ, বিচার - তোলপাড়ই সাধারণতঃ আন্দোলনের পর্যায়ে পড়ে। এদিক থেকে বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকা আধুনিক কাব্য আন্দোলনের একটি স্থায়ী রূপ। এই কাব্য আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধদেব-ই। এরপর, কবিতা বিষয়ে ধারণাই বদ্‌লে গেলো। জীবনের খণ্ডতা অবক্ষয়-ভাঙচুর ক্লেদ-পঙ্কিলতা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রেম-কাম-যৌনতা - এসব নিয়ে যেমন সমগ্র মানব সভ্যতা, কবিতাও এর বাইরে নয়, এই প্রগাঢ় আলো-অন্ধকারের বৃত্তেই কবিতার নিজস্ব জগৎ। এই আলো-আঁধারের মধ্যেই কবির অমৃত-সন্ধান। সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণায় বিশ্বাসী প্রথানুগ কবি, সমালোচক এতে বিস্মিত হলেন। বিশেষতঃ রক্ষণশীল লেখকগোষ্ঠী একে ব্যাভিচার নামেই চিহ্নিত করতে চাইলেন। বাংলা সাহিত্যের এরকম একটি ক্রান্তি পর্বে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হলেন। মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে জন্মগ্রহন করে যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের পুরোধা হয়ে উঠলেন তিনি। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের এই 'মোড়ফেরা'ই আধুনিকতা। আধুনিক কবিতার সূত্রপাত হ'লো এখান থেকে। এদিক থেকে বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি যুগ সৃষ্টি করলেন তিনি।

নির্দেশিকা

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নবীন কবি', বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পাদনা), কলকাতা, বর্নালী, ১৯৭৮, পৃঃ ১

২. তাদেব, পৃঃ ১

৩. তদেব, পৃঃ ২

৪. বসু, বুদ্ধদেব, আমার ছেলেবেলা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৩, পৃঃ১২

৫. বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবণ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ৩

৬. বসু, বুদ্ধদেব, রচনাসংগ্রহ, ৩-য় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৪২

৭. বসু, বুদ্ধদেব, আমার ছেলেবেলা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৩, পৃঃ১০২

৮. তদেব, পৃঃ ৭২

৯. তদেব, পৃঃ ১৬

১০. তদেব, পৃঃ ৩৪

১১. তদেব, পৃঃ ৩৫

১২. তদেব, পৃঃ ৩৫

১৩. তদেব, পৃঃ ৫১

১৪. তদেব, পৃঃ ৫০

১৫. তদেব, পৃঃ ৯৬

১৬. ঘোষ, সুদক্ষিণা, বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, ২০শে মে ১৯৯৭ পৃঃ৩১

১৭. সাদিক, মাহবুব, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১,পৃঃ৯

১৮. সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৮'পৃঃ২৯

১৯. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ ৯

২০. বসু, বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা, দে'জ, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১, পৃ ঃ ১১৮

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নবীন কবি, 'কলকাতা, সপ্তম-অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮ - জানুয়ারী ১৯৬৯, পৃ ঃ ৫৬

২২. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ৪৩

২৩. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, Tendencies in Modern Bengali poetry, পথের শেষ কোথায়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭, পৃঃ ২৩১

২৪. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃঃ ৮৫

২৫. তদেব, পৃঃ ৮৫

২৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি', কঙ্কাবতী, রচনাসংগ্রহ, ৮ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৮, পৃ ঃ ১১

২৭. বসু, বুদ্ধদেব, 'ক্ষণিকা'; বন্দীর বন্দনা ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃঃ ১৭

২৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'বন্দীর বন্দনা,' বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ - পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এস. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃঃ ২৮

২৯. তদেব, পৃ ঃ ২৮

৩০. তদেব, পৃ ঃ ২৮

৩১. বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, নিউ এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ ৫৮

৩২. বসু, বুদ্ধদেব, 'বন্দীর বন্দনা,' বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ২৭

৩৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রেম ও প্রাণ', বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ৭৮

৩৪. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃ ঃ ৯৩

৩৫. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলাএকাডেমী, ১৯৯১, পৃ ঃ ৬৪ - ৬৫

৩৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'পুরানা পল্টন', হাঠাৎ আলোর ঝলকানি, রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪২১

৩৭. বসু, বুদ্ধদেব, 'ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ', হঠাৎ আলোর ঝলকানি, রচনাসংক্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪২৭

৩৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'শাপভ্রষ্ট', বন্দীর বন্দনা ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৬২, পৃ ঃ ১২

৩৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'আমন্ত্রণ-রমাকে', একটি কথা (১৯৩২) বুদ্ধদেব বসু শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৭৭, পৃ ঃ ৩৩

৪০. সিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিক কবিতার দিগবলয়, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, অরুণা প্রকাশণী, ১৪০২, পৃ ঃ ২০৩

৪১. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১,পৃঃ৮

৪২. বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯১, পৃঃ ৩২

৪৩. তদেব, পৃ ঃ ২৮

৪৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'আটচল্লিশের শীতের জন্য ঃ ২', যে আঁধার আলোর অধিক, ২-য় সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৫২

৪৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'মরত্বসংগীত', মরচে-পড়া পেরেকের গান, কলকাতা, ভারবি, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৫৪

৪৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'সন্ধিলগ্ন', স্বাগতবিদায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা) অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, পৃ ঃ ১৫৭

৪৭. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ২৩৪

৪৮. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃ ঃ ১১৯

৪৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'সব পেয়েছির দেশে', কলকাতা, কবিতা ভবন, আগষ্ট ১৯৪১, পৃঃ

৫০. বসু, বুদ্ধদেব, উৎসর্গপত্র, সমরসেন স্মরণীয়েষু, দময়ন্তী, কলকাতা, কবিতাভবন, ১৯৪৩, পৃঃ১

৫১. বসু, বুদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিত্র, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪, পৃঃ ৫৪-৫৫

৫২. বসু, বুদ্ধদেব, 'ঋতুর উত্তরে', যে আঁধার আলোর অধিক, ২-য় সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৪৭

৫৩. সাদিক মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ২৪৮

৫৪. চট্টোপাধ্যায় কমলেশ, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল ঃ মিথপুরাণের সন্ধানে', বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা, পুস্তক বিপনি, ১৯৮৮, পৃ ঃ ৮৭

৫৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'অন্য প্রভু', দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা, প্রথম যুগ্ম সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৩, পৃঃ ৮৩

৫৬. চট্টোপাধ্যায় কমলেশ, মন্ত্রপড়া অন্তরাল ঃ মিথপুরাণের সন্ধানে, বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), কলিকাতা, পুস্তক - বিপণি, ১৯৮৮, পৃ ঃ ৮৭

৫৭. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ২৫৩

৫৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে', শীতের প্রার্থণা ঃ বসন্তের, উত্তর, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা) অষ্টম সংস্করণ কলিকাতা, দে'জ - পাবলিশিং, ১৯৯০, পৃ ঃ ৯১

৫৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'সন্ধিলগ্ন', স্বাগত বিদায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নরেশ গুহ (সম্পাদনা), অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, পৃ ঃ ১৫৬

৬০. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ৪৫৭

৬১. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮, পৃ ঃ ৭৮

৬২. বসু, বুদ্ধদেব, 'মোরা তার গান রচি', বন্দীর বন্দনা, ৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ৮০

৬৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'শাপভ্রষ্ট', বন্দীর বন্দনা, চতুর্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃ ঃ ১২

৬৪. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ ঃ ৩০

৬৫. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ৪৫৮

৬৬. বসু, বুদ্ধদেব, 'মরত্ব সংগীত', মরচে - পড়া পেরেকের গান, কলকাতা, ভারবি, ১৯৬৬, পৃঃ৫৪

৬৭. তদেব, পৃ ঃ ৫৪

৬৮. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ ঃ ৩০

৬৯. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ ৯

৭০. দাশ, জীবনানন্দ, 'বোধ', জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, ১ম খণ্ড কলকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৭, পৃ ঃ ৫৪

৭১. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৫, রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪৯৬

৭২. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, আষাঢ় ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১৩৮৪, পৃ ঃ ৪৯৫

৭৩. দাস, সজনীকান্ত, আত্মস্মৃতি, ১ম পূর্নাঙ্গসংস্করণ, কলকাতা, সুবর্নরেখা, ১৩৮৪, পৃ ঃ ২৫৫

৭৪. চক্রবর্ত্তী, সোনামণি, শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য, কলকাতা, অরুণা প্রকাশণী, ১৯৯২, পৃ ঃ ৩৪৩

৭৫. সিংহ, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৩, পৃ ঃ ২৩০

৭৬. বসু, বুদ্ধদেব, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়, রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড কলকাতা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ ঃ ৫৪৮

৭৭. তদেব, পৃ ঃ ৫৪৮

৭৮. বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ ২২

৭৯. তদেব, পৃ ঃ ২৪

৮০. তদেব, পৃ ঃ ২৪

৮১. তদেব, পৃ ঃ ২৪

৮২. তদেব, পৃ ঃ ২৫

৮৩. তদেব, পৃ ঃ ২৫

৮৪. তদেব, পৃ ঃ ২৫

৮৫. তদেব, পৃ ঃ ২৬

৮৬. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫০৫

৮৭. তদেব, পৃ ঃ ৫০৫

৮৮. বসু, বুদ্ধদেব, অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, প্রগতি, ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৬৮

৮৯. সাদিক, মাহবুব, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃঃ১৭

৯০. বসু, বুদ্ধদেব, অতিআধুনিক বাংলাসাহিত্য, প্রগতি, ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, মাঘ - ১৩৩৪, রচনা সংগ্রহ - ৩-য় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৬৩

৯১. তদেব, পৃ ঃ ৫৬৪

৯২. তদেব, পৃ ঃ ৫৬৮

৯৩. বসু, বুদ্ধদেব, প্রগতি, মাসিকী, ফাল্গুন ১৩৩৪, রচনাসংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫১০

৯৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'পুরানা পল্টন' - দ্বিতীয় অধ্যায়, রচনা সংগ্রহ - ৫ম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃঃ ৪২৪

৯৫. তদেব, পৃ ঃ ৪২৪

৯৬. বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃঃ ৭০

৯৭. তদেব, পৃ ঃ ৭০

৯৮. তদেব, পৃ ঃ ৭০

৯৯. দত্ত, মীণাক্ষী, সম্পাদকীয়, বর্ষ-২০, 'কবিতা' - সংকলন ৩, কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃঃ ৫৩-৫৪

১০০. তদেব, পৃ ঃ ৫৪

১০১. বসু, বুদ্ধদেব, সম্পাদকীয়, 'কবিতা', দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন - ১৩৫৩)

১০২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১৯৩৫ এর ৩রা অক্টোবর, রচনা সংগ্রহ, বুদ্ধদেব বসু, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৩, পৃঃ ৫৮২

১০৩. তদেব, পৃঃ ৫৮৬

১০৪. দত্ত, মীণাক্ষী, মুখবন্ধ, কবিতা - সংকলন ১, কলকাতা, প্যাপিয়াস, ১৯৮৭, পৃঃ ৮

১০৫. ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশণী, ১৯৮৭, পৃঃ ৩

১০৬. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৯

১০৭. Eliot, T.S., The Sacred wood, New Delhi, B.I. publications, 1976, page -1

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক্-বুদ্ধদেব বাংলা সমালোচনা

প্রকৃত অর্থে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্কিম চন্দ্রের হাতে। তাঁর আগেও কিছু কিছু কাজ হয়েছিল পরে তা অনেক বিস্তৃত হয়। বঙ্কিমের আগে ঈশ্বর গুপ্ত যে কাজ করেন তাকে বলা যায় সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতা। তবে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করে নূতন কালের বাংলা সাহিত্যের আদর্শ তৈরী করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি সে দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাসকে আমরা চারটি পার্ব বিন্যস্ত করতে পারি -

ক) প্রাক্ - বঙ্কিম বাংলা সমালোচনা খ) বঙ্কিম যুগের সমালোচনা

গ) রবীন্দ্র যুগের বাংলা সমালোচনা এবং ঘ) রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সমালোচনা।

। ক ।

প্রথম পর্বের বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত ছিল। এই কালের সমালোচক হিসেবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ রঙ্গলাল 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে এক্ষেত্রে যথার্থ প্রথম স্রষ্টার স্থান অধিকার করেন।[১] এর পরেই পাই ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩ সালে রচিত। এঁদের অনেক আগেই অবশ্য ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তৎকালীন সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের প্রামানিক জীবনীসহ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগ নেন। ঈশ্বরগুপ্তের পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় নতুন গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হতো, মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের সমালোচনা[২] করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং। এছাড়া, 'বৃত্রসংহার' - এর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদনের সতীর্থ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনা কারেছিলেন। এঁরা কেউ-ই সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতির গণ্ডী অতিক্রম করেন নি।

বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি নতুন ধরনের কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনা করে চিঠিপত্রে এই নতুন আন্দোলনের মূলসূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন 'ছাত্রাবস্থায় কবিতা সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা খুব কাঁচা হলেও এর মধ্যেই মধুসূদনের সাহিত্যবিন্তার প্রকাশ ঘটে। তিনি লিখেছিলেন -

> 'Altho', there are striking differences between these writers [chaucer, spencer, shakespeare, Milton], - yet they resemble each other in one point - an alesence of art and dependence upon nature while their successors from pope downwards are remarkable for qualities quite the reverse ....[৩]

মধুসূদন ঠিক সাহিত্য বিচারক ছিলেন না, সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তিনি করেননি। তবে, অসংখ্য পত্রাবলীতে নিজস্ব সাহিত্যরুচির পরিচয় আছে।

সেগুলি সাহিত্য বিচার নয়, সাহিত্যে নূতন মূল্যবোধের প্রথম দৃষ্টান্তমাত্র।[৪]

। খ ।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যথার্থ সাহিত্যবিচারের সূত্রপাত হয়। তাঁর সাহিত্যভাবনা ছড়িয়ে আছে নানা রচনায়।'বিবিধ প্রবন্ধ'এর প্রথম ভাগে (১৮৮৭ খ্রীঃ), 'উত্তর চরিত', গীতিকাব্য, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'দ্রৌপদী', 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমোনা'; দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২ খ্রীঃ) 'ধর্ম এবং সাহিত্য', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা', 'বাঙ্গালার ভাষা' - এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অনুশীলন অংশে মানবধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। দীনেশ চরণ বসুর 'মানস বিকাশ' কাব্যের সমালোচনা পরে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে রূপান্তারিত হয়। এছাড়া, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা (বঙ্গদর্শন ১২৮১ / ১৮৭৪ খ্রীঃ), দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা (বঙ্গদর্শন ১২৮৪ / ১৮৭৭ খ্রীঃ), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীর ভূমিকা (১২৯২ / ১৮৮৫ খ্রীঃ), পারীচাঁদ মিত্র প্রবন্ধ (১২৯৯ / ১৮৯২ খ্রীঃ) - এইসব প্রবন্ধগুলি সমালোচক বঙ্কিবচন্দ্রের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও রসবোধের পরিচয় বহন করে।

সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মানবাশ্রয়ী চিন্তার ধারক ছিলেন।[৫] মানুষের জীবন ও সমাজকে সবার উপরে স্বীকার করে নেওয়াই ছিল রেনেসাঁসের লক্ষণ। বঙ্কিম চন্দ্রও সাহিত্যকে সমাজ ও জীবনের অঙ্গীভূত করে দেখেছেন। সমালোচনা কর্মেও তিনি এই তত্ত্বকেই গুরুত্বে দিয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থেও তিনি এই মনুষ্যত্ব ধর্মের কথাই বলেছেন -

> সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষাত্বেই সুখ। .... আমাদের
> সমুদয় বৃত্তিগুলির স্ফুর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।[৬]

তাঁর সাহিত্যচিন্তা নীতিবর্জিত ছিল না। এই নীতি সঙ্কীর্ণ বা গোঁড়া রক্ষণশীল নীতি নয়।

> বঙ্কিম চন্দ্র ইহবাদী, জীবনমুখী, সমাজমুখী।[৭]

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের কৃত্রিম জীবন বিমুখ রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি তিনি বা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অলকাপুরীর কথাও ভাবেন নি তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতির কথা বলেন এর পরিচয় আছে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে -

> চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে,
> সেটি কি ? ... উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌর্ণ
> উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন ... তাঁহারা সৌন্দর্যের
> চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।[৮]

তিনি সাহিত্য কর্মকে নিছক আনন্দ বলে মনে করেন নি। এর সচেতন উদ্দেশ্যও স্বীকার করেন নি। তবে তিনি মনে করেন কাব্য সার্থক হলে তা চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে। আবার, 'ধর্মতত্ত্বে'র ২৭ সংখ্যক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন - কাব্য মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের প্রধান সহায় এবং এই কাব্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন -

> তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি
> বিধান করনে।[৯]

বঙ্কিম চন্দ্রের আলোচনায় একই সঙ্গে সৌন্দর্য্যও আছে আবার চিত্তশুদ্ধিও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই দিককেই মিলিত করতে চান, তিনি কল্যাণ ও সুন্দর দুইকেই এক করে দেখেন।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় কাব্যসৃষ্টিকে সামগ্রিক রূপে দেখা হয়। 'উত্তরচরিতে' বঙ্কিম এই সামগ্রিক বিচারভঙ্গী প্রথম প্রয়োগ করেন -

> এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের
> গৌরব বুঝিতে পারা যায় না .... সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের।
> এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের
> পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না।[১০]

বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণ তত্ত্বকেও অগ্রাহ্য করে বলেছেন -

> যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই।[১১]

তাঁর সাহিত্যভাবনা ক্লাসিক্যাল রীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি বলেছেন -

> যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।[১২]

তাঁর সাহিত্যবিচারের তত্ত্বে একটা দ্বিমুখী ভাবনা ছিল। তিনি যাকে স্বভাবানুকারী বলেন তাকে প্রকৃতির অনুকারী বলা যায়। আবার তিনি সাহিত্যকে প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র বলেন না, তাকে স্বভাবাতিরিক্ত বলে মনে করেন। এই কথার প্রমান পাই দীণবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে তাঁর লেখায়। সেখানে Realism -এর উপর Idealize করার কথাও তিনি বলেছেন, এতে মনে হয় সাহিত্যকে প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র বক্তব্য নয়। সাহিত্য এর অতিরিক্ত কিছু। এই দিক থেকে দেখলে মনে হয় স্বভাবাতিরিক্ত বলতে তিনি আদর্শায়িত বাস্তবের কথা বলেছেন।[১৩] একে অনেকটাই অ্যারিষ্টটলীয় চিন্তা মনে করা যায়। কারন, তাঁরই লেখায় সাহিত্য প্রকৃতির অনুকরণ আবার অনুকরণের চেয়েও কিছু অতিরিক্ত এই ধারনা পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে অনুকরণতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন তা বলা যায় না। অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিক সমালোচকদের প্রধান বিষয় ছিল মাইমেসিস বা অনুকরণ। বঙ্কিম চন্দ্র এখানে ক্লাসিক রীতিকে অনুসরণ করে স্বভাবানুকরণ তত্ত্বের কথা বললে ও ক্রমশ রোমান্টিক কাব্যভাবনার দিকেই এগিয়েছিলেন। 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসছিমোনা' প্রবন্ধে এই পরিচয় আছে। তাই তিনি একইসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বও ব্যবহার করেছেন। তিনি

বলেছেন -

যাহা সত্যর প্রতিচ্ছবিমাত্র নহে - তাহাই সৃষ্টি।[১৪]

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। সেই সৃষ্টি প্রতিকৃতিমাত্র নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪-৭৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের সমালোচনা লেখেন। এই সমালোচনায় তিনি অষ্টাদশ শতকীয় নীতির মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন। কাব্যের বক্তব্যকে প্রকাশভঙ্গীর উপরে স্থান দিয়েছেন। সমালোচক বঙ্কিমের মতে 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধর্ম-নীতির জয়ঘোষণা।

তাঁর কৃতিত্ত্বের অপর পরিচয় পাওয়া যায় 'দীনবন্ধু মিত্র' (১৮৭৬) ও 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত' (১৮৮৫) এই দুটি প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকীয় সমালোচনায় সমাজচেতনা ও ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, ঊনবিংশ শতকীয় সমালোচনায় ব্যক্তিচেতনা ও কবি ব্যক্তিত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বঙ্কিমের সাহিত্যচেতনা সমাজচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও এই প্রথম তিনি শিল্পীর ব্যক্তিত্ত্বকে আলাদা মূল্য দিয়েছেন। 'দীনবন্ধু মিত্র' সমালোচনায় তিনি বলেন -

যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি ...।
গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কিনা
বলিতে পারি না।[১৫]

এই প্রবন্ধে তিনি কবির অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এর উপরে স্থান দিয়েছেন কবির কল্পনাশক্তিকে। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি ছিল কিন্তু তার কল্পনাশক্তি ছিল না। এ থেকে তাঁর তত্ত্বে কল্পনাশক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারি। 'ঈশ্বরগুপ্ত' প্রবন্ধেও এই নতুন সূত্রের প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। কবিতাবলীর আলোকে কাব্যবিচারের একটা নতুন পথ এদুটি প্রবন্ধে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাব্যকে কবির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার, কবির আত্মপ্রকাশের সূত্রে বিচার রোমান্টিক ভাবনারই একটি দিক। এতে মনে করা যায় যে তিনি ক্রমশঃ সেই রোমান্টিক সমালোচনার দিকেই ঝুঁকেছিলেন।

। গ ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে সমালোচক হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল লেখক নন, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখক তিনি। একদিকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্য সমালোচনা করেছেন আবার সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। সাহিত্য সমালোচনা অর্থে তিনি সাহিত্য বিচারকে বুঝেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন -

যাকে আমরা সাহিত্য সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে
আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ বিচার কথাটি ব্যবহার করলে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ব্যাখ্যাকেই অবলম্বন করেছেন,

বিচারকে তেমন গুরুত্ব দেননি।[১৭] তাঁর মতে, সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা সমালোচকের কাজ। এখানে সমালোচনা অর্থে তিনি তিনটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন - পরিচয়, ব্যাখ্যা এবং বিচার। এদের উপরেই তিনি সাহিত্য সমালোচনাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন।[১৮]

সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর একটি বিষয়েরও নাম করেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের 'রামায়ণীকথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে পূজা কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন -

> পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা,
> .... যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত।
> তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত
> করেন মাত্র।[১৯]

এমনও হতে পারে যে, তিনি সমালোচনা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যার কথা বলেছিলেন সে ব্যাখ্যা স্বাধীন ব্যাখ্যা নয়, তা পূজার সহগামী, সে ব্যাখ্যা সমালোচনার অঙ্গ।[২০] ঠিক একইভাবে বলা যায়, যে পরিচয় ভক্তি বিগলিত তা সমালোচনার অঙ্গ।[২১] কিন্তু, তাহলেও সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে বিচার কথাটি ব্যবহার করেছেন, এখানে তাকে সহগামী মনে হয় না। কেননা, বিচার বা মূল্যায়ণ আর ভক্তি বিগলিত পূজা সম্পূর্ণ পৃথক বৃত্তির ক্রিয়া।[২২] ফলে, কোনটি কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সমালোচনা বলেছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে পূজা বলেছেন। এর দশ বছর আগে 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি রচিত হয়। সেখানে সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন -

> সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম একহস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণ
> কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন,
> আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।[২৩]

এখানে সমালোচক বিচারক। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৯৪ সাল। 'রামায়ণ' এর দশ বছর পরে লেখা। 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯২৯ সাল। অর্থ্যাৎ, ৩৫ বছরের সময়সীমার সমালোচনা সম্পর্কে তিনবার তাঁর মত পরিবর্তন ঘটল, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের এক দেড়বছর পরে 'লোসাহিত্যে'র 'ছেলেভুলানের ছড়া' (১৩০১) লেখা হয়। সেখানে তাঁর বক্তব্য -

> যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক, তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়ি পাল্লা
> আছে, তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি
> বাঁধি বোল বাহির করিয়া যে কোনো রচনা তাহাদের নিকট উপস্থিত
> করা যায় নিঃসঙ্কোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া
> দিতে পারেন।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধটিতে মূলতঃ সাহিত্যবিচার এবং সাহিত্য বিচারের

ধ্রুব মানদণ্ডের ওপর এবং বিচারকের যোগ্যতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তার বক্তব্য -

> বিচারকের প্রতিভা আছে, এক একজনের পরখ করিবার শক্তিও
> স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ,
> তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না। যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন,
> এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন।[২৫]

এখানে তিনি সাহিত্যের কতগুলি নিত্য লক্ষণের কথা বলেছেন সেই নিত্য লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করেই সাহিত্য বিচারের যে মানদণ্ড স্থির হয়, সেই মানদণ্ডও নিত্য। সমালোচকের কাজ সেই মানদণ্ডের সহায়তায় সাহিত্য বিশেষের বিচার করা। অর্থ্যাৎ, সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান নি। তিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করতে করতে এগিয়েছেন, তাই স্বাভাবিক নিয়মেই মতপরিবর্তন ঘটেছে। 'সাহিতত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'সাহিত্য বিচার' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -
সাহিত্যে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই

> যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে
> আপনাকে ঘোষণা করে।[২৬]

এখানে তাঁর আপত্তি বিচারকের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে। আবার, একই নিবন্ধে বলেছেন -

> অবশ্য যাঁরা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষ কালগত মমত্বের দ্বারা
> সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাঁদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত।[২৭]

বোঝা যাচ্ছে কিছু নিরাসক্ত সমালোচকও আছেন যাঁদের সাহিত্যবিচার নিছক ব্যক্তিগত ভালো-মন্দ লাগার জবানবন্দী নয়। অর্থাৎ, তাঁদের সাহিত্যবিচার নিরাসক্ত বুদ্ধির বিচার, আদর্শভিত্তিক বিচার। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় প্রকৃত সমালোচকের মূলধন হল -

> তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়
> তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়।[২৮]

এই মননধর্ম "মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শ হীন।"[২৯] এই প্রবন্ধের প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের কোনো সর্বজনীন আদর্শকে স্বীকার করেন নি, তাঁর বক্তব্য হল - সমালোচক সাধারণতঃ তাঁর নিজের মনের বিশেষ সংস্কার দিয়ে সাহিত্যবিচার করেন। তিনি বলেছেন -

> এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে,
> তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে।[৩০]

অর্থ্যাৎ, সমালোচক যা নিয়ে অগ্রসর হন তা একেবারেই তাঁর দলগত ও শ্রেণীগত সংস্কারের প্রবর্তনা মাত্র। যে সমালোচক এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন একমাত্র তিনিই তাঁর সমালোচনাটিকে সাহিত্য গুণান্বিত করে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেই রকম সাহিত্য একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।[৩১]

অর্থ্যাৎ, রবীন্দ্রনাথের মতে, সমালোচনার মূল্য তার মতামতে নয়, তার নির্ভুলতায় বা তার মূল্যায়ণের যথাযথতায় নয়। সমালোচনার মূল্য তার প্রকাশ সৌন্দর্যে, তার নিজস্ব সাহিত্য গুণে, তার স্বাধীন রস সৃষ্টির ক্ষমতায়।[৩২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার সমগ্র ইতিহাসটিকে মোট চারটি পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমার্দ্ধে উন্মেষ ও প্রস্তুতিপর্ব, দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি পর্ব।[৩৩] উন্মেষ পর্ব, বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা। এর অধিকাংশই 'সমালোচনা' (১৮৮৩) গ্রন্থে স্থান পায় এবং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এগুলিকে বর্জন করেন। প্রস্তুতিপর্ব প্রধানতঃ মধ্য ও পরিণত যৌবনের রচনা। ব্যবহারিক সমালোচনার দিক থেকে এই পর্ব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা প্রবন্ধগুলি যেমন - 'মেঘদূত' (১৮৯১), 'রাজসিংহ' (১৮৯৪), 'বঙ্কিবচন্দ্র' (১৮৯৪), 'কাব্যে উপেক্ষিতা' (১৯০০) - এই পর্বেই রচিত। ব্যবহারিক সমালোচনার দিক থেকে এটি পরিণত পর্ব হলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে খানিকটা অপরিণত।[৩৪] প্রতিষ্ঠা পর্বের সূচনা 'বঙ্গ দর্শন', প্রকাশ (১৯০১) থেকে। এই পর্বের অপর প্রান্তে আছে 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রকাশকাল (১৯০৭)। পর্বটির স্থিতিকাল এই সাত বছর। পরিণতি পর্বের সূচনা 'সবুজপত্র' প্রকাশের (১৯১৪) পর থেকে। এই পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধ 'সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩)-এ স্থান পেয়েছে। এছাড়া 'personality' (১৯১৭), 'The Religion of Man' (১৯৩১), 'The Religion of on Artist' (১৯৫৩) এইসব উল্লেখযোগ্য ইংজেরী গ্রন্থও এই পর্বে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাকে সূত্রাকারে সাজিয়ে গিলে কয়েকটি ভাগ দেখা যায়। যেমন -

১) রোমান্টিক গোত্রের সাহিত্য রীতির প্রতিষ্ঠা ।

২) তাঁর লেখায় বাইরের বাস্তবতার জায়গায় অনুভূত সত্যের মর্যাদা অনেক বেশী।

৩) সাহিত্যের কাজ প্রথম জীবনে সৌন্দর্যসৃষ্ট বলে ভাবলে ও পরে তিনি সাহিত্যে আনন্দমূল্যকেই বড় করে তুলেছেন।

৪) সাহিত্যের জনকল্যাণমূলক ভূমিকা তিনি স্বীকার করেন না কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে জনকল্যাণের ভূমিকা স্বীকার করেন।

৫) শেষ পর্বের সাহিত্যের তত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে বা বলা যায় ক্রমোন্মোচিত হয়েছে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের তুলনায় মানব প্রকাশের তত্ত্ব। সাহিত্য তাঁর কাছে মানব প্রকাশ।

প্রথম বা উন্মেষ পর্বে যে সাহিত্যতত্ত্ব অল্পবিস্তর অবিন্যস্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা খাঁটি রোমান্টিক লিরিক কবির সাহিত্যতত্ত্ব।[৩৫] তত্ত্বের দিক থেকে এই রোমান্টিকতা উনিশ শতকের ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্স ও কোলরীজের রোমান্টিকতার অনুসরণ। দ্বিতীয় পর্ব যাকে প্রস্তুতিপর্ব বলা হয়েছে, সেটি এক হিসেবে মোড় ফেরার কাল।[৩৬] পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকতার দিক থেকে

ভারতীয় বা ঔপনিষধিক রোমান্টিকতার দিকে মোড়-ফেরা। তৃতীয় বা প্রতিষ্ঠাপর্বে ভারতীয় ঔপনিষধিক ব্রহ্মবাদের মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়েছে। শুধু, ঔপনিষধিক নয়, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা এই পর্বে বলিষ্ঠ। পরিণতি পর্বের যথার্থ সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে থেকে। এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ সৃজনে ও সাহিত্যভাবনায় অনেকবেশি আধুনিক। সাহিত্যভাবনায় এই আধুনিকতার মধ্যেও একটা ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়েছে। যার নিরসন শেষ গ্রন্থ 'সাহিত্যের স্বরূপে'ও হয়নি।

গোত্রবিচারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে রোমান্টিক বা ক্লাসিক - এরকম চিহ্নিত করা কঠিন হলেও রোমান্টিকতার লক্ষণ যে শেষপর্যন্ত তাঁর ভাবনার মধ্যে ছিল তা বলা যায়। কিন্তু, পরিণতিপর্বে, প্রথম দিকের রোমান্টিক ধারনার অনুষঙ্গগুলোকে তিনি অনেকটা বদলে নিয়েছেন। রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বে অনুভূতির গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব অনুভূতি ও উপলব্ধির। কিন্তু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ প্রভৃতি রোমান্টিক কবিরা অনুভূতি বলতে যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা বলেননি। তাঁর কাছে অনুভূতি নিছক ফীলিং নয়।[৩৮] সেখানে আছে কল্পনারও গুরুত্ব এবং এই কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা কলেন, যা উনিশ শতকী রোমান্টিকদের মধ্যে ছিল না। রোমন্টিকেরা অনুকরণবাদ বিরোধী। তাঁদের মতে, সাহিত্য অনুকরণ নম, সৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের অনুকরণবাদ কিছুটা অন্যরকম। তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্য জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ। পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকেরা প্রকাশবাদী। তাঁরা কবির আত্মপ্রকাশ ও ভাবপ্রকাশের কথা বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন মানবপ্রকাশের কথা।[৩৯] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শিল্পের ব্যাপারে লীলাবাদী, স্বাধিকারবাদী। কিন্তু রোমান্টিকদের মতো শিল্পের জন্য শিল্প এই নীতি তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর বক্তব্য শিল্প কোনো কিছুর দাসত্ব করেনা। তাছাড়া, রোমান্টিকরা ব্যক্তিমানুষের উপর বিশেষতঃ শিল্পী মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষ ও একলা মানুষের কথা বলেননি, বলেছেন ইতিহাসের মানুষের কথা, তাঁর ভাষায় বলা যায় 'মানব সম্মিলেনর কথা মানব সমগ্রতার কথা। রোমান্টিকরা বিষয় ও বিষয়ীব ঐক্যের কথা বললেও কার্যতঃ তাঁরা বিষয়ীকেই গুরুত্ব দেন বেশী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে বিষয় ও বিষয়ী তুল্যমূল্য। কাজেই সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রোমান্টিক গোত্রের হলেও তাঁর মধ্যে একদিকে সুস্পষ্ট রোমান্টিকতা, অন্যদিকে তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস - এই দুইয়ের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর লেখায় বাইরের বাস্তবতার জায়গায় অনুভূত সত্যের মর্যাদা অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথের মতে অনুভূতি নিছক আবেগসর্বস্ব ব্যাপার নয়, এ হল সমগ্র মানবচৈতন্যের একটি অনবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে
> হয়ে ওঠা; শুধু বাইরের থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই
> মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা।[৪০]

এর মধ্য দিয়েই বিষয় ও বিষয়ী, অনুভবকারী ও অনুভবের বস্তু একাকার হয়ে যায়। সাহিত্য বা ললিতকলার লক্ষ্যই হল এই বিষয়ও বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার আনন্দকে মূর্ত করে তোলা।[৪১] তিনি (রবীন্দ্রনাথ)

বলতেচান অনুভূত বস্তু সমূহের অভিঘাতেই মন সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা ঘটে। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের অবিরাম সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলছে।

> হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে
> বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।[৪২]

এখানে, হৃদয়ের জগৎও বাইরের জগৎ এই দুই জগতের কথা বললেও পরিনত বয়সে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র হৃদয়ের জগতের কথা বলেছেন। 'সাহিত্যের পথে' বইটি প্রথম প্রকাশের (১৯৩৬) সময় গ্রন্থের ভূমিকায় (অমিয় চক্রবর্ত্তী কে লেখা চিঠিতে ৮ই আশ্বিন ১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কাজ হিসেবে সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছে সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এখানেই তাঁর বক্তব্য

> এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায়না।
> .... সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারনায় ধরা গেলনা।[৪৩]

এর আগে পর্যন্ত ও তিনি বলতেন সাহিত্যের কারবার সৌন্দর্যকে নিয়ে, কারণ তা আনন্দ দেয়। কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়

> যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।[৪৪]

সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্য রচনা হলেও লক্ষ্য হ'ল আনন্দ। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্যের লক্ষ্য হিসেবে আনন্দের কথা বললেও সাহিত্যের কাজ হিসেবে সৌন্দর্যের কথা স্বীকার করেননি তিনি। কারণ প্রচলিত অসুন্দরও সাহিত্যে আনন্দ দিতে পারে। যেমন ভাড়ু দত্ত সাহিত্যের সুন্দর, কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। তাছাড়া, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের কাজ একথা বললে প্রথমতঃ আমাদের প্রথাগত সৌন্দর্যের কথাই মনে আসে। তাহলে মনে হতে পারে জীবনে যা অসুন্দর, ভয়াবহ, ঘৃনার, তারা সাহিত্যে জায়গা পেতে পারে না, এ গেল ব্যবহারিক দিকের কথা, তত্ত্বগত দিক থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর সাহিত্য অভিজ্ঞতায় আনন্দকেই প্রাথমিক উপলব্ধি হিসেবে জেনেছিলেন, তাই একে বোঝার জন্য অন্য কোনো উপাদানের গুরুত্বের কথা বলেননি। যেহেতু সাহিত্য রসিকের অভিজ্ঞতাতে সুন্দর বলে আলাদা কিছু নেই, সেজন্যে সাহিত্যে সুন্দর কথাটির প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়। অর্থ্যাৎ, তিনি সাহিত্যে আনন্দমূল্যকেই একমাত্র ভেবেছেন। এই আনন্দ নিজেকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

> ওথেলের সঙ্গে ওথেলো হয়ে, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর অন্ধতা হয়ে,
> কর্ণের সঙ্গে তাঁর নিস্ফল বীরত্ব হয়ে, মানুষ নিজেকে ফিরে ফিরে
> দেখে অর্থ্যাৎ আত্মোপলব্ধি করে এবং আনন্দ পায়।[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দতত্ত্বে উপনিষেদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত। আনন্দ কথাটা উপনিষদের, অর্থটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেকোনো অনুভূতিই আনন্দ। সুখ হোক, দুঃখ হোক, জীবনের বিপুল ভাণ্ডার থেকে যত রকমের অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাওয়া যাক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এর সবকিছুকেই আনন্দ বলেছেন।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সব রকম অভিজ্ঞতাকে আনন্দ বললে ও আনন্দ সম্ভোগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। নির্বাচনের যথাযথ মানদণ্ড কোনটি হবে - সমাজকল্যাণ, নীতিবোধ, অথবা লোকহিত - সেটিই প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন - সাহিত্যে উপলব্ধি অর্থ্যাৎ আনন্দই শেষ কথা।

> এর পরে আর কোনো কথা নেই ... এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে,
> আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি-না ?[৪৭]

অবশ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে, তিনি যে কল্যাণ বা হিতসাধনের কথা কখনোই তোলেন নি তা নয়। তবে, সাহিত্যের আনন্দকরতাকে তিনি শেষ কথা ভেবেছেন বলেই সত্য থেকে মঙ্গলকে, সুন্দর থেকে মঙ্গলকে কিংবা আনন্দ থেকে মঙ্গলকে তিনি পৃথক করতে পারেন না। এদিক থেকে, লৌকিক মানদণ্ডের সঙ্গে পার্থক্য যাই হোক না কেন, সাহিত্যে মানদণ্ড হিসেবে সমাজকল্যাণ, নীতিবোধ বা লোকহিত - সমস্ত নীতিবিধানেরই শেষ লক্ষ্য হ'ল - কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হল সামঞ্জস্য। তাই হল সত্য। এর-ই নাম কল্যাণ। এই সামঞ্জস্যই সুন্দর তাই তা আনন্দকর। সুতরাং যা আনন্দকর তা কল্যাণকর এবং যা কল্যাণকর তা সুন্দর ও আনন্দদায়ক। সে সঙ্গে একথা ও বলা যায় যা নিরানন্দকর তা অকল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য সবসময়-ই কল্যাণকরে তা সবসময়-ই হিতসাধন করে। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে তা সত্যিই জনকল্যাণের কাজ তা সাহিত্যের নয়। তাই স্পষ্টতঃ সাহিত্যে জনকল্যাণের কথা না বলে তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দকরতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাহিত্য তাঁর কাছে মানবপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় প্রকাশ কথাটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।'[৪৮] 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ কথাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সেখানে বলেছেন যে ব্রহ্মস্বরূপের যেমন তিনটি দিক থাকে - সত্যের দিক, জ্ঞানের দিক এবং অনন্তের দিক, মানবস্বরূপেরও তাই। মানুষেরও একটা হল তার সত্তার দিক, সত্যের দিক, আর একটি জ্ঞানের, তৃতীয়টি তার অনন্তের দিক। 'এটিই তার প্রকাশের দিক',[৪৯] ঐশ্বর্যের দিক তার আনন্দের দিক। কেবল টিঁকে থাকায়, কেবল জ্ঞানে মানুষের আনন্দ নেই, মহাজীবনের সঙ্গে মিলনেই আনন্দ। অর্থ্যাৎ, প্রকাশেই তার আনন্দ। এই আনন্দরসই সাহিত্যে, আর্টে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন

> প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তার প্রকাশ
> নেই। যা স্বভাবতই দীপ্যমান, সেখানেই মানুষের প্রকাশের উৎসব।[৫০]

নিজেকে মহাজীবনের মধ্যে বিস্তৃত করা, মহাজীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করা এই হল প্রকাশ।[৫১] পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশাস্ত্রীদের মতে, প্রকাশ বা Expression-এর মূল কথা ভিতরকে বাইরে আনা, কোনো নতুন কিছু হয়ে ওঠা নয়, গোপন কিছু, প্রচ্ছন্ন যা কিছু একে চোখের সামনে আনা। রবীন্দ্রনাথ এর কোনোটিকেই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁর সাহিত্যভাবনায় প্রকাশ কেবল ভিতরকে বাইরে প্রকাশ করা নয়, রূপের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হওয়া এবং বিস্তারের মধ্য দিয়ে সত্য হওয়া।[৫২] প্রকাশের মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের চেতনা আর সভ্যতার চেতনা আনন্দে এসে এক হয়ে মিলে যায়। পশ্চাত্ত্য কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন প্রকাশ মাত্র। সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র কিন্তু তার পরিণাম সত্য হল ইন্দ্রিয়-মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।[৫৩] আর মানুষকে প্রকাশ আসলে মানবসত্যের প্রকাশ। আবার, রবীন্দ্রনাথের কাছে মানব এবং বিশ্ব সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য - বিশ্বমানব ও মানববিশ্ব একই কথা। প্রকাশ অর্থে এরই প্রকাশ।[৫৪] রচয়িতার মধ্যে সে বিশ্বমানব মন — তারই প্রকাশ। সম্মিলিত মানবমন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আধারে নিজেকেই প্রকাশ করে, এই হল রবীন্দ্র-সাহিত্য তত্ত্বের একটি অন্যতম মূল প্রত্যয়। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- মানবপ্রকাশ -

> সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।[৫৫]

প্রকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ বহুবিচিত্র রূপের ঐশ্বর্যে আত্মপরিচয় ও বিশ্বপরিচয় লাভ করে।

। ঘ ।

রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্যসমালোচক হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরী। তিনি তাঁর 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) মাধ্যমে বাঙালির সাহিত্যদৃষ্টিকে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য কী, এ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্পষ্ট।

> সমাজ কল্যাণ বা লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর সায় নেই।[৫৭]

তাঁর মতে, সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য সমাজ-কল্যাণ, লোকশিক্ষা বা নীতিপ্রচার নয়, আনন্দসৃষ্টি। তাই,

> সাহিত্যে পাঠকের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করার অর্থ লেখকের
> ধর্মচ্যুতি, এই তাঁর সিদ্ধান্ত।[৫৮]

বঙ্কিমের সমাজকল্যাণমূলক নীতিকে না মেনে তিনি যেন কিছুটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতি, শ্লীলতা-অশ্লীলতার আলোচনাও তিনি করেছেন। 'যৌবণে দাও রাজটিকা', 'ভারতচন্দ্র', 'জয়দেব', চিত্রাঙ্গদা' ও 'কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত' — প্রবন্ধগুলিতে এসম্পকে তাঁর মতামতের পরিচয় পাওনা যায়।

> ফরসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর অশ্লীলতা সম্পর্কে
> কোনরকম শুচিবায়ু ছিলনা।[৫৯]

তাছাড়া, সাহিত্যে শ্লীলতা - অশ্লীলতার প্রশ্নে গুরুত্ব দিতে তিনি রাজি হননি। আর্টের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই তাঁর কাছে বড় কথা।[৬০] আদর্শগত দিক থেকে যথেষ্ট স্বকীয়তা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যাদর্শকে খানিকটা যেন রবীন্দ্র-সাহিত্য চিন্তানির্ভর বলা যায়।

রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলালের আলোচনা না করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার যে ঐতিহ তা প্রায়শই বিপরীত মনোধর্ম বিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের নিউক্লাসিক মতাদর্শ রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণতই বর্জন করেছিলেন। তিনি যে নূতন রোমান্টিক চিন্তা থেকে বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি এবং বীক্ষণ করলেন তার অভিনবত্ব সেদিন বাঙালী পাঠক বুঝতে

পারেনি। সাহিত্যকে যে কোনো একটা মানদণ্ডে ভাল বা মন্দ বলে ছাপ মেরে দেওয়া যায়না - তার মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট সন্ধান করতে হয় - সাহিত্য যে কবির আত্মপ্রকাশ এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান। যদিও এ তাঁর নিজস্ব ভাবনা নয়। কিন্তু এই আত্মপ্রকাশের তত্ত্ব থেকে তিনি মানব প্রকাশ পর্যন্ত সাহিত্যের ধারণাকে বিস্তৃত করেছিলেন।

মোহিতলাল সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৃষ্টির ধারণাথেকেই বিচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি ক্রমে এই ধারণা বর্জন করেন। যদিও কোনোদিন সম্পূর্ণতঃ তা করতে পারেননি। সাহিত্যকে কেবল সাহিত্যের আন্তর্ধর্ম অনুযায়ী বিচার করবার একটা ইচ্ছা তার ছিল বটে তবে বহুক্ষেত্রে তার সঙ্গে দেশও জাতির তদানীন্তন আকাংক্ষা মিশে গিয়েছিল। এই কারনে তাঁর লেখা সমালোচনা কেবল সাহিত্যের সাহিত্য হিসাবে নিরূপণ ছিলনা - তাঁর সঙ্গে দেশ, কাল ও জাতীর জীবনাকাক্ষার প্রশ্ন জড়িত হয়ে গিয়েছিল। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে তাঁর যে বিশিষ্ট এবং বহু পরিচিত গ্রন্থ আছে সেটি এই জাতিয় জীবনভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে বিচার করবার ধারণা থেকে রচিত। এই ধরনের সমালোচনাকে বলা হয় সমাজভিত্তিক আলোচনা। যে ধারণার পত্তন ঘটেছিল তেঁইনের লেখায় এবং যার ধারাবাহিক অনুসরণ আরো অনেকে করেছিলেন। তাতে সাহিত্যকে দেশ, কাল এবং সাহিত্যকারের ভাব সমন্বয়ের ফল হিসেবে দেখাবার চেষ্টা ছিল। মহিতলাল যদিও মাত্র সেই কাজ করতে উদ্দোগী হননি তথাপি দেশও কালের এই ধর্মকে তিনি সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখতেচান। এই কারনে উনিশ শতকের সাহিত্যে-বিশ শতকের সাহিত্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করতে চান। যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে অনেক সময়ই তাঁর মন্তব্য অনুদার মনে হয়। অন্যপক্ষে তিনি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের লেখার সাহিত্যিক মূল্যবিচার অপেক্ষা তাতে প্রতিফলিত জাতীয় জীবনধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান মনে করেন। নিছক আর্ট বা নাট্যশিল্পের তাদের বিচার যেমন-ই হোক, তিনি জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব সাধনার দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকে জয়যুক্ত করেন। মোহিতলালের শিল্পবিচার ধর্ম এক্ষেত্রে যেন অর্দ্ধজাগর বরং জাতীয়তাবোধের আকাক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। তিনি সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যগুলিকে যে মূল্য দেন, তাঁর উত্তর কালের রচনাকে তা দিতে কুণ্ঠিত। এর কারণ প্রথম পর্বের রচনার যে সৌন্দর্য সৃষ্টি তাতে যে দেশ ও জাতির জীবনের জন্য তাঁর আকূতি এই সব-ই মোহিতলালকে আকর্ষণ করে তাঁর লেখার প্রথম পর্বে মোহিতলাল খুঁজে পান জগৎ ও জীবনের উদার মানবিকতা - যাকে তিনি সাহিত্যের মৌল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। অন্য পক্ষে শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন সেই সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা নেই, ভাব ও ভাষার সেই আদি পর্যায়ের দায়বদ্ধতা নেই তেমনি নেই জাতীয় জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা। যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ যুগের জাতীয় চেতনার কবি তিনি মোহিতলালের আরাধ্য। যিনি দেশবোধ থেকে আন্তর্জাতিকতাবোধে উত্তীর্ণ তিনি বর্জনীয়। তিনি যে ধরণের কাব্য তত্ত্ব রচনা করেন যাকে তিনি 'কায়াকান্তিবাদ' নাম দেন, কায়া এবং তার কান্তি সাহিত্যের ধর্ম বলে তিনি মনে করেন, উদার বিশ্লেষণে তার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেরই গুণ বা ধর্ম কিন্তু সে কথা ব্যাখ্যায় তিনি অশ্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখেন তিনি তাকে নিতান্তই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্য বলে তিনি উপেক্ষা করেন। আর কেবল বঙ্কিমের মধ্যেই

সেই Parsonality বা ব্যক্তিমাত্রিকতার উর্দ্ধে এক এমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পান যার দৃষ্টান্ত আর কোনো লেখকের লেখায় পাওয়া যায় না।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে তাঁর সমুদ্রপ্রমাণ বিরাগ তিনি অনেক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন। সে সব রচনা অনেক সময় কেবল আধুনিক শিল্পীর দোষ কণ্ডূয়ণে সমালোচনা ধর্মকেই যেন ক্ষুণ্ন করে। আধুনিক সাহিত্যকারদের মধ্যেই তিনি প্রবলভাবে Individualism এর চর্চা দেখতে পান - এই ব্যক্তিমাত্র সর্বস্বতা যে রেনেসাঁসের জীবনধর্ম বিচ্যুত, তা যে বাঙালির জীবনবোধের বিপরীত এক মনোধর্মের চর্চা করে মাত্র - এ সব উক্তি বহু ক্ষেত্রে তিনি করেছেন। এমনো মনেহয় অনেকক্ষেত্রে চিঠি পত্রে তিনি আধুনিক সাহিত্যের লেখকদের প্রতি অনেক অশোভন মন্তব্য করে যান। তিনি অবশ্য নিজেকে বলেছেন দ্বার রক্ষক মাত্র সুতরাং যাঁরা এই সরস্বতীর গাত্রে কালিমালিপ্ত করতে চান তিনি তাদের 'চাবুক' মারতেও কুণ্ঠিতনন। কিন্তু মনে হয় এসব উক্তি সাহিত্যের মৌল ধর্মকেই আহত করে। তিনি লিখেছেন যে, সাহিত্যের ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং সাধারনের রুচি ও রসবোধ জাগ্রত করবার জন্য তিনি সমালোচনাকে অবলম্বন করেছিলেন। একথা ঠিকই যে অনেক লেখকই এ কাজে সমালোচনাকে ব্যবহার করেন। এলিয়ট Correction of taste বলতে যা বলেছিলেন মোহিতলালের রুচি ও রসবোধ জাগ্রতকরাটা আসলে তারই বঙ্গীয় রূপান্তর। কিন্তু এসব বিষয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত ঝাঁজ ও তীব্র মেজাজ অনেককাংশেই তাঁর লক্ষ্যপূরণে বিরুদ্ধতা করে যায়। এই কারনে জাতির সঙ্গে সাহিত্যকে অণ্বিত করে দেখতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্রে শেষ আশ্রয় লাভ করেন। কেননা যে রেনেসাঁসের মানবধর্মকে তিনি বলেন সাহিত্যের ধর্ম - সেই ধর্মকে আধুনিক কবি শিল্পীরা অনেকটাই অতিক্রম করে আসেন। নব্য সমাজের কাছে তার বঙ্কিমের নীতিশাসিত জীবনবোধের ধর্মকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা এক অর্থে ব্যর্থতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় ফলে মোহিতলাল বিশশতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলেও কিন্তু কোনোক্রমেই উনিশশতকী জীবনধারা কে অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলা সমালোচনার প্রকৃত সূচনা বঙ্কিমে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে বিস্তার ও ভাবগত ব্যাপ্তি ঘটালেন মোহিতলাল তাকে আবার সেই আদি সূত্রে ফিরিয়ে নিলেন। সেই কারনে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলালের স্থানটি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

নির্দেশিকা

১। সেনগুপ্ত, শ্রীসুবোধচন্দ্র, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৬, পৃঃ ৬৪

২। মিত্র, রাজেন্দ্রলাল, বিবিধার্থ সংগ্রহ, অগ্রহায়ণ ১৮৭১ শক

৩। দত্ত, মধুসূদন, 'On Poetry etc', মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ, ১৯৬৫, পৃঃ ৬২২

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৫, পৃঃ৭৬

৫। তদেব, পৃঃ ৭৮

৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'সামঞ্জস্য ও সুখ', ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমরচনাবলী, ২-য় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৫৩

৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৫, পৃঃ৮০

৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিবিধ প্রবন্ধ', উত্তরচরিত, বঙ্কিমরচনাবলী, ২-য় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, প্রথম সং ১৯৮৩, পৃঃ ১৬৯

৯। তদেব, পৃঃ ১৬৯

১০। তদেব, পৃঃ ১৬৮

১১। তদেব, পৃঃ ১৭০

১২। তদেব, পৃঃ ১৭০

১৩। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ৮৬

১৪। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিবিধ প্রবন্ধ', উত্তরচারিত, বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭০

১৫। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রায় দীণবন্ধুমিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৬৮

১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থপরিচয়, 'সাহিত্যের পথে', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ২৮০

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যবিচার', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ১০০

১৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৫, পৃঃ১৮৭

১৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকাতা, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ১১

২০। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ২২৭

২১। তদেব, পৃঃ ২২৭

২২। তদেব, পৃঃ ২২৭

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', আধুনিক সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র, ১৩৬১, পৃঃ ১১

২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেভুলানো ছড়া', লোকসাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩১৪ পৃঃ ৫

২৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের বিচারক', সাহিত্য কলিকাতা, বিশ্বভাতরী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ, ১৩৬১ পৃঃ ২৬

২৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যবিচার', সাহিত্যের স্বরূপ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বঙ্গাব্দ ১৩৬৫, পৃঃ ৩৪।

২৭। তদেব, পৃঃ ৩৪

২৮। তদেব, পৃঃ ৩৫

২৯। তদেব, পৃঃ ৩৫

৩০। তদেব, পৃঃ ৩৩-৩৪

৩১। তদেব, পৃঃ ৩৪

৩২। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ২৩২

৩৩। তদেব, পৃঃ ১৮৭

৩৪। তদেব, পৃঃ ১৮৮

৩৫। তদেব, পৃঃ ১৮৯

৩৬। তদেব, পৃঃ ১৮৯

৩৭। তদেব, পৃঃ ১৯০

৩৮। তদেব, পৃঃ ১৯৩

৩৯। তদেব, পৃঃ ১৯৪

৪০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যতত্ত্ব', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ১২১

৪১। তদেব, পৃঃ ১২১

৪২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৯৮, পৃঃ ৭

৪৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, সাহিত্যের পথে, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৭-৮

৪৪। তদেব, পৃঃ ৮

৪৫। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত-পুস্তক ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ১১৩-১১৪

৪৬। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ১৯৬

৪৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৪৪

৪৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৯৩

৪৯। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩৭৯, পৃঃ১২৫

৫০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৩৭

৫১। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩৭৯, পৃঃ ১২৬

৫২। তদেব, পৃঃ ১২৭

৫৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের প্রাণ', সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৩৪৮, পৃঃ ২১৭

৫৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ১২৮

৫৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিশ্বসাহিত্য', সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃঃ ৭৭১

৫৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৩৪৮, পৃঃ ১১১

৫৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বীরবল ও বাংলাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক ১৯৮৮ পৃঃ ১১৫

৫৮। তদেব, পৃঃ ১১৫-১১৬

৫৯। তদেব, পৃঃ ১১৮

৬০। তদেব, পৃঃ ১২০

তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যতত্ত্ব

সাহিত্য সমালোচনার দুটি দিক আছে। একটি তত্ত্বের, একটি প্রয়োগের। তত্ত্বের দিকের রূপটিকে বলা হয় সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগের দিকের রূপটিকে বলা হয় সমালোচনা। কাজেই সমালোচনা বলতে সাহিত্যতত্ত্বও ব্যবহারিক সমালোচনার সমগ্রতাকেই বোঝায়।[১] একজন সাহিত্য সমালোচক প্রথমতঃ সাহিত্যতাত্ত্বিক, পরে তিনি সমালোচক। এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি খাঁটি পাঠক। পাঠকের কাছে সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় এই যে, তা আনন্দকর। সাহিত্যের এই আনন্দকরতার দিকটিকে মুখ্য করে দেখাই হচ্ছে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখা।[২] এই দেখাই সমালোচকের দেখা। আর, প্রত্যেক কাজের যেমন একটি অপরিহার্য প্রস্তুতিভূমি থাকে, সমালোচনা কর্মের সেরকম প্রস্তুতিভূমিটি হ'ল সাহিত্যতত্ত্ব। এক্ষেত্রে, সমালোচকের ভূমিকা যুগপৎ পাঠক ও দার্শনিকের ভূমিকা। কিন্তু, ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে পাঠক ভূমিকাই সমালোচকের একমাত্র ভূমিকা।[৩] সাধারণ ভাবে সমালোচনা বলতে ব্যবহারিক সমালোচনাকেই বোঝায়। ব্যবহারিক সমালোচনা সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, সাহিত্যতত্ত্ব সেরকম নয়। তাকে ব্যবহারিক সমালোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে, ব্যবহারিক সমালোচনার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করতে হয়।[৪] আসলে, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনা -দুই-ই প্রাসঙ্গিক, আলোচ্য বিষয়।

বুদ্ধদেবের অনেক আগে বাংলাসাহিত্যে যথার্থ সাহিত্য সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি সাহিত্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন না। ব্যবহারিক সমালোচনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বুদ্ধদেব সম্পর্কেও একথা প্রয়োজ্য। তিনিও সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কে পৃথক ভাবে প্রবন্ধ রচনা করেন নি। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর বিভিন্ন সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের মধ্যেই কোথাও সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিতভাবে, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে, কিন্তু সর্বত্রই আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে বিবৃত হয়েছে। কবিতা পত্রিকা প্রকাশ-ই প্রাথমিকভাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির জন্মের কারন। প্রবন্ধগুলি ছাড়াও কাব্যগ্রন্থ অনুবাদের ভূমিকা বা মুখবন্ধে ধরা আছে তাঁর সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ। যেমন - 'শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা অনুবাদ' গ্রন্থের ভূমিকা, কালিদাসের 'মেঘদূত' অনুবাদের ভূমিকা, রিলকের কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা, 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা' অনুবাদের ভূমিকা, এবং 'ডঃ জিভাগো'র ভূমিকা। এছাড়া, 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' শিরোনামের গ্রন্থটিতেও তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষতঃ কাব্যচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য বুদ্ধদেবের সাহিত্যচিন্তাকে কয়েকটি দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন —
১। সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য ২। সমালোচনা ও প্রকৃত সমালোচক ৩। কবিতা ও আধুনিকতা

। ১ ।

প্রথম গুচ্ছ ঃ সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য

এখানে সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য, তার স্বরূপলক্ষণ ইত্যাদি এবং সাহিত্য কী ? অন্যান্য

বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কী ? পার্থক্যই বা কোথায় ? এইসব প্রশ্নগুলির একটা তত্ত্বগত মীমাংসার চেষ্টা আছ এই গুচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের সৃজনপ্রক্রিয়া, রচনাপ্রয়াস, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা, প্রতিভা, অনুকরণ, সাহিত্যসৃষ্টির কলাকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়েছে এখানে। তবে বুদ্ধদেবও যেহেতু সাহিত্যতত্ত্ব রচনার জন্য কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পৃথকভাবে রচনা করেননি, তাই তাঁর এইসব সাহিত্যসিদ্ধান্তগুলির আলোচনাও বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে, পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে।

সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের ধারনাগুলি এরকম - সাহিত্য বা শিল্প কোনো উদ্দেশ্যমূলক রচনা নয়। যে শিল্প কোনো সাংসারিক, সামাজিক, উদ্দেশ্য সাধনের বেশি আর কিছুই করেনা, তা সাংবাদিকতার মতোই অচিরস্থায়ী। অর্থাৎ, সাহিত্য হবে উদ্দেশ্যহীন স্বাধীন সৃষ্টি। কোনো শিল্পী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, শিল্পসৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

> শিল্পীকুলে নমস্য তাঁরাই, যাঁরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ
> করলেও সেটাকে বিপুলভাবে অতিক্রম করে যান।[৫]

অনেক সময় ফরমায়েশি শিল্প রচিত হয়েছে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায়, কোনো ধর্মগুরুর অনুজ্ঞায়, অথবা আধুনিক যুগে জনতার মনোরঞ্জনের জন্য, গৃহসজ্জার উপাদান হিসেবে, অবসর-বিনোদনের উপায় হিসেবে, অথবা, কোনো সর্বজনীন অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে-ছবি, সাহিত্য, সঙ্গীত, মানবসমাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে বিষয়ে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

> সেটা শিল্পের উপলক্ষ শুধু হতে পারে, লক্ষ্য কখনোই নয়।[৬]

এমন বহু শিল্প-রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি, যার পিছনে কোনো চাহিদা মেটানোর ব্যাপার নেই। এবং যা রচনা করতে গিয়ে

> শিল্পী কল্পনাও করেননি যে, এর জন্য কোথাও কোনো পাব্লিক বা
> পৃষ্ঠপোষক অপেক্ষা করে আছে।[৭]

উদাহরণ হিসেবে তিনি সেজান এর আপেল ভ্যান গঁগ্ এর হলুদ রঙা চেয়ার, হ্যেলডার্লিনের কবিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, এগুলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবর্জিত, কোনো নির্জন মানুষের স্বগতোক্তি বা অদৃশ্যের সঙ্গে সংলাপ, যার জন্য 'চাহিদা' তারা নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছে।[৮] মহাকবি কালিদাসের প্রসঙ্গ উল্লেখকরে বুদ্ধদেব বলেছেন তিনি বিক্রমাদিত্যের মনস্তুষ্টির জন্য 'মেঘদূত' লেখেননি। শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হ'লো যে কোনো দেশের বা সময়ের শিল্পই হোক্না কেন, অভিনেয় নাটক, উপন্যাস, চিত্র বা গীতিকাব্য সর্বত্রই আছে কিছু না কিছু উদ্বত্ত, বর্ণিত বিষয় অথবা বক্তব্যকে যা ছাড়িয়ে যায়। এবং যার আবেদন শুধু আমাদের বিনোদনলিপ্সা বা সামাজিক সত্তার কাছে নয়,

> সেটাকে বলতে পারি এক উচ্ছ্বলন, এক আশাতীত অনুভূতি[৯]

যাকে কোনো সংজ্ঞার মধ্যেও ঠিক বাঁধা যায়না। কিন্তু আমরা জানি, সেই গুণের জন্যই রচনাটি বা শিল্পকর্মটি মূল্যবান। শিল্পকলার এই সম্ভোগ বুদ্ধদেবের মতে,

> নিশ্চেষ্ট কোনো সম্ভোগ নয়, একটি অভিজ্ঞতাও ঃ নিছক সুখবোধ নয়,

আবিষ্কার।[১০]

শিল্পকলার কাছে আমরা যা পাই, তা এইরকম-ই এক বোঝাপড়া, এক বিনিময়, অনুভূতির এক নিবিড় অভিজ্ঞতা। একে তাই তিনি 'আলস্যজীবীর বিলাসিতা' বা 'উচ্চাঙ্গের কোনো আমোদ প্রমোদ'[১১] বলতে চাননি।

মানুষের পক্ষে শিল্পকলা প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন ধর্ম, সমাজনীতি ও বিজ্ঞান, তেমনি। কিন্তু, ভিন্নভাবে, ভিন্নকারনে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> নীতিশিক্ষা নয়, জ্ঞানলাভ নয়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়-ই নয়,
> মানুষের আত্মার পক্ষে, দেহ প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে রচিত তার সামগ্রিক
> সত্তার পক্ষে রহস্যময়, অবিচ্ছেদী এক প্রয়োজন।[১২]

শিল্প বা সাহিত্য কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর ও আছে তাঁর 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'সাহিত্য কেন ?' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি লিখেছেন —

> সাহিত্য মানুষের মনে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছা জাগায়।
> সাহিত্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।[১৩]

রাষ্ট্র, সমাজ বা আচারনির্ভর লৌকিক ধর্মের মতো মানুষের স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গেও জড়িত নয় শিল্পকলা। মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে শিল্পকলাই একমাত্র যার কোনো সামাজিক, সাংসারিক প্রয়োগ নেই। কোনো মতবাদেরও শিক্ষা দেয়না তা। একটি কবিতা, ছবি বা সুবিন্যাসের সম্পূর্ণ মূল্য তার নিজের-ই মধ্যে, তার নিজত্ব ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় নেই। বুদ্ধদেবের মতে, এই শিল্পকলা 'এক অর্থে বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম।'[১৪]

শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

১। শিল্পকলা সামঞ্জস্যের প্রতিমূর্ত্তি।[১৫] মানুষের সৃষ্টি ধর্ম ও বিজ্ঞান, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এই সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, এমনকি, মানুষের দৈহিক ও আত্মিক জীবনের মধ্যেও এই সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা পরিলক্ষিত। এই বহুবাঞ্ছিত ও অতিদুর্লভ সামঞ্জস্য তিনি শিল্পকলাতেও প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সামঞ্জস্যের ধারনাকে বুদ্ধদেব ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে —

> সৌন্দর্য মানেই নির্বাচন, সামঞ্জস্য, বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়।[১৬]

এই সমন্বয় ছন্দোবদ্ধ কোনো চরণে, কোনো সুগঠিত গদ্যবাক্যে, সুর অথবা রেখার কোনো বিন্যাসে।

> স্বরের সঙ্গে স্বরের ও ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সংগতি, এক
> অংশের সঙ্গে অন্য সব অংশের ভারসাম্য ও মৈত্রী, ধ্বনির সঙ্গে
> ধ্বনির সহযোগিতা ... বাগর্থের অর্ধনারীশ্বরমিলন।[১৭]

কবি যখন কবিতা লেখেন, তখন কবির মনে কত কথার-ই তো ভীড় থাকে, কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বেছে নেওয়া, নির্বাচন বা চয়ণ করা, অথবা কথাগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজিয়ে নেওয়াই আর্ট

বা শিল্পকলা।[১৮] এই সামঞ্জস্য, সুষমা বা শ্রী শিল্পকলার চরম লক্ষ্য।[১৯]

২। আর্ট বা শিল্পসাহিত্যে অতিরঞ্জনেরও একটি জায়গা আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন

> আর্টে অতিরঞ্জনের স্থান নেই, এমন নয়। হাস্যরসের উৎসই হ'লো অতিরঞ্জন।[২০]

হাস্যরস ছাড়াও অতিরঞ্জনের ব্যবহার হয়। সেক্ষেত্রে, অতিরঞ্জন সার্থক হবে যদি তাতে থাকে মাত্রজ্ঞান 'শিল্পীর মজ্জাগত রসবোধ'।[২১]

৩। শিল্পকলার প্রভাব যূথমানসে নয়, ব্যক্তিমানসে। বুদ্ধদেব মনে করেন, শিল্পকলার এই প্রভাব-প্রগাঢ় হলেও কোনো প্রতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস বা রাষ্ট্রনীতির মতো তা একসঙ্গে লক্ষ কোটি মানুষকে উন্মাদ করে দিতে পারেনা।[২২]

সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও কলাকৌশল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য কখনোই কবি বা সাহিত্যিক কে দায়ী করা ঠিক নয়, বরং দায়ী তার সামাজিক পরিবেশ। কেননা, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে কখনোই স্থির থাকেনা। সাহিত্যে শুধু বিষয়বস্তুর প্রাধাণ্য হলে এক যুগের সাহিত্য অন্য যুগে পড়া যেতোনা। অনেক সময় কোনো ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে আমরা এও ভুলে যাই যে, বিষয়ের দ্বারা কবিতা হয়না, কলাকৌশল-ই শব্দ সমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে এবং কলাকৌশল বিষয় নিরপেক্ষ।[২৩] শুধু বিষয়বস্তু দিয়ে কবিতার বা যেকোনো শিল্পের বিচার করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রতিপদে। কারন, একই বিষয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ হলেও অন্যের কাছে নাও হতে পারে। তাই কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারেনা।[২৪] অন্নদাশংকর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, ছড়া লিখতে বসেও বিষয়টা অন্নদাশংকরের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। রচনার রূপ বিষয়কে অতিক্রম করেছে, তাঁর আনন্দ পার হয়েছে সাময়িকতার সংকীর্ণতা।[২৫] মোটের উপর সাহিত্যে বিষয় অপেক্ষা রূপ গুরুত্বপূর্ণ। রূপ ভালো না হলে, বিষয় যত ভালোই হোক, তার মূল্য সামান্য। কিন্তু বিষয় খুব ভালো না হলেও কেবলমাত্র রূপের জন্য সাহিত্য চিরকালীনতার দাবি করতে পারে।

আমরা সাধারনতঃ বলি যে, বড়ো লেখকের লেখা হবে চিরন্তন। তাঁর দৃষ্টি এতদূরে প্রসারিত যে, তাঁর স্বকালের বহুযুগ পরেও তাঁর লেখা মূল্যহীন হয়ে পড়ে না। চিরকালের পটভূমিকায় যখন আমরা তাঁকে দেখি, তখন-ই তাঁর অগ্রগামিতা উপলব্ধি করা সম্ভব। তাছাড়া,

> বড়ো লেখকেরা সকলেই একদিক থেকে যেমন চিরন্তন, তেমনি অন্য দিক থেকে সমকালীন, স্বীয় সময়ের আদর্শ অনুসারে আধুনিক। ... সমকালীনতা লেখকদের একটা মস্তগুণ।[২৬]

কোনো লেখকের পক্ষেই বর্তমানকে একেবারে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতের জন্য লেখা সম্ভব নয়। বর্তমান লেখকের উপজীব্য, ভবিষ্যতে যদি কোনো আলো তিনি ফেলতে পারেন, সে আলো পড়বে বর্তমান প্রসঙ্গে

প্রতিহত হয়েই। নিজের কালকে তিনি যদি ভালোরকম বুঝে থাকেন, তাহলেই তাঁর লেখায় হয়তো ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত ধরা পড়বে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

শেষ-বিচারে মানতেই হবে যে, লেখকের ধর্মই সমকালীনতা।[২৭]

সাময়িক প্রসঙ্গকেই শিল্পী অবলম্বন করবেন। কিন্তু সেই সাময়িক দেশকাল অতিক্রম করে চিরকালের পটভূমিকায় দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেখানেই শিল্পকলার মহত্তম পরিচয়।[২৮] মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা দেশকালগত হলেও যে কোনো যুগের যেকোনা যুদ্ধের ভাষ্য রচিত হ'ল সেখানে।[২৯] প্রতি যুগেই আপন প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তার নতুন ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে। উদাহরণ হিসেবে তিনি (বুদ্ধদেব) রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির কথা বলেন। ১৯১২ সালে রচিত এই গান ইতিহাসের বিচিত্র গতিবিধির ভিতর দিয়ে চলেছে, কিন্তু , আজও পুরোনো হয়নি। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এই একই গান প্রচলিত, এবং ভারতের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার যতোই না পরিবর্তন হোক, এই গানের প্রাসঙ্গিকতা, নিত্য সাময়িকতা ম্লান হয়নি। সেই সাহিত্যই বড়ো সাহিত্য যা সর্বযুগেই সাময়িক, যাতে প্রতি যুগ-ই ঠিক যেন আপন মর্মকথাটি শুনতে পায়। তাতে, বলার চাইতে না-বলার অংশ থাকে বেশি। এবং সেই না-বলা টুকু প্রতি যুগ তার নিজের অর্থ দিয়ে ভরিয়ে নেয়। এই গুণকেই বলা যেতে পারে চিরন্তনতা। বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'সত্যিকার আধুনিকতাও হয়তো তাই।'[৩০]

সাহিত্যের উপর, কবিতার উপর সময়ের অমোঘ প্রভাবের কথাও বলেছেন বুদ্ধদেব। অবশ্য এ নতুন কথা নয়। তবু, 'কালের পুতুল' গ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধে অদৃশ্যকালের এক বিরাট ভূমিকার কথা তিনি বারম্বার উল্লেখ করেছেন। আমাদের সাহিত্যরচনা, আমাদের সাহিত্যবিচারের প্রচেষ্টা নিয়ে কাল যে বিচিত্র নৃত্যের আয়োজন করে, তার মতো নিশ্চিত, তার মতো অনিশ্চিত আর কিছু নয়।[৩১] সৃষ্টিমাত্রেই সময়সাপেক্ষ। বিশেষতঃ শিল্পকলার বিবর্তনে কালের দুর্জ্ঞেয় প্রভাব অমোঘভাবে কাজ করে থাকে।[৩২]

আর, সাহিত্য যত পুরোনো হয়, ঐতিহ্যের পরিধিও তত বাড়ে। প্রতি যুগের প্রধান কবিরা ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ছোট ছোট যেসব বদল অনুভব করেন, তাতেই কবিতা নতুন হয়ে জন্মায়। কেউ হয়তো আপাত দৃষ্টিতে কোনো বদল করেন না, মামুলি নিয়মেই লেখেন, কিন্তু সেই মামুলিকেই এমন করে ব্যবহার করেন, যা পুরোনো কবিরা করেননি। পুরোনোর পুনরাবিষ্কারেও মৌলিকতার পরিচয় থাকে। একই ছন্দ থেকে দুই কবি দুই প্রকার সুর বের করেন।

এই সব ছোট ছোট সংকোচন, প্রসারণ, সংকলন, বিকলন,
পরিশীলন - এর ক্ষেত্র অপরিসীম এবং এসবরে মধ্যেই
আধুনিককালে বিভিন্ন যুগের চিহ্ন ধরা পড়ে।[৩৩]

সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক ও পার্থক্য নিয়েও আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। সবক্ষেত্রেই মৌলিকতা এক বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মৌলিকতা দেখা দিলে, তাকে মেনে না নিয়ে উপায় থাকেনা। কোনো আবিষ্কার ঘটলে, কারো সাধ্য থাকনো যে তাকে উড়িয়ে দেবে।[৩৪] এমনকি,

চলতি ধারনা ভণ্ডুল করে কোনো মৌলিক আবিষ্কার ঘটলেও তার অঙ্গীকরণে দেরি হয়না।[৩৫] অন্যদিকে, সাহিত্যক্ষেত্রে, মৌলিক আবিষ্কার ধরা পড়তে দেরি হয়। চলতি মতের বিরোধী হলে তখনকার মতো নিন্দুকের দল ভারী হয়।[৩৬] দ্বিতীয়তঃ বস্তুর, তথ্যের যথার্থ সত্তা নিরূপণ করা বিজ্ঞানের কাজ ; বস্তুর, তথ্যের যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা সাহিত্যের কাজ।[৩৭] বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, বিজ্ঞানের একটা বিজস্ব ভাষা বা পরিভাষা আছে। কিন্তু সাহিত্যের কোনো পরিভাষা নেই, তার ভাষা সকল মানুষের, সচল জীবনের বরং মানুষের ভাষাই তার উৎপত্তিস্থল।[৩৮]

সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, কোনো সাংবাদিক রচনা সাহিত্যের স্তরে পৌঁছালো কি-না সেটা যাচাই করার একটা উপায় হ'লো নিজেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যে, লেখাটা আমার যে ভালো লাগলো তা তথ্যের জন্য, না মতের জন্য, না রূপের জন্য। যদি একথা বোঝা যায় যে, লেখাটা যেমন-ই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছে, সেটা খুব ভালো কথা, তাহলে, তাকে আর যাই বলা হোক, সাহিত্য বলা চলেনা। আর যদি মনে হয় যে, লেখক ভুল বলছেন, তাঁর কথা মানিনা, কিন্তু লেখাটা ভালো লাগলো। তাহলে বুঝতে হবে যে সাহিত্যের শক্তি তাঁর মধ্যে কাজ করছে। আর, যদি উভয়কে পাওয়া যায় একই সঙ্গে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু, সেখানেও অবহিত হওয়া দরকার যে, লেখা ভালো লাগছে এবং যার জন্য লেখাটি ভালো লাগছে, সেটা মত নয়, তথ্য নয়, সেটা রূপ।[৩৯] বুদ্ধদেব মনে করেন, সাহিত্যে সাংবাদিকতার স্থান থাকতেই পারে। এমন অনেক সাহিত্যের নজির আছে ইতিহাসে, সেখানে পদ্য-সাংবাদিকতা বা গদ্যসাংবাদিকতা স্থায়ী সাহিত্যের আসন পেয়েছে। সাংবাদিকতায় সাময়িক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে, সেই সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। যেখানে মূল্যটা হ'লো সংবাদের বা সাময়িক মতের সেখানে অচিরতার আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে মূল্য দেওয়া হয় সাহিত্যের রূপকে, মতামত সেখানে গৌণ, সেখানে এ সমস্যা থাকতে পারেনা।[৪০]

আবার, সাহিত্যিক বা রচনাকারের style, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুকরণ, প্রেরণা, প্রতিভা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্বন্ধেও বুদ্ধদেব তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করেছেন। ভালো স্টাইলের অধিকারী না হয়েও ভালো গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিক হওয়া যায়, প্রাবন্ধিক হওয়া যায়না। কেননা, গল্প তার ঘটনা প্রবাহের বেগে বয়ে চলে ; রচনার শৈথিল্য, ভাষার জড়তা, গল্পের নেশায় পাঠক সব-ই ক্ষমা করতে প্রস্তুত।[৪১] প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সেসব উপেক্ষা করার উপায় থাকেনা। গল্পলেখকের ভাষবিন্যাসের দিকটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা হয়না। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখকের ভাষাবিন্যাসে নানারকম দুর্বলতা চোখে পড়তে পারে। অগোছালো, এলোমেলো রচনা কখনোই সার্থক প্রবন্ধ হতে পারেনা। শুধুমাত্র তথ্যবহ রচনা হলেই তাকে প্রবন্ধ বলা যাবে না। ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, অকারণ বিশেষণপ্রয়োগ, অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি প্রভৃতি দুর্লক্ষণ ছাড়িয়ে যেতে হবে। বাংলা ভাষার একটি পরিমিত, মার্জিত, তন্বী চেহারা বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছেন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে সবচেয়ে বেশী করে। তাঁর এমনও মনে হয়েছে যে, আজকের দিনের লেখকদের উপরে এর প্রভাব পড়া উচিত ছিলো। এবং এর প্রভাব

ব্যাপক হলে বাংলা গদ্যের অন্য একটি ধারা এতোদিনে দেখা যেতো।[৪২]

সাহিত্যে অনুকরণ বা অনুলিখন একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। বুদ্ধদেবের মতে, অনুকরণ আর অনুলিখন এক নয়।[৪৩] সাহিত্যরচনার কৈশোরকালে অনুলিখন প্রয়োজনীয় এবং উপকারী চর্চা। কিন্তু যখন প্রকাশিত হবার সময়, অন্যকে শোনাবার পালা, 'তখন চাই স্বীয় কণ্ঠস্বরে অধিকার।[৪৪] পূর্ববর্তীরা যা ভালোভাবে করেছেন, তার পুনরুক্তি অর্থহীন।

> অগ্রজ যা করেছেন, আমিও ঠিকঠিক তাই করবো, এটা অনুলিখনের
> অর্থে অনুকরণ।[৪৫]

একে এতোটাই আত্মস্যাৎ করতে হবে যে, সেই অগ্রজ তাঁর সময়ে, তাঁর অবস্থায় যেরকম করেছিলেন, একজন লেখক নিজের সময়ে, নিজের অবস্থায় সেরকম করতে পারবেন। সেই সূত্র শিখে নিতে পারলে একজন লেখকের লেখা অবিকল তাঁর অগ্রজের লেখার 'মতো' হবেনা। কিন্তু তুলনীয় হতে পারে, কেননা, সেটাও তখন মৌলিক রচনা।[৪৬] তাছাড়া, বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন,

> আক্ষরিক অনুকরণে বস্তুর স্বরূপ ফোটে না। স্বরানুকৃতির ঠকমকিতে
> শিশুর কান ভোলে, বয়স্ক মন তৃপ্ত হয়না।[৪৭]

অনুকরণ কথাটি এখানে কাব্যতত্ত্বের একটি মৌলিক ধারণা রূপে কাব্য ও জগতের সম্পর্ক হিসেবে আসছেনা আসছে পূর্ববর্তী লেখকশিল্পীর অনুসৃতি হিসেবে। সেই অর্থে কবি পূর্ববর্তী লেখকের থেকে যেখানে স্বতন্ত্র সেই স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠার কথাই তিনি বলেছেন। এখন প্রশ্ন হ'লো কার অনুকরণ ? প্রথমতঃ নিজের সাহিত্যের ঐতিহ্যেই কবিরা আশ্রিত বলে মাতৃভাষার নিকটতম বা মহত্তম অগ্রজরাই অনুকরণযোগ্য। বুদ্ধদেব মনে করেন, পরিণতির প্রবণতা থাকলে কবি নিজের সাহিত্যে আবদ্ধ থাকেন না। দেশে, কালে নানান দূরবর্তীর মধ্যে উৎসের সন্ধান করেন।

> বিশেষতঃ বাঙালি লেখকের নিজস্ব পুঁজি বেশি নয়, এবং 'মহিমার
> উচ্চ চূড়া' বলতে রবীন্দ্রনাথকেই বোঝায়, তাই ইংরেজি বা ফরাশির
> তুলনায় বাঙালি লেখকের বিশ্বচর হবার সুযোগ যত কম, প্রয়োজন
> ততই বেশি।[৪৮]

তিনি বিশ্বাস করেন,

> এখন যাঁরা আমাদের প্রবীণতম আধুনিক কবি, সামনে পাশ্চাত্ত্য
> কবিতার দৃষ্টান্ত ছিলো বলে তাঁরা যথাসময়ে রবিচক্র ছেড়ে বেরোতে
> পেরেছিলেন।[৪৯]

তাছাড়া, পৃথিবীর কোনো সাহিত্যই স্বয়ংসম্পূর্ন নয়। বাংলা এখনো আপরিণত বলে সংমিশ্রণের প্রয়োজন আরো বেশি।[৫০] এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে

> বিশ্বপরিচয় চাই, সাহিত্যের সাত্যিকার বড়ো বড়ো আদর্শের সঙ্গে পরিচয়।[৫১]

অবশ্য, তিনি সবসময় পাশ্চাত্ত্য আদর্শের কথা বলেননি। এই ব'লে আক্ষেপ করেছেন যে, হাতের

সবচেয়ে কাছে যে বড় আদর্শটি আছে, তার সঙ্গে ও আমাদের মুখচেনা নেই। আমরা সংস্কৃত পড়িনা। এবং পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজি,বাংলায়, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর রচনা পড়ি। ফলে, পাঠ্যে-অপাঠ্যে ভেদবুদ্ধিটা জাগ্রত হতেও আমাদের দেরি হয়। ভালো কে চিনতে পারলে, সেই বিচার ক্ষমতা থাকলে, তবেই ভালো লেখার প্রশ্ন ওঠে। কোন আদর্শ উপকারী, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, সেটি জানলে তবেই অনুকরণ সার্থক হতে পারে।[৫২] নবীন কবিদের উপর পূর্ববর্তীদের প্রভাব পড়বেই, তাতে কবির স্বকীয়তা ক্ষুন্ন হয়না।[৫৩]

> অনুকরণ করতে হলে প্রতিভা থাকা দরকার। প্রতিভা কী ?
> তা-কি বুদ্ধির-ই কোনো উচ্চরত স্তর, না-কি বুদ্ধির সীমাতিক্রান্ত
> কোনো বিশেস ক্ষমতা, যার প্রয়োগের ক্ষেত্র এক ও অনন্য ?[৫৪]

ইংরেজি শব্দে অলৌকিকের যে আভাস আছে, সেটা স্বীকার্য হলে প্রতিভাকে একধরনের আবেশ বলতে হয়, আর তা হয়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর।[৫৫] প্রতিভাকে অলৌকিক বলে ধরে নিলে বলতে হয় যে সহজাত বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবেই উত্তম কবিতা রচনা সম্ভব। রচয়িতা অন্যান্য বিষয়ে হীনবুদ্ধি হলেও কিছু এসে যায়না। ঐ বিশেষ ক্ষমতাটি শুধু দৈবক্রমে ও সহজাতভাবেই প্রাপণীয়। পক্ষান্তরে, প্রতিভাকে উন্নতবুদ্ধি বলে ভাবলে কবি হয়ে উঠেন এমন এক ব্যক্তি, যাঁর ধীশক্তি কোনো ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক কারনে কাব্যরচনায় নিয়োজিত না হলে তিনি বণিক, বিজ্ঞানী বা কূটনীতিজ্ঞ রূপেও বিখ্যাত হতে পারতেন। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ? বুদ্ধদেব নিজে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই উত্তর খুঁজে নিতে চেয়েছেন। লিখেছেন যে, জগতের কবিদের মধ্যে এত বিভিন্ন ও বিরোধী ধরনের চরিত্র দেখা যায়, এত বিচিত্র প্রকার কৌতূহল বা অনীহায় তাঁরা আক্রান্ত, এত বিভিন্নভাবে তাঁরা কর্মিষ্ঠ ও নিষ্ক্রিয় এবং উৎসুক ও উদাসীন ছিলেন যে, ঠিক কোন্ লক্ষণটির প্রভাবে তারা সকলেই অমোঘভাবে কবি হয়েছিলেন তা আবিস্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে।[৫৬] তাহলেও, ট্যালেন্ট বা ব্যক্তিগত প্রতিভায় তিনি বিশ্বাস করেন। আর, বিশ্বাস করেন, কবিতার ইতিহাসের যে অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে, তাতে পরিশ্রম অপরিহার্য। তাঁর প্রতিভার তত্ত্বেই আছে শ্রমের সম্পর্ক। তিনি ইন্সপিরেশন মানেন না এমন নয়, কিন্তু সেই দৈব দয়ার উপর অবিরাম নির্ভর করে চলার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। বরং সেই দয়াও যাতে মাঝে মাঝে অর্জন করা যায়, তার জন্যেও তৈরি থাকা দরকার। এই প্রস্তুতির-ই নাম অনুশীলণ, এবং তার মূল্য এতটাই যে, 'হয়তো স্বেদ ক্ষরণের চক্রান্তেই প্রেরণা ধরা দেয়।'[৫৭] কখনো অবশ্য বলেছেন —

> যা লিখছি তা ভালো হবে কি হবেনা, তা পুরোপুরি দৈবের উপর
> নির্ভর করছে, আমি ভাগ্যের গাঙে গা ভাসিয়ে চলেছি। যেটা উৎরে
> গেলো, সেটার জন্য আমার কোনো দায়িত্ব নেই।[৫৮]

এখানেই তিনি উল্লেখ করেছেন এমনও নয় যে, কোনো লেখাই কখনো আটকে যেতোনা। কঙ্কাবতীর 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি প্রথম স্তবকের পর অনেকদিন আর এগোয়নি। যখন কঙ্কাবতী বই ছাপাবার তোড়জোড় চলছে, "তার-ই তাগিদে আরো কয়েকটা স্তবক তৈরী করে কবিতাটিকে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম।[৫৯] 'তৈরি করে' কথাটাই এখানে ঠিক। কেননা, তখন তিনি আর 'কঙ্কাবতী'র আবহাওয়ায় বাস করছেন না।

অর্থাৎ, বুদ্ধদেব প্রেরণায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু এর উপর-ই পুরোপুরি নির্ভর করেন না। তাই, ট্যালেন্ট বা ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা বলেন। প্রতিভাকে পুষ্টি জোগানোর কথা বলেন। হতে পারে, এলিয়ট যাকে Tradition বলেছেন - বুদ্ধদেব সেই 'Tradition and Individual Talent' প্রবন্ধটির কথা মনে রেখেই ব্যক্তিগত প্রতিভা ও স্থান, কাল ঐতিহ্যকে মিলিয়ে নিচ্ছেন। আবার, সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছিলন যে, সুধীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতণ্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ।[৬০] এই নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফল হলো কবিতা। এইজন্যই, প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর (সুধীন্দ্রনাথের) অভিযান এমন পৌণঃ পুণিক। এবং তাঁর সঙ্গে মালার্মের সাদৃশ্য একমাত্র দৈববর্জনের সংকল্পে।[৬১] কিন্তু, মানুষের পক্ষে এই দৈব বর্জন কি সম্ভব ? সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উত্থিত এই জিজ্ঞাসা হয়তো বুদ্ধদেবের-ই আত্মজিজ্ঞাসা। তাই, সুধীন্দ্রনাথের অধ্যবসায় ও নিরন্তর সংগ্রামকে তিনি ব্যাখ্যা করেন এইভাবে —

> এই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তি, এও কি দৈবের-ই দান নয় ?
> অন্ততঃ সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়-ই বলবো যে, সেই প্রথম
> কাঁচা হাতের খাতা থেকে 'সংবর্ত', 'দশমী'তে তার উত্তরণ পর্যন্ত
> যে গতিবেগ কাজ করে গেছে, তারই অন্য নাম প্রেরণা।[৬২]

এখানেই, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেবের কাব্যাদর্শগত ভিন্নতা। সুধীন্দ্রনাথ শুধু অধ্যবসায় ও চেষ্টার কথা বলেন, বুদ্ধদেব এর মধ্যেই উপলব্ধি করেন এক দৈব প্রেরণা। তিনি মনে করেন এই অধ্যবসায়ের শক্তিও দৈবের-ই দান।[৬৩] অন্নদাশংকরের 'নূতন রাধা' সমালোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, মনের কথাটুকু - শুধু নিজের নয়, পাঁচজনের মনের মতো করে বলতে পারা যে শক্তি সাপেক্ষ শুধু তাইনয়, ভাগ্যের অনুকম্পা হ'লে তবেই যে, তা বলা যায়, একথা আর কেউ না জানুক, অন্য কবিরা জানেন।[৬৪] বলাবাহুল্য, বুদ্ধদেব এখানে প্রেরণার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক কবি - 'ভাগ্যের অনুকম্পা'য় বিশ্বাস করেন। ইংরেজীতে একেই বলা হয়েছে ইন্সপিরেশন। বুদ্ধদেব এখানে সম্পষ্টতঃই বুঝিয়ে দিলেন ; কবিত্বশক্তি এক স্বতন্ত্র শক্তি, মানুষ ইচ্ছে করলেই কিংবা কেবলমাত্র প্রচেষ্টা দ্বারা কবি হতে পারেন না। মানুষের যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে এক ঐশ্বরিক শক্তি একে নিয়ন্ত্রিত করে। যিনি এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি কবি। হয়তো এজন্যই কবিদের সম্পর্কে বলা হয় 'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ'। কবিদের প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা তাঁর অসীম শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করেন, আর কবিরা কাব্য সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার মতোই তিনিও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী।

। ২ ।

দ্বিতীয় গুচ্ছ ঃ সমালোচনা ও প্রকৃত সমালোচক

সমালোচনা কথাটাকে সবসময়-ই খুব সুনির্দিস্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়না। অনেকসময় যেকোনোরকম সাহিত্য আলোচনাকেই সমালোচনা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা কথাটাকে একটা

বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন।

> যাকে আমরা সাহিত্য সমালোচনা বলি, সাহিত্য বিচার শব্দটাকে
> আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি।[৬৫]

বিচার হলো পরিচয় - তাকে যাচাই করা, বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য।

> সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।[৬৬]

সমালোচনার একটি সুদৃঢ় উজ্জ্বল আদর্শ পরিণত সাহিত্যের প্রধাণ লক্ষণ। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এই সুদৃঢ় আদর্শের অভাব লক্ষ্য করে, বুদ্ধদেব লিখেছেন — সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে সেটি একটি অন্তরায়। আর, সেই বাধা দূর করার একটা প্রত্যক্ষ উপায় হ'লো 'অন্যের রচনার বিচার করা।'[৬৭] রবীন্দ্রনাথ নিজে একাজ একাধিকবার করে বাংলাসাহিত্যকে পরিণতির পথে পৌঁছে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলার কথা বলেছেন। বুদ্ধদেবও মনে করেন, পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সর্বাংশে গ্রাহ্য যদি নাও হয়, সাহিত্যরসের প্রলোভনেই পাঠক সেখানে আকর্ষিত হবে, তার মধ্যে সত্য প্রচ্ছন্ন থেকে মনকে নাড়া দেবে। তাই কোনো কালেই তা ব্যর্থ হবে না।[৬৮] অর্থাৎ, সাহিত্যের ইতিহাসে যে সব সমালোচনা স্থায়ী হয়েছে, তার অধিকাংশ নির্ভুল মতামতের জন্য নয়, বরং রচনার সুষ্ঠুতার জন্য, যে কারনে সেগুলি সাহিত্যের গৌরব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাছাড়া, সমালোচনা যেহেতু ভাষায় লেখা হয় পরিভাষায় নয়, তাই সমালোচককে ভাষাশিল্পী হতে হবে। একজন সমালোচকের পক্ষে এটি একটি প্রয়োজনীয় গুণ। এমন অনেক সমালোচনা পাওয়া যায়, যাতে তত্ত্বকথা থাকলেও রূপ রসের অভাবে সেগুলি কোনো মর্যাদা লাভ করেনা। বুদ্ধদেবের মতে —

> অর্থহীন কথা দিয়ে ছন্দ সাজালে যেমন কবিতা হয়না, তেমনি
> সমালোচনা রচনার রূপটাও তো নির্বস্তুক নয়, তার আন্তরিক
> বস্তুতেই তার রূপের মূল্য।[৬৯]

তাছাড়া, কোনো মতামত কখনোই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয় বলে, সমালোচনার মর্যদা হয়তো অনেকটা কমে যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব এর মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন অন্য এক সূত্র। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যুগের বৈশিষ্ট্য, অসংখ্য বিচিত্র মতামতের সংঘর্ষ, রুচির অভ্রান্ত জঙ্গমতা, - এই সমস্ত অতিক্রম করে মানুষের সৌন্দর্যবোধ। আর, সেই ক্ষেত্রেই সমালোচনা নিজেকে প্রয়োগ করে। তাই, তার পটভূমিকা চিরন্তন, তাই সে সার্থক ও শ্রদ্ধেয়।[৭০] যাঁরা নিজেরা সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান লেখক, তাঁরা সাহিত্য বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে যা বলেন, তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ বললেও ভুল হবেনা।[৭১] একজন সমালোচক লেখক বা সাহিত্যিকের রচনা থেকে যে রস আহরণ করেন, তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসু সেই কাজটি করেছেন অধিকাংশ সময়ে। নিজের কবিতা এবং সমসাময়িক কবিদের কাব্যরস পাঠকের উপভোগের সীমায় তুলে ধরেছেন। লেখক পাঠকের বিবাহে তিনি পৌরোহিত্য করেছেন বারম্বার। ঠিক এই কথাটিই প্রমথ চৌধুরী বিষয়ক একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব প্রমথচৌধুরীকে লিখেছিলেন।[৭২] মন্তব্যটি বুদ্ধদেবের সম্পর্কে ও সঠিকভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাকে তিনি রাধার

কণ্ঠহারের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিলেন, পাঠকের সঙ্গে পুনর্মিলনে সেটা বাধারও সৃষ্টি করে।[৭৩] এবং লিখেছেন —

> তবু, একটুখানি মোহ' মনের মধ্যে থেকেই যায়, ইচ্ছে হয় আমার
> যা ভালো লেগেছে, আমি যাকে ভালো বলে জেনেছি, তা সকলেই
> ভালো বলে স্বীকার করুক।[৭৪]

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আর পাঠকের উপভোগের মধ্যেকার ব্যবধানকে তিনি দূর করতেই চেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হয়তো একারনেই লেখা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের মতে, সাহিত্যবিষয়ে কিছু বলার থাকলে তার একটি প্রশস্ত উপায় হ'লো বিশেষ কোনো কবি অথবা গ্রন্থের সমীক্ষণ, সেই অবলম্বনটিকে জড়িয়ে জড়িয়ে লেখকের চিন্তায় উন্মীলন হতে পারে। এবং কবিরা সাধারণতঃ এই ভাবেই সমালোচনা লিখে থাকেন।[৭৫] রবীন্দ্রনাথ এরকম সমালোচনা করেছেন, তিনি মনে করেন, একটি ভালো রচনা সমস্ত সমালোচনার সারাৎসার হতে পারে। কিন্তু, আলোচনার ভিতর দিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শের অভিব্যক্তি চাই, যাতে সে আদর্শ লোকচিত্তে সুস্পষ্ট হতে পারে। সেখানেই সমালোচনার সার্থকতা।[৭৬]

কালিদাসের 'মেঘদূত' গ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে লেখা বুদ্ধদেবের 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' প্রবন্ধে ও সমালোচনা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তিনি উপস্থাপিত করেছেন। লিখেছেন - কাব্যসমালোচনা ব্যাপারটি কখনো এক মৃদু, মোলায়েম ও পাণ্ডবর্ণ বিবরণের আকার নেয়, যা পাঠ করে, কবির আনুমানিক কাল, কাব্যের বিষয়বস্তু, প্রকরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য আমরা জানতে পারি কিন্তু, কাব্যটি কেমন, ভালো যদি হয়, তো কোন্ ধরনের ভালো, বিদেশী কাব্যের এবং আধুনিক পাঠকের সঙ্গে সেটি কোন্ ধরনের সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সব জরুরি বিষয় কিছুই জানা যায়না।[৭৭] বুদ্ধদেব এখানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করেছেন, কবি বা কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে কেবল কবি বা কাব্যের আনুমানিক কাল,কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ ইত্যাদি আলোচ্য নয়। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে জরুরি বিষয় হলো —

> কাব্যটি কিরকম,
> কাব্যটি ভালো হলে কি ধরনের ভালো
> বিদেশী কাব্য ও আধুনিক পাঠকের সঙ্গে তার যোগ কোথায় ?
> সম্বন্ধ-ই বা কী ?

বুদ্ধদেব তাঁর নিজের সমালোচনায় এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখকের কবিত্বশক্তি,কাব্যের কাব্যগুণ এবং বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় সেই কাব্যের স্থান কোথায় তাও দেখাতে চেয়েছেন। 'মেঘদূত' সমালোচনায় তাঁর সমালোচনার এই সুত্র গুরুত্ব পেয়েছে। তাই প্রাচ্য সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি দান্তে, এলিয়ট, র‍্যাবোঁ, রিল্কে সকলকেই প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। এবং বিশ্বসাহিত্যে 'মেঘদূতে'র স্থান নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাঠকের সঙ্গে কোথায় নাড়ীয় যোগ

অথবা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ধারার সঙ্গে কোথায় তা একাকার হয়ে যায়, তা বলতে ভোলেননি।

সমালোচনা ভালো মন্দ বাছাই করতেও শেখায়। সে শিক্ষা যত বেশি লোক, যত ভালো করে নিতে পারবে, ততই সাহিত্যে মন্দ কমে গিয়ে ভালোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। সমালোচনা পরিণত হলে, স্থাপিত হয় সাহিত্য ও অসাহিত্যে কঠিন ব্যবধান। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভালো ও মন্দ সাহিত্যের পরিমাণ যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তুলনায় মন্দের পরিমাণ বহুগুণে বেশি হয়।

> আসল কথাটা হ'ল ও দুয়ের প্রকৃতি বিষয়ে নির্ভুল ও ব্যাপক
> ভেদজ্ঞান। এই মূল্যবোধেই সমালোচনার সাধুতা; তার মতামতে
> অত্যন্ত বেশি এসে যায় না।[৭৮]

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন - যিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত বড় তিনি যখন সমালোচনার ক্ষেত্রে নামেন, তখন তাঁর কাছে আমাদের সাহিত্যশিক্ষা যত প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হবে, শুধু সমালোচকের লেখায় তা হতে পারেনা।[৭৯] তাছাড়া, সমালোচকের একটা কঠোর নীরস মূর্ত্তি আমরা সাধরণতঃ কল্পনা করে থাকি। বুদ্ধদেবের মতে, সেটা সমালোচনার একটা দিক মাত্র যেখানে পরিশ্রম দরকার, তথ্যসন্ধান দরকার,ইতিহাসের ব্যাখ্যা কিংবা আঙ্গিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার সেখানে সমালোচকের কাজ নীরস ও মমতাহীন। কিন্তু শুধু সেটাই তো সমালোচনা নয়। সমালোচনার আর একটা দিক আছে, সেটাই বড় দিক। সেটা হল সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা, সাহিত্যের মূল সূত্র উদ্‌ঘাটন করা এবং প্রসঙ্গতঃ ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ কাজ যাঁরা করেছেন, তারাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে স্বীকৃত এবং তাদের সকলের লেখাই এতখানি সরস যে, পরবর্তী যুগে তাঁদের মতামত সম্পূর্ন গৃহীত না হলেও, শুধু লেখার গুণেই পাঠকের চিত্তে তাদের রাজত্ব নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ, সমালোচনাকেই তাঁরা সাহিত্য করে তুলেছিলেন। এটিই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।[৮০] এখানে তিনি লিখেছিলেন —

> একথা ভুললে চলবেনা যে, যাকে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলছি,
> সেটা সাহিত্যের ইতিহাস বোঝাবার পক্ষেই কার্যকরী (এবং বর্তমান
> যুগের পূর্বেও এই দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা
> হয়েছে) সাহিত্যের রসবিচারে সেটা অবান্তর, শুধু অবান্তর নয়,
> ক্ষতিকর।[৮১]

অর্থাৎ কোনো লেখা ভালো কি মন্দ তার বিচারে ইতিহাসের শিক্ষা প্রয়োগ করতে গেলে পদে পদে মারাত্মক ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সাহিত্যিক আদর্শই বিচারের উপায় - প্রতিভার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সসম্মানে স্বীকার করাই সাহিত্যসমালোচনার প্রথম সোপান।[৮২]

সমালোচনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের আরেকটি বক্তব্য —

> সমালোচনা বলতে আমি বুঝি উন্মীলন ; সাহিত্যের বড়ো একটা
> পটভূমিকায় আলোচ্যকে আলোকিত করে এবং নিজের উৎসুক

চিত্তকে প্রকাশ করে, পাঠকের উদাসীন মনকে জাগ্রত করেন
সমালোচক। এ কাজে উত্তাপ চাই, উৎসাহ চাই, নিন্দার ঠাণ্ডা
সংকীর্ণতা দিয়ে তা সাধিত হতে পারেনা।[৮৩]

এবং সে সমালোচক ও বিরল, যাঁর দৃষ্টি অতীতের অভ্যাস ভেদ করে ভবিষ্যতে পৌঁছুতে পারে। সেইজন্য, এটা প্রায় -ই দেখা যায় যে, সমালোচকের কাজ যদিও ভালো লেখা চিনিয়ে দেওয়া, সমসাময়িক সাহিত্য-সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাই হতচেতন।[৮৪] বুদ্ধদেবের এমনও মনে হয়েছে যে, অতীতের আদর্শ বর্তমানের উপর প্রয়োগ করতে গিয়েই এই ভুল সমালোচক করে থাকনে। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার কথা বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের বিচার করে রবীন্দ্রনাথ

এটা শেখালেন যে, দু চারটা রংদার ইয়ারকি করতে পারাটাই
সমালোচনা নয় ; গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দই প্রকৃত সমালোচনার উৎস।[৮৫]

অর্থাৎ, যে কবিকে সমালোচকের ভালো লাগলো, সেই ভালোবাসা অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই সমালোচনার মহত্তম কাজ।[৮৬]

সমালোচনার কাছে শেষ কথা বলে কিছু নেই। সাহিত্য বা শিল্পকলা এমন বিষয়, যা নিয়ে শেষ কথা কেউ কখনো বলতে পারেনি।[৮৭] কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রবর্তনা করে, সমালোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হয়েছে বার বার। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

বার-বার সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছে নবীন জীবন্ত সাহিত্যের অভাবনীয়তা।[৮৮]

যাকে Exact Science বলে, সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত। এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সব-ই মোটামুটির কথা। যাঁদের রচনায় সত্যের আভাস বার-বার পাওয়া যায়, এবং উজ্জ্বলভাবে পাওয়া যায়, সমালোচক হিসেবে তাঁরাই আমাদের নমস্য। তাঁদের মতামতের দেহ কালের দংশনে জীর্ণ হতে পারে, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে সত্যদৃষ্টির যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে, তা ম্লান হয়না।[৮৯] বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন, আমাদের দেশে সমালোচনা বলে একধরনের লেখা প্রচলিত, তাতে মাত্রাজ্ঞান আশা করাই অন্যায়। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হয় বিজ্ঞাপণ, নয় নিছক নিন্দা। আর, পরনিন্দা শুনতে সকলেই উৎসুক, ফলে, শুধু পাঠক নয়, সমালোচক নিজেও এতে তৃপ্তি পেয়ে থাকেন।[৯০]

। ৩ ।

তৃতীয় গুচ্ছ ঃ কবিতা ও আধুনিকতা

বুদ্ধদেবের সাহিত্যচিন্তায় অন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে কবিতার প্রসঙ্গকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কবিতার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা অন্তহীন। সমাজ সভ্যতায় কবিতা অপ্রয়োজনীয়, একথা তিনি ভাবতেই পারেন নি, বরং ভেবেছেন - কবিতা নামক বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি,

ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু এসে যায়।[৯১]

যেমন আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক যন্ত্র, অনেক গ্রন্থি, নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, আমরা তা কখনো জানতে পারিনা, কিন্তু, কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ক্ষুন্ন হলেই পীড়িত হয়ে পড়ি। সভ্যতার উপর কবিতার বা শিল্পকলার প্রভাবও সেইরকম।[৯২] কবিতায় যে মানুষের কথা আছে, সে মানুষ আসলে আমাদের অন্তর্গত সত্তার ভিতরে খেলা করে। তার কোনো পরিবর্তন নেই কিংবা পরিবর্তন থাকলেও তা সূর্যের তাপক্ষয়ের মতো আমাদের অবোধগম্য। সমাজ জীবনের বিচিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও কবিতার তাই পুরোনো হয়না।[৯৩] কবিতাতে সমাজ সমস্যার কথাও থাকতে পারে, কিন্তু সে সমস্যা নিছক সমস্যা হিসেবে কবিতায় রূপায়িত হয়না। সমস্যা থেকে নির্যাস বের করে, তার উপর ভিত্তি ক'রে কবিতা লেখা হয়। এছাড়া, কবিতা কখনো ইতিহাস ভূগোলের সীমার মধ্যেও বাঁধা পড়েনা।

আধুনিক কবিতার প্রকৃতিগত ভিন্নতার জন্য অনেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিশ্বসংকটকে এর কারন হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু, বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

> শুধু বাইরের দিকে তাকালেই চলবে কেন, নিজের ভিতরেও
> তাকাতে হবে। মনের মধ্যে বাণীর আন্দোলন তেমন প্রবল বেগে
> যদি উপস্থিত হয়, কিছুই কি তাকে থামাতে পারে ?[৯৪]

তাঁর মতে, কবিতার শক্তির মধ্যে একটি আবশ্যিকতা আছে সে নিজেই নিজেকে লিখিয়ে নেয়, না লিখে উপায় থাকেনা কবির। কবিতার এই অনস্বীকার্য প্ররোচনা প্রত্যেক কবির মনেই থাকে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের জন্য এই প্ররোচনা জাগছেনা - এই ওজুহাত দেখানো আত্মপ্রতারণা মাত্র। তাঁর বক্তব্য —

> যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ কবিতার প্রেরণায় বাধা হ'তে পারেনা,
> এমনকি নিজেরা প্রেরণা হতে পারে ?[৯৫]

তিনি বিশ্বাস করেন, সমকালীন ঘটনার উপর ভাষ্য রচনা করে যাঁরা কবিতা লেখার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করেন এবং এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতা সাংবাদিকতায় পরিণত হচ্ছে। কেননা বহুকে নিয়ে ঘটনা, কিন্তু কবিতা একজনের সৃষ্টি। কবির সেই নির্জন মনোমণ্ডলে কখন কোন ঘটনা ঢেউ তুলবে, বা তুলবেই কি-না, তা কেউ বলতে পারবেনা। সদিচ্ছা থেকে, কর্তব্যবোধ থেকে সেখানে কিছু হয়না, নিজেকে শুধু প্রস্তুত রাখতে হয়।[৯৬] এখানে তিনি ব্যক্তিগত প্রতিভাকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিকেরা কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তার ব্যাখ্যা করেন। ঠিক ঐ সময়ে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রিক, সমাজিক, ধার্মিক আন্দোলনের জন্য কোনো সাহিত্যিক ঘটনা ঘটতে পেরেছিলো ইত্যাদি। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের এই ঘটনার স্রষ্টা হয়তো কোনো জীবিত কবি বা কোনো বিশেষ কবিগোষ্ঠী। বুদ্ধদেবের প্রশ্ন —

> যুদ্ধ হয়েছিলো বলেই দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড? না-কি এলিয়ট
> লিখতে পেরেছিলেন তাই?[৯৭]

বুদ্ধদেব এখানে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কারনের চেয়ে বিশী প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত প্রতিভার

উপর। বুদ্ধদেব এমনও মনে করেন যে, কবির নিজের পক্ষেও তাঁর সম্ভাবনার সীমা অজ্ঞেয়। মাঝে মাঝে নিজেরই কাছ থেকে তিনি অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য সুন্দর সব উপহার পেয়ে থাকেন। তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রক্রিয়াটি এমন-ই রহস্যময় যে, তা নিয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বানী করা যায়না।[৯৮]

কবিতার আত্মা কী ? এই প্রশ্নের উত্তরও দিতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব।

> কবিতায় আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, যা যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরোধী,
> বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ফল বলেই বুদ্ধির অতীত, যাকে আর তৌল করা যায় না,
> শুধু ধ্যান করা যায় ...।[৯৯]

সংস্কৃত কবিতাকে বলেছেন —

> সব-ই তার আক্ষরিক, ব্যাকরণিক ও নির্ভুল, বোধগম্য ও বিশেষণ
> যোগ্য। .... ঐ নিঃস্বনিত পদাবলীর মধ্যে কবিতাকে আবিষ্কার
> করতে সময় লাগে আমাদের, বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়।[১০০]

বোঝাই যায়, বুদ্ধদেব যাকে কবিতার আত্মা বলেছেন, তা সংস্কৃত কবিতায় নেই। কবিতা হবে আক্ষরিকতা থেকে মুক্ত, ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতার বাইরে, বুদ্ধির অতীত, বিশেষণ যোগ্যতা অতিক্রমী এমন কিছু, যাকে শুধু সাধনার সামগ্রী ভাবা যেতে পারে। শুধুমাত্র প্রসাধন, বিদ্যাবত্তা বা বৈদগ্ধ্য দিয়ে কবিতাকে বিচার করাও যায় না।

কবিতার বিষয়ে আধুনিক ধারনা ক্রমে ভিন্ন হয়ে গেছে, প্রত্যাশা পাল্টে গেছে। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, 'মেঘদূতে' কালিদাস দক্ষনারীদের যেসব পুষ্প আভরণে সাজিয়েছেন, সেই বর্ণনার শ্লোকটি 'শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন এবং সেই কারনেই মনোমুগ্ধকর।'[১০১] এতে কবির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে। কিন্তু এতে যা বলা আছে, তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, এতে বিস্ময়ের আঘাত নেই, মূর্ত-অমূর্তের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা নেই, কবিতার বিষয় অধিকৃত হতে পারে কিন্তু কোনো গূঢ় ব্যঞ্জনা তা থেকে আবিষ্কৃত হয় না। সংস্কৃত কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এখানে আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

ক) আধুনিক কবিতা মূর্ত - অমূর্তের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করবে।

খ) বিস্ময়ের চমক থাকবে আধুনিক কবিতায়।

গ) কবিতা শুধু পাঠকের পক্ষে বোধগময হবার বিষয় হয়ে থাকবে না, আবিষ্কৃত হবার দাবী নিয়ে উপস্থিত হবে।

ঘ) শুধু প্রত্যাশিত ও সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যে সীমিত হতে চায়না আধুনিক কবিতা। অসম্ভম অজ্ঞেয় বস্তুকে ছুঁয়ে যেতে পারে কবিতা।

কাজেই, আধুনিককালে, শুধু শ্রুতিমোহন, দৃষ্টিনন্দন ও মনোমুগ্ধকর কবিতা হলেই তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা বলা যাবেনা।

বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক কালে তরুণ কবিদের মধ্যে কবিত্ব বর্জনের প্রতিযোগিতা চলেছে। তাঁদের ভাষা কর্কশ, ছন্দ রুক্ষ, বলার বিষয় দৈনিকপত্রে প্রকাশিত সংবাদ। তাঁরা সযত্নে লালিত্য এড়িয়ে চলেন। সুশ্রাব্য পংক্তি তাঁরা লেখেন না। 'কিছুতেই রোম্যান্টিক হবেন না, এই তাঁদের পণ।'[১০২] রোমান্টিকতা এড়িয়ে চলেন, কারন, প্রথাগত রোমান্টিক কবিতার ভাষায় শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়, শব্দ প্রয়োগে সচেতনতার অভাব থাকে, ভাবাবেগ ও ভাবালুতার পার্থক্য সম্বন্ধেও কবি উদাসীন। বুদ্ধদেব অবশ্য মনে করেন, এই সব ত্রুটি রোম্যন্টিকতা বিরোধী কবিদের রচনায়ও দেখা যায়, তফাৎ শুধু এই যে, তথাকথিত রোম্যান্টিকদের উচ্ছ্বাসের বিষয় ফুল, পাখি, চাঁদ, ইত্যাদি আর তথাকথিত প্রগতিশীলদের উচ্ছ্বাসের বিষয় বোবা, বেঅনেট, সাইরেন ইত্যাদি।[১০৩] অর্থাৎ, এ যুগের কবিতায় প্রকৃতির ঐশ্বর্য অনেকাংশে অনুপস্থিত। এ যুগেও ব্যবহার করা হয়, এমন বেশ কিছু কবিত্বময় শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বুদ্ধদেব। প্রাক্ - বৈজ্ঞানিক যুগে যাদের অস্তিত্বই ছিলোনা। কিছু যান্ত্রিক শব্দের কবিতাবাহী গুণের কথাও বলেছেন তিনি। যেমন - রাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা রেলগাড়ির শব্দ 'ঝিঁ ঝি পোকার ডাকের চাইতে কম মূল্যবান নয়।'[১০৪] এ যুগে, অনায়াসলব্ধ বেশ কিছু দৃশ্যবস্তুর কথাও বলেছেন তিনি, যার কাব্যিক আবেদন কম নয়। কলকাতার গঙ্গার ঘাটে দেশ-বিদেশের জাহাজ এসে থামে, এর সৌন্দর্য্য কাব্যের উপাদান হতে পারে। বুদ্ধদেবের মতে, কবিতার সঙ্গে এখনো বিশ্ব প্রকৃতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এখন কোনো কবিতায় রেলগাড়ি বা টেলিফোনের উল্লেখ থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' - এর আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন - কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ।[১০৫] তিনি স্পষ্টতঃ জানিয়েছিলেন, সময় বদলাচ্ছে, কবিতার বিষয় বদলে যাচ্ছে। ইতিহাসের এক - এক পর্যায়ে কবিতার বিষয়ে পরিবর্তন আসতেই পারে। এটা অনিবার্য।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার অন্তর্গত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে বুদ্ধদেব আধুনিক কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণকে তুলে ধরেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন - আধুনিক কবিতাকে কোনো চিহ্ন দ্বারা সনাক্ত করা যায়না। একে তিনি বলেছেন বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির এবং সন্ধানের কবিতা এর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি সমূহ।[১০৬] আশা, নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা, বহির্মুখিত, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম, আধাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা - এই সবই আধুনিক কবিতার লক্ষণ। এসব লক্ষণ যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির মধ্যে পাওয়া যাবে, তা নয়, কখনো হয়তো তা পাওয়া যাবে একই সময়ের বিভিন্ন কবির রচনায়। বুদ্ধদেব উদাহরণ দিয়েছেন। যে সময়ে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর নাস্তিকতার নান্দীপাঠ আরম্ভ করলেন সেই সময়েই অমিয় চক্রবর্ত্তীর মুখে পেলাম বিশ্বাসের নতুন অঙ্গীকার -

> মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙ্গা
> দরজাটা মেলাবেন।[১০৭]

আধুনিক কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা। তবে, এই প্রেম ও প্রকৃতি একটুভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতি অন্যরকম অর্থ পেয়েছে। কখনো বা রূপকথা, কখনো নাগরিক বা বৈদেশিক

জীবনের পটভূমিকা তুলে ধরেছে প্রকৃতি।

বুদ্ধদেবের মতে, কবিতায় বিষয়বস্তু নয়, রূপরচনাই গুরুত্বপূর্ণ। কবিতার বিষয় কখনোই তার কাব্যিক গুণের অন্তরায় হতে পারেনা। সমসাময়িক বিষয়গুলি কবিতায় সহজ ভাবেই গ্রহণ করা উচিত

> কাব্যিক গুণ কি গুণের অভাব দিয়েই হবে কবিতার বিচার।[১০৮]

ফুল, পাখি, চাঁদ নিয়ে আর কবিতা হয়না এমন নয়, তেমনি, শেল, সাবমেরিন ইত্যাদি শব্দ থাকলেই তা নিশ্চিত ভাবে আধুনিক উৎকৃষ্ট কবিতা - এমন ভাবনাও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে এত ঘন ঘন ওঠানামা করে যে, শুধু বিষয়বস্তু নিয়ে কথা হ'লে একযুগের সাহিত্য অন্যযুগে প্রায়-ই পড়া যেতোনা।

> বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য দায়ী কবি নিজে নন্, দায়ী তার
> সামাজিক পরিবেশ।[১০৯]

যেমন, সাম্যবাদেই যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সাম্যবাদ হবে সাহিত্যের একটি নীরস বিষয় কেননা, সেটা নিতান্ত বাস্তব ঘটনা। কিন্তু কালসংকটে অনেক পাঠক-ই হয়তো এতে প্রলুব্ধ হতেও পারেন। কিন্তু সেটা অসাহিত্যিক কারনে। কোনো ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে আমরা নিজেরাও ভুলে যাই যে, বিষয়ের দ্বারা কবিতা হয়না, কলাকৌশল-ই শব্দ সমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে এবং কলাকৌশল বিষয় নিরপেক্ষ। একই বিষয় কোনো পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য কোনো পাঠকের চোখে দোষনীয় হতে পারে। একারনে, কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারেনা।[১১০] কবিতার অভিনবত্ব যতটুকু, তা তার কলাকৌশলে, বিষয়ে নয়।

কাব্য কবিতায় বিশ্বাসের মূল্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো - এক্ষেত্রে, বিশ্বাসের মূল্য কখনোই নৈতিক নয়, শিল্পগত। বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কবি জীবনকে বিশেষ একটি ভঙ্গিতে দেখেন বলে তাঁর বাক্যগুলি রসাত্মক বা আবেগবাহী হয়ে উঠতে পারে। এবং শিল্পের সংক্রমণ ক্ষমতা প্রবল বলে, তখনকার মতো নাস্তিক পাঠকের মনেও সে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। তাই, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পাঠকের পাক্ষেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগের কোনো বাধা থাকেনা। আধুনিক কবিদের মধ্যে আমিয়চক্রবর্ত্তীকে বুদ্ধদেব সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি বলেছেন। এবং তাঁর মতে, প্রত্যেক কবির-ই ঐ বিশেষণটিতে অধিকার আছে।[১১১] তবে, তিনি কবিতাকে একাধারে ধর্মসাধনার ফল ও উপায় হিসেবে না দেখে কবিতা হিসেবে দেখার কথাই বলেছেন।[১১২]

কবিতার দুই মৌলিক উপাদান হ'ল ভাব ও ভাষা। অর্থাৎ কবিতা লিখতে হলে কিছু বক্তব্য চাই এবং চাই এমন ভাষা যা সেই বক্তব্যের সার্থক বাহন হতে পারে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ভাব কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, এবং ভাষা বলতেও এখানে যা বোঝাচ্ছে
> তা শুধু ব্যাকারণ সম্মত বাক্য-পর্যায় নয়, ছন্দ, মিল, ধ্বনি-স্পন্দন
> এবং অন্যান্য কৌশলের দ্বারা রচিত এক রহস্যময় মায়াজাল।[১১৩]

ভাষা দুইভাবে কাজ করে। একদিকে সে খবর দেয়, অন্যদিকে সে জাগিয়ে তোলে। তথ্য বা জ্ঞানের

জগতে আমরা চাই স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাষা যার আয়তন তার সংবাদের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। কিন্তু কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙ্গেযায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি অনবরত প্রহত হতে যাকে।[১১৪] তবে, তিনি লোক-ব্যবহৃত ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার ঐক্যের কথাও বলেছেন। কবিতাকে জীবন বা স্বাভাবিক থেকে দূরে সরিয়ে দিলে,

> প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃ স্ফূর্ত্তি বর্জন করা হবে ; হার্দ্য আবেদনের বদলে
> প্রধান্য পাবে কৌশল, নৈপুণ্য, বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া।[১১৫]

এখানে তিনি স্পষ্টতঃই ভাব প্রকাশের বিস্তারের কথা বলেছেন। আবার, নিছক আবেগের বশে কবিতায় ব্যকরণ লঙ্ঘণে কোনো কৃতিত্ব আছে বলেও তিনি মনে করেন না। অমিয় চক্রবর্ত্তীর কোনো কোনো কবিতায় 'তো' শব্দের অকারন প্রয়োগ যথাযথ মনে করেন নি তিনি।

> 'উত্তমতা', 'সহসতা', সংসারতা, আসলতা, আপনতা - এদের
> বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, ... বিশেষণই বিশেষরূপে এবং
> বিশেষ সমাসবদ্ধ হয়ে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হবার শক্তি রাখে।[১১৬]

বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> মূল শব্দটাকে যথাযথভাবে খাটিয়ে নিলেই 'তো' আগমের প্রয়োজন হয়না।[১১৭]

যা ব্যাকারণ - দুষ্ট তাকে তখন-ই শুধু মেনে নেওয়া যায়, যখন তার দ্বারা কবিতার কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে।[১১৮] কিন্তু যখন তার ফলে সংবাদে বিভ্রান্তি আসে, কিংবা তা কোনোভাবেই কাজে লাগেনা, তখন এই ব্যাকরণ দুষ্টিকে মেনে নেওয়া যায়না। এজন্যই বুদ্ধদেবের মনে যায়, কবিতাও গদ্যের মতো সুলিখিত হওয়া দরকার।

কবিতার-ধ্বনি সম্বন্ধে বক্তবয হ'ল - ধ্বনি প্রকৃতপক্ষে অর্থের প্রতিধ্বনি হতে পারেনা। এবং কবিতা যে আমাদের অভিভূত ও আলোড়িত করে, সে তার ধ্বনির-ই প্রভাবে, অর্থগৌরবে নয়। কবিতা যে কখনো পুরোনো হয়না, কখনো ফুরোয়-না, কয়েকটি আপাতসামান্য শব্দের সমাবেশ থেকে যে এক অনন্য ভাবমণ্ডল উৎসারিত হয়, তার কারন-হিসেবেও তিনি ধ্বনির কথাই বলেছেন।[১১৯] 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গেও তিনি কবিতায় ধ্বনি গৌরবের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। মল্লিনাথ ও অন্যান্য টীকার সাহায্যে কালিদাসের 'মেঘদূত' সম্পূর্ণভাবে আয়ও করা যায়, অর্থ ও ব্যঞ্জনার শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু, তাহলেও 'মেঘদূত' আবৃত্তি যোগ্য, পৌনঃপুণিকভাবে পাঠযোগ্য। এর কারণ এর ছন্দ, ধ্বনি।[১২০] এখানে, 'ধ্বনির গৌরবে তুচ্ছ হয়ে ওঠে শ্লাঘনীয়।' তিনি 'মেঘদূতে'র এক একটি পংক্তিকে বলেছেন শূন্য, একতাল ও ধ্বনিময়'।[১২২] অর্থাৎ, কবিতায় ধ্বনির গুরুত্বের কথাই বলেছেন তিনি।

বুদ্ধদেব বসু কবিতায় শব্দ ব্যবহারের যাথার্থ্যের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাঁর

মতে, উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার-ই কবিতার গূঢ়তম লক্ষণ। এক-একটি শব্দ অনেক সময় ছবি ফুটিয়ে তোলে। তিনি জীবনানন্দের কবিতা উদ্ধৃত করে দেখালেন

'তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে

. . .

দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।' -

এখানে, 'মহিলা, শব্দ এমন এক মহিলার ছবি ফুটিয়ে তোলে, যিনি অত্যন্ত তরুণী নন, তিনি

সেই আধুনিকাদের একজন, বক্তারা যাঁদের 'ভদ্রমহিলাগণ'
বলে সম্বোধন করে থাকেন।[১২৩]

বস্তুবিশেষের নামগুলির মধ্যেই এমন একটা ছবি বিধৃত হয়ে থাকে যে, তা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে।

এই ছবিটা স্পষ্ট হবার জন্যই এটা দরকার যে, প্রত্যেকটি
নাম শব্দ একটিমাত্র উল্লেখের মধ্যে সীমিত থাকবে।[১২৪]

সংস্কৃতে তা, হয়না। 'বিম্বাধরা', 'নিতম্বিনী', 'ভামিনী' - এরা কোনো বস্তুর নাম নয়, বর্ণনামাত্র। এবং সংস্কৃতে এইসব বর্ননামূলক শব্দগুলি অনায়াসে ব্যবহৃত হয় কেবল বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। নূতন দ্যোতনা সৃষ্টির জন্য নয়।

যে শব্দ শুধুই বৈচিত্র্য দেয়, তা কবিতায় কিছু দিতে পারেনা।[১২৫]

তাঁর মতে, এক-একটি শব্দের বিশেষ অভিঘাত থাকে, এই অভিঘাত-ই শব্দের প্রাণ।

এক একটি শব্দ থেকে কত বেশি কাজ আদায় করে নেওয়া যায়,
আধুনিক কবির লক্ষ্য সেই দিকে।[১২৬]

আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্যও সমান নয়। মাঝে মাঝে কোনো কোনটি চাবির মতো কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়।

কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে ও বুদ্ধদেবের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। দুর্বোধ্য শব্দ কবিতায় ব্যবহার করে কোনো লাভ নেই। শব্দগুলোর জমকালো আওয়াজ কোনো কোনো কবির কাছে প্রীতিকর মনে হলেও পদে পদে অভিধান দেখে শব্দগুলো বুঝে নিতে হয়। শারীরিক আলস্য অভিধান দেখার অন্ত রায়। সাধারণ অভিধানে সব অর্থপাওয়াও যায় না। ফলে, এসব শব্দ কবিতায় ক্রমাগত ব্যবহৃত হতে থাকলে সৎপাঠক প্রতিহত হতে পারেন।[১২৭] কবিতায় ব্যবহৃত বাক্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্য এরকম - ক) কবিতার বাক্য হবে মন্ত্রের মতো ব্যঞ্জনাময় । খ) সহজ কথার মাধ্যমে জীবনের গূঢ় প্রদেশ উদ্ভাসিত করবে বাক্য।[১২৮] গ) কবিতায় ব্যবহৃত বাক্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করার জন্য সাধনার পথে অগ্রসর হবেন

কবি।

বুদ্ধদেবের মতে, ছন্দ, মিল, স্তবক বিন্যাসের শৃঙ্খলা - এসব বন্ধনেই কবি ও কবিতার মুক্তি।[১২৯] কবিরা মিল দিতে পারেন বলে অনেকের যেমন তাক লাগে, তেমনি কেউ ভাবেন ওসব বাদ দিলে কবিতা সহজ হবে, আরও পাঠক পাবে। মিল বা ছন্দ যেন নেহাৎ অলঙ্কার। বুদ্ধদেবের বক্তব্য হল

> ছন্দ ও মিল স্বাভাবিক নিয়ম। ... এই কঠিন কাঠামোয় কবি
> স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্দী করেন, তাতে তিনি যে শুধু বধো পাননা
> তা নয়, বরং ছন্দের গরজেই তার বক্তব্য স্ফুট হয়।[১৩০]

অনেক সময় মিলের বাঁধনেই কবিতার অর্থও পরিস্ফুট হয়। জয়দেব, বৈষ্ণব কবি ও বাউলের দল - প্রভৃতি যেসব কবি মিল এবং স্তবকের বিন্যাসকে পৃথকভাবে গুরুত্ব দিতেন এবং যেসব কবির হাতে বাংলা - পয়ার প্রথম রচিত হ'লো, কবিতার মূল সূত্র অধিকাংশ তাঁরাই দিয়ে গেছেন। মিলনির্ভর স্তবক যখন বিচিত্র ও জটিল হয়ে ওঠে, যখন সম বা অসমমাত্রিক কিছু পংক্তি পারস্পর যুক্ত হয়ে বার বার একই মূল রূপকল্পের অনুসরণ করে, যখন নির্ভুলভাবে ফিরে ফিরে আসে যথাস্থানে মিলের বিন্যাস ও পংক্তির মাত্রাসংখ্যা, তখন কবিতাটি দীর্ঘ হলেও নিয়মচ্যুত হয়না। এবং এর ক্ষমতাও অনেক বেড়ে যায়।

মিল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যুগ্মস্বরের মিল অপেক্ষা এক স্বরের মিলের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যুগ্ম মিলের প্রবর্তন করলেও যুগ্ম মিলের সংস্কারে অনেকসময় কাব্যের স্বাভাবিক প্রকাশ ব্যাহত হয়। যেমন 'সোনারতরীর', 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'মালা' ও 'বালা'র সঙ্গে মেলানোর জন্য উতলা কে উতালা লিখেছেন। কিন্তু, উতলাতেই যথেষ্ট মিল হ'তো। যুগ্ম মিলকে বুদ্ধদেব চোখের সংস্কার বলেছেন।[১৩১] যেমন -শুধু, বধূ, ব্যথা, কথা মেনে নেন অনেকেই কিন্তু, শুনির সঙ্গে বাণীর মিল দেখলে অবাক হন। বুদ্ধদেবের মতে, একস্বরের মিল শ্রুতিকটু নয়, দৃষ্টিকটু মাত্র। এবং ছন্দের ক্ষেত্রে, চোখের চেয়ে কানকে গুরুত্ব দিলে একমাত্রার মিল চোখেও আর বাঁধবে না।

ভারতীয় শিল্প - সাহিত্যে, ভাস্কর্যে অলংকারের প্রতি পক্ষপাত লক্ষ্যকরা যায়। তাঁরা মনে করেন, ভূষণহীন সৌন্দর্য অসম্ভব।[১৩২] কিন্তু গ্রীক শিল্প বিশুদ্ধ সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এই বিষয়টি আধুনিক কালের কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব - উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহারকে কবিতার অলংকার মনে করেন নি। এবং 'তাদের অভাব মানেই কবিতার মৃত্যু'[১৩৩] একথাও তিনি ভাবেননি। সংস্কৃত কবিতায় অলংকার বিলাসিতার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। সংস্কৃত কবিতায় একক, ব্যক্তিক উচ্চারণ প্রায় ছিলোই না। তা ছিলো গোষ্ঠীর সাহিত্য। কবি ছিলেন রাজা বা রাজসভান্তর্গত বিদ্বজ্জনের প্রীতি উৎপাদক। ফলে, তাঁর রচনা ছিলো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনার্থে। যে আবেগে তাঁদের কবিতা শোভন হয়না, তেমনি ভূষণহীন বা নিরলংকার সাহিত্যে সভাসদ্‌বর্গের রুচির তৃপ্তি ছিলনা। তাই, তাঁদের কবিতা হ'তো সালংকারা নববধূর মতো। তবে, সালংকারা নববধূকে কেবল বিবাহ সভায়-ই মানা যেতে পারে। বাসর ঘরে, দম্পতির মিলনচিত্রে সালংকারা নববধূ বেমানান। আভরণ সেখানে আর্বজনামাত্র, অপ্রয়োজনীয়। মিলনের

অন্তরায়। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

> একই রকম নিবিড় ও সম্পূর্ন মিলন কবিতার সঙ্গে আমরা
> আকাংক্ষা করি, কিন্তু সংস্কৃত কবিতায় অলংকারের ব্যবধান
> ঘোচেনা।[১৩৪]

কবিতার সঙ্গে পাঠকের নিবিড় ও পূর্ণ মিলনের ক্ষেত্রে অলংকারের বাহুল্য বরং প্রতিবন্ধক। নিরলংস্কৃত কবিতা পাঠককে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে। কবিতা ও কবিতাপাঠকের মধ্যে কোনো বাধা থাকেনা। আধুনিককালে এমন অনেক কবিতার পংক্তি আছে, যা নিতান্ত নিরলংকার, সরল স্বভাবোক্তিমাত্র। সেখানে বাচ্যার্থই মহাশক্তিমান।

উপমাবিষয়টিকে সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক অলংকারের পর্যায়ে ফেলতে চাননি বুদ্ধদেব। কেননা, তাঁর মতে, এটি বিস্তারিত বিশেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও চিরাচরিত সমালোচনাশাস্ত্রে উপমা একটি অলংকাররূপে এবং বিশেষভাবে কাব্যের অলংকার রূপেই গণ্য। বুদ্ধদেব বলেন —

> উপমা স্বতন্ত্র ভাবে যতই হৃদয়গ্রাহী হোক, তার পুরো মূল্য তখন-ই
> প্রকাশ পায় যখন তার ভিতর থেকে দীপ্তিময় ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে।[১৩৫]

উপমাকে তিনি লেখনের সঙ্গে পাঠকের সংযোগের সেতু বলে মনে করেন।

> মনের যে গহনে বিশুদ্ধ আখ্যান পৌঁছুতে পারেনা, সেখানটায়
> যার আলো পড়ে, উপমা সেই প্রদীপের কাজ করে যাচ্ছে।[১৩৬]

জীবনানন্দ মনে করতেন উপমাই কবিত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপমার আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবও উপমা ও কবিত্বকে 'সহবাসী' বলে উল্লেখ করেছেন।

> উপমা ও কবিত্ব যে কীরকম সহবাসী তারও উদাহরণ তাঁর রচনায় প্রচুর।[১৩৭]

তাঁর মতে,

> যে বিশেষ গুণটির জন্য কয়েকটি শব্দের পারম্পর্য গদ্যের সমতল
> ছেড়ে কবিতার আকাশে পাখা মেলতে পারে তা গতাণুগতিক অর্থে
> ছন্দ বা মিল নয়, বা কোনো মহান চিন্তাও নয়, গভীরতম অর্থে তা
> উপমা।[১৩৮]

কবিতায় শুধুমাত্র প্রচলিত উপমা, কবিপ্রসিদ্ধি ব্যবহার করতে হবে - এমন নয়। উপমার মাধ্যমে বস্তুতে - ভাবনায়, পরিচিত ও দূরবর্তীতে, মূর্তে - অমূর্তে তুলনা করা হবে, স্বাভাবিকের বাইরেও বিপুল বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তু ও উপাদানের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করা হবে, পরস্পর বিসদৃশ বস্তুকেও একসূত্রে বাঁধা হবে, প্রতীয়মান বস্তুর বাইরেও যে সব বস্তু আছে, তাকেও রমণীয় করে তুলবে উপমা। তিনি আধুনিক কবি জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত নারী সৌন্দর্যের উপমাগুলির কথা বলেন। বনলতা সেন এমন এক নারী যার 'পাখির নীড়ের মতো চোখ', তার মুখ 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। নারীর চোখ, চুল ও মুখের এই

উপমাগুলি সম্পূর্ণ নতুন। এই অকল্পনীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করে জীবনানন্দ উপমার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত বিস্তৃত করে দিলেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন ইঙ্গিতময় উপমার একটি শর্ত হ'ল এই যে উপমেয় ও উপমানে কোনো যান্ত্রিক যোগ থাকবেনা, একটি তির্থকভাবে অন্যটির প্রান্ত ছুঁয়ে চলে যাবে। উপমার অভিপ্রায় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।[১৩৯]

আধুনিক কবিতার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, রূপ, রূপরচনার বিভিন্ন উপাদান গুলি ছাড়াও বুদ্ধদেব আধুনিকতার অন্য এক ধারনা, এক অভূতপূর্ব যুগলক্ষণের কথাও বলেছেন। এই বিশিষ্ট রকম আধুনিক সাহিত্যের তাৎপর্য নঙর্থক।

> এর বাণী বলতে প্রকাণ্ড একটা 'না' ভিন্ন কিছুই আর খুঁজে পাওয়া
> যায় না - শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিতৃষ্ণা, মানুষের মূঢ়তায় 'Savage
> indignation' নয়, মানুষের পতন প্রবণতায় একফোঁটা করুণাও নয়,
> - শুধু প্রত্যাখ্যান, তিক্ততা, ... ।[১৪০]

- এই নেতিনাদ, জীবনের এই আমূল প্রত্যাখ্যান সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে কবিতাতেও। এই নৈরাশ্য, বীভৎসতা, এই ধূসর রক্তহীন, হৃদয়হীন সংগীত - এই ক্ষয়শীল আধুনিকতার তত্ত্ব বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছেন। আধুনিকতা যেসব নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠকের দরবারে উপস্থিত, পাঠকের সঙ্গে তার যোগ সাধন না করলে কবিতা চিরদিন-ই দুর্বোধ্য থেকে যাবে। যুক্তি, তর্ক দিয়ে আধুনিকতাকে বোঝার চেষ্টা করলে পাঠকের কাছে এই নতুন তত্ত্ব বোধগম্য, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে , 'কবিত, সম্পাদক হিসেবে এক বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধদেব। অধুনিক কবিতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। সেগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে সংকোচও বোধ করেছেন।

> সংকোচ এইজন্য যে আধুনিক কথাটার সংজ্ঞার্থ যুগে যুগে বদলায়,
> অভিনবত্বের আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী, এবং সর্বশেষ বিচারে বোধহয়
> একথাই বলতে হয় যে, সেইটেই সত্যিকার আধুনিক যেটা চিরন্তন।[১৪১]

কাজেই আধুনিকতা একটি বিশেষ সময় অথবা কালের ধ্বজাবাহক নয়। আপেক্ষিক ভাবে নতুন এই সংবেদনশীলতার মধ্যে একটি চিরায়ত ব্যাপার থাকে। কোনো সমসাময়িক ব্যবস্থাও নয় এই আধুনিকতা। বুদ্ধদেবের ভাষায় বলা যেতে পারে -

> কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা একে অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়[১৪২] না।

আধুনিকতাবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে আধুনিক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, যুদ্ধের বিভীষিকা, অবক্ষয়ী জীবনবোধ, মানবীয় সম্পর্কের অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট, পরম্পরার কক্ষ বিচ্যুতি, এক চরম হতাশার বোধ, কোমল অনুভূতির চরম বিপর্যয়। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ তখন-ই সাহিত্যে এই অভিনব প্রতীতির জন্ম। কবিতার শৈলী, রূপকল্প, কবিতা ও জগতের প্রতি কবির মনোভাবের পরিবর্তন হ'লো। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের ধারনাকে দেখতে হবে এই পরিবর্তিত কাব্যচিন্তার জায়গা থেকে।

এইজন্য তিনি পরিক্রমা করেছেন ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান এবং সংস্কৃত সাহিত্য। বোদলেয়ার, হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে, কালিদাস, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতির কাব্যজগৎ মন্থন করেছেন। বিশ্বের সাহিত্য শিল্পকর্ম পঠন পাঠন সমালোচনার মাধ্যমে তিনি আধুনিকতার তত্ত্ব, সূত্রগুলি খুঁজে নিতে চেয়েছেন। নিজের কাব্যচিন্তাকে মেলাতে চেয়েছেন তার-ই সঙ্গে। আধুনিক কবিতার যে শিল্পরূপ তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'লো, তাতে -

ক) রোমান্টিক কবিতার বহুপ্রচলিত ভাব বর্জন করে রোমান্টিকতার পরিমার্জনে প্রকৃত্ত হলেন তিনি।

খ) পাউণ্ডের মতো শব্দ - ব্যবহারে কাব্যিক শব্দ বর্জনের প্রবণতা গ্রহণ করলেন।

পরিশেষে তিনি শব্দ ব্যবহারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্জন করলেন,
কাব্যিক শব্দগুলিও গ্রহণ করলেন, নূতন শব্দগুলির পাশাপাশি।[১৪৩]

গ) সৌন্দর্য এবং কুৎসিৎ পরস্পর বিরোধী নয় ঃ আধুনিক কবিতার ভাব-বিদ্রোহের কবিতায় উদ্রিক্ত হয়েছিল। এবং তারও পূর্বে আভাসিত হয়েছিল এডগার এলেন পো-র কবিতায় এবং গদ্যকর্মে। বুদ্ধদেব বসু এই মহাসত্য গ্রহণ করলেন।[১৪৪]

ঘ) বোদলেয়ারকে তিনি মনে করেছেন সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনক। বোদলেয়ারের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন কবিতা সচেতন মনন ও শ্রম-নির্ভর।

ঙ) পাউন্ড ও বোদলেয়ার-এর মতো কবিতায় চিত্রকল্প ও সঙ্কেতের গুরুত্ব স্বীকৃত হ'লো, যা আধুনিক কবিতার অন্যতম প্রধান সূত্র হয়ে উঠলো।

এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে - 'Synaesthesia' / ইন্দ্রিয় বিপর্যয় - শব্দ,
গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শের ওলটপালট।[১৪৫]

চ) আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারে অভিনবত্ব ও অদ্ভুতত্ত্ব - বোদলেয়ারের বৈশিষ্ট্য, যা আধুনিক কবিতার বিশেষ দিকচিহ্ন রূপে ফুটে উঠেছিল।

এছাড়া, পৃথিবীর আদি উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ ও মিল নির্মাণ, কবিতার শুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবহিতির জন্য তিনি হ্যেল্ডার্লিনের কবিতার কাছথেকেও দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[১৪৬] শুদ্ধ শিল্পের ধারনার ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেব প্রেরণা পেয়েছিলেন রিলকের কাছ থেকে। রিলকে বিশ্বাস করতেন

জগৎকে বদলে দেবার, জনতাকে অনুপ্রাণিত করার কোনো
ক্ষমতাই শিল্পকলার নেই।[১৪৭]

বুদ্ধদেবও মনে করতেন, কবিতার শুদ্ধতাও ব্যক্তিহৃদয়ের আততি - কবিতা লেখার প্রধান শর্ত। তাই, আত্ম ধর্মের তাগিদেই তিনি এইসব য়ুরোপীয় কবিদের কবিতা অনুবাদ করেন, গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। গোটা ইউরোপীয় কবিতাই তাঁকে আন্দোলিত করেছে। তিনি বুঝে নিলেন, আধুনিক কবির ব্যক্তিত্ব হবে তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধে চিহ্নিত। সেখানে থাকবে শুধু 'আত্ম'। ব্যক্তিগত সংকেত ও চিত্রকল্পপূর্ণ কবিতা অনেকসময় দুর্বোধ্যও মনে হ'তে পারে। আধুনিকদের প্রধান অভীষ্ট হ'লো বস্তুকে সরাসরি বর্ণনা নয়, তাকে অন্তর্লীনতায় রহস্যমণ্ডিত করে তোলা।

> কবিতা এইভাবে হয়ে উঠলো মন্ত্রগুপ্ত (Esoteric)। এক নতুন
> কবিভাষার জন্ম হ'লো।[১৪৮]

কবিরা যেহেতু 'আত্ম' কেই প্রধান ভাবলেন, তাই আধুনিক কবিতায় আত্মিক সমস্যাই জায়গা করে নিল। আধুনিক কবি সমাজের মধ্যে বাস করেও একক, নিঃসঙ্গ। কাম্যু-কাফকা-উমাসমান্, কীয়ের্কেগার্ড বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্ব আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মৌলিকত্বে প্রতিষ্ঠিত,

> সেইসব কবিদের মধ্যে এক সাধারন ধর্ম পরিলক্ষিত হয়েছে, যাকে
> বলা যায় আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব।[১৪৯]

গোকুল চন্দ্র নাগের 'কল্লোল'-এ, বুদ্ধদেবের 'কবিতা'য়, সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়ে' আধুনিক কবিতা প্রকাশিত হয়। এবং আধুনিকতার তত্ত্ব বিস্তার লাভ করে। এ সম্পর্কে বহু উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ রচনা করেছেন বুদ্ধদেব। এইসব নিবন্ধে আধুনিক কবিতাকে সমর্থন করেছেন, আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব বিশদ করেছেন, আধুনিক য়ুরোপীয় কবিতার প্রতি তাঁদের অভিনিবেশ ব্যক্ত করেছেন, আধুনিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং পাঠকের কাছে আধুনিকতার পরিচ্ছন্ন শিল্পরূপ তুলে ধরেছেন।

নির্দেশিকা

১। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ্য ১৩৮১ পৃঃ ২

২। তদেব, পৃঃ ৩

৩। তদেব, পৃঃ ৫

৪। তদেব, পৃঃ ৫

৫। বসু, বদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিএ, একটি খোলাচিঠি, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৮, পৃঃ ৯০

৬। তদেব, পৃঃ ৯০

৭। তদেব, পৃঃ ৯১

৮।তদেব, পৃঃ ৯১

৯। তদেব, পৃঃ ৯১

১০। তদেব, পৃঃ ৯১

১১। তদেব, পৃঃ ৯১

১২। তদেব, পৃঃ ৯১

১৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'সাহিত্য কেন?', স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, পৃঃ ৬৪

১৪। বসু বুদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিএ ঃ একটি খোলা চিঠি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃঃ ৯৩

১৫। তদেব, পৃঃ ৯৪

১৬।বসু, বুদ্ধদেব, 'দুজন তরুণ মৃত কবিঃ ফাল্গুনী রায়', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২১

১৭। বসু বুদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিএ ঃ একটি খোলা চিঠি, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৮, পৃঃ ৯৪

১৮।বসু বুদ্ধদেব, 'দুজন তরুণ মৃত কবিঃ ফাল্গুনী রায়', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২১

১৯। তদেব, পৃঃ ১২০

২০। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাএাজ্ঞান ও অতিরঞ্জন', উত্তর তিরিশ, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ , আগষ্ট ১৯৮৭, পৃঃ ৭৭

২১। তদেব, পৃঃ ৭৭

২২। বসু, বুদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিএ ঃ একটি খোলা চিঠি, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৮, পৃঃ ৯৩

২৩। বসু , বুদ্ধদেব, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ পদাতিক, 'কালের পুতুল', কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানূয়ারী ১৯৫৯, পৃ ৮৫

২৪। তদেব, পৃ ঃ ৮৫

২৫। বসু বুদ্ধদেব 'অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ নূতন রাধা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাইভেট

২৫। বসু বুদ্ধদেব 'অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ নূতন রাধা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৫৯, পৃঃ ১৯৯

২৬ । বসু, বুদ্ধদেব, 'লেখার ইস্কুল', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশর্স প্রাইভেট লিঃ ১৯৫৯, পৃঃ ৬

২৭। তদেব, পৃঃ ৮

২৮। বসু বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য, কলিকাতা নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১ম প্রকাশ মে ১৯৫৫, পৃঃ ৩২

২৯। তদেব, পৃঃ ৩২

৩০। তদেব, পৃঃ ৩২

৩১। বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৯, পৃঃ ১৪০

৩২। বসু , বুদ্ধদেব, 'কবিতার কুড়ি বছব', কালের পুতুল, কলিকাতা নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৯, পৃঃ ১৪৬

৩৩। বসু , বুদ্ধদেব, বাংলা কবিতা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশর্স প্রাঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

৩৪। বসু , বুদ্ধদেব, 'সাহিত্য কেন?', স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

৩৫। তদেব, পৃঃ ৬০

৩৬। তদেব, পৃঃ ৬১

৩৭। তদেব, পৃঃ ৬১-৬২

৩৮। তদেব, পৃঃ ৬২

৩৯। বসু , বুদ্ধদেব, 'অন্নদাশংকর রায়ঃপুনশ্চ' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশর্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯,

৪০। তদেব, পৃঃ ১১৯

৪১। বসু , বুদ্ধদেব, 'প্রথমাচৌধুরী ও বাংলাগদ্য', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

৪২। তদেব পৃঃ ৭০

৪৫। তদেব, পৃঃ ৭০

৪৬। তদেব, পৃঃ ৭০

৪৭। বসু , বুদ্ধদেব, 'এ যুগের কবিতা', উত্তর তিরিশ কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আগষ্ট ১৯৮৭

৪৮। বসু , বুদ্ধদেব, বাংলা কবিতা স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭,

৪৯। তদেব, পৃঃ ৭০

৫০। তদেব, পৃঃ ৭১

৫১। তদেব, পৃঃ ৭১

৫২। তদেব, পৃঃ ৭১

৫৩।বসু , বুদ্ধদেব, 'দুজন তরুণ মৃত কবিঃ ফাল্গুনী রায', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২১

৫৪। বসু , বুদ্ধদেব,সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ৭৭

৫৫। তদেব, পৃঃ ৭৭

৫৬। তদেব, পৃঃ ৭৮

৫৭। বসু , বুদ্ধদেব, বাংলা কবিতা স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রীঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, পৃঃ ৭১-৭২

৫৮। বসু , বুদ্ধদেব, কবিতার শত্রু ও মিএ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রাকাশ ১৯৭৮, পৃঃ ৪৭

৫৯। তদেব, পৃঃ ৪৮

৬০। বসু , বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২

৬১। তদেব, পৃঃ ৮৫

৬২। তদেব, পৃঃ ৮৫

৬৩। তদেব, পৃঃ ৮৫

৬৪। বসু , বুদ্ধদেব,' অন্নদাশঙ্কর ঃ নূতন রাধা' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ . পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১১৬

৬৫। ঠাকুব, রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থ পরিচয়, সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০

৬৬। ঠাকুব, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য বিচার, সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ১০০

৬৭। বসু , বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল', কালের পুতুল , কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ , জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৩৬

৬৮। তদেব, পৃঃ ১৩৬

৬৯। তদেব, পৃঃ ১৩৭

৭০। তদেব, পৃঃ ১৩৮

৭১। বসু , বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্ববব, ১৯৬২, পৃঃ ১২৬

৭২। বসু , বুদ্ধদেব, প্রমথ চৌধুরী, 'কালের পুতুল', কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ১৯

৭৪। তদেব, পৃঃ ৭৫

৭৫। বসু , বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ১২৮

৭৬। বসু , বুদ্ধদেব,'কালের পুতুল' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশর্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

৭৭। বসু , বুদ্ধদেব,'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত ' কালিদাসের 'মেঘদূত', (অনূদিত),। কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ অকট্বর ১৯৬৮

৭৮।বসু , বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল' কালের পুতুল, কলিকাতা পৃঃ ১৩৬ নিউ: জে পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯

৭৯।বসু , বুদ্ধদেব, সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থসমালোচনা, 'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৯- আষাঢ়, ১৩৫৩, পৃঃ ২৩৯

৮০। তদেব, পৃঃ ২৩৯

৮১। তদেব, পৃঃ ২৪১

৮২। তদেব, পৃঃ ২৪১

৮৩। বসু , বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল' , কালের পুতুল, কলিকাতা নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুডারী ১৯৫৯, পৃ ১৩৯

৮৪। বসু , বুদ্ধদেব, রবীন্দ্ররচনাবলী , ১ম খণ্ডের সমালোচনা 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬- আষাঢ় ১৩৪৭ পৃঃ ৪৯

৮৫। বসু , বুদ্ধদেব, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৭- আষাঢ়, ১৩৪৮, পৃঃ ৫৪-৫৫

৮৬। তদেব, পৃঃ ৫৪-৫৫

৮৭। বসু , বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৩৮

৮৮।তদেব, পৃঃ ১৩৮

৮৯। তদেব, পৃঃ ১৩৮

৯০। বসু , বুদ্ধদেব, মাত্রারজ্ঞান ও অতিরঞ্জন, উত্তর তিরিশ, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আগষ্ট ১৯৮৭ পৃঃ ৮০

৯১। বসু , বুদ্ধদেব,'কবিতার কুড়ি বছব' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃ১৪৫

৯২। তদেব, পৃঃ ১৪৫

৯৩। বসু , বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছ', রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রীঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ মে ১৯৫৫

৯৪। বসু , বুদ্ধদেব,'কালের পুতুল' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

৯৫। তদেব, পৃঃ১৪২

৯৬। তদেব পৃঃ ১৪৩

৯৭। বসু , বুদ্ধদেব,'বাংলা কবিতা' , স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী

১৯৫৭, পৃ৬৮

৯৮। বসু, বুদ্ধদেব, কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ৪৬-৪৭

৯৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের 'মেঘদূত ' (অনূদিত), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অকট্বর ১৯৬৮, পৃঃ ৩০

১০০। তদেব, পৃঃ ২৯

১০১। তদেব, পৃঃ ২৭

১০২। বসু, বুদ্ধদেব, মণীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু' পুস্তক সমালোচনা 'কবিতা' আষাঢ় ১৩৪৯ - আশ্বিন ১৩৫০, পৃঃ১০৩

১০৩ তদেব, পৃঃ ১০৩

১০৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'এযুগের কবিতা' উত্তর তিরিশ, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিকেশার্স প্রাঃ লিঃ, আগষ্ট ১৯৮৭, পৃঃ ৮৩

১০৫। বসু, বুদ্ধদেব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ পদাতিক', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী পৃঃ ৮১

১০৬। বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪ পৃঃ আট

১০৭। চক্রবর্তী, অমিয়, 'এপারে', পালাবদল

১০৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'এ যুগের কবিতা' উত্তর তিরিশ, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আগষ্ট ১৯৮৭, পৃঃ ৮৯

১০৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ পদাতিক' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৮৫

১১০। তদেব, পৃঃ ৮৫

১১১। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদলে', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ৯৯

১১২। বসু, বুদ্ধদেব, 'নিশিকান্তঃ 'অলকানন্দা' ', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১১০

১১৩। বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ১৭৪

১১৪। বসু, বুদ্ধদেব, সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত (অনুদিত), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অকট্বর ১৯৬৮ পৃঃ ২৩

১১৫। তদেব, পৃঃ ১৪

১১৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১০৬

১১৭। তদেব, পৃঃ ১০৬

১১৮। তদেব, ১০৬ - ১০৭ পৃঃ

১১৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'বিষ্ণু দেঃ চোরাবালি', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৭৭

১২০। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত, (অনু), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ অকট্বর ৯৬৮, পৃঃ ৬৬

১২১। তদেব, পৃঃ ৬৬

১২২। তদেব, পৃঃ ৬৬

১২৩। তদেব, পৃঃ ৯

১২৪। তদেব, পৃঃ ১০

১২৫। তদেব, পৃঃ ১১

১২৬। তদেব, পৃঃ ১২

১২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'বিষ্ণু দেঃ চোরাবালি', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৭৯

১২৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তঃ ক্রন্দসী', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ৬৯

১২৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'বাংলা কবিতা', স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, পৃঃ ৬৬

১৩০। তদেব, পৃঃ ৬৬ - ৬৭

১৩১। বসু, বুদ্ধদেব, দময়ন্তী, পৃঃ ৭৮

১৩২। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত (অনূ), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অকট্বর ১৯৬৮, পৃঃ ১৭

১৩৩। তদেব, পৃঃ ১৬

১৩৪। তদেব, পৃঃ ২১ - ২২

১৩৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৬২

১৩৬। তদেব, পৃঃ ৬২

১৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ১৯৭

১৩৮। তদেব, পৃঃ ১৯৬

১৩৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত (অনূ), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর ১৯৬৮

১৩৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত (অনূ), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর ১৯৬৮

১৪০। বসু, বুদ্ধদেব, ' চাই আনন্দের সাহিত্য' , স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, পৃঃ ৫৩

১৪১। বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৪০

১৪২। বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পাদিত), কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ আট

১৪৩। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১ম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৮৬, পৃঃ ২৩১

১৪৪। তদেব, পৃঃ ২৩১

১৪৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি, শার্ল বোদলেয়ারঃ অনন্য দ্রষ্টা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯২ পৃঃ ১৫৮

১৪৬। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১ম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৮৬

১৪৭। বসু, বুদ্ধদেব, রিলকের চিঠি বুদ্ধদেবকে, রিলকের কবিতা (অনুবাদ গ্রন্থ), কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭০, পৃঃ ৪৬

১৪৮। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা,ড্র নবার্ক, ১ম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৮৬ পৃঃ ৩১

১৪৯। তদেব, পৃঃ ৩৫.

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পরিচয়

১) প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা

ক) রামায়ণ

খ) মেঘদূত

গ) মহাভারত

ঘ) উপসংহার

২) রবীন্দ্র - সমালোচনা

ক) কথাসাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

খ) কবি রবীন্দ্রনাথ

৩) ইউরোপীয় কবি ও কাব্যের সমালোচনা

৪) আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচনা এবং অন্যান্য ।

চতুর্থ অধ্যায়
বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পরিচয়

বুদ্ধদেবের বহুমুখী সাহিত্যকর্মের মধ্যে শুধুমাত্র সমালোচনা কীর্ত্তি ও যে কোনো সাধারন লেখকের সমগ্র কীর্ত্তির তুলনায় ঈর্ষণীয় হতে পারে। সমালোচনায় তিনি বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেছেন, বিভিন্ন সাহিত্যে, বিভিন্ন যুগে বিচরণ করেছেন। প্রসঙ্গের বৈচিত্র্যে সঙ্গতি দিয়েছে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর সমালোচনা কর্মকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় —

ক) প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা,

খ) রবীন্দ্র-সমালোচনা,

গ) ইউরোপীয় কবি ও কাব্যের সমালোচনা

ঘ) আধুনিক বাঙালিকবি ও বাংলা কবিতার সমালোচনা, এবং অন্যান্য সমালোচনা।

প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা

বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনামূলক নিবন্ধগুলির পরে প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার প্রথম সূচনা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। 'উত্তরচরিত' এবং 'দৌপদ্রী' প্রবন্ধ দুটি ছাড়াও 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের কথা এখানে স্মরণ করা যায়। অবশ্য শেষোক্ত রচনাটি নানা কারনে প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা নয়।[১] বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' তাঁর মনীষার এবং প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইদানিং পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের তথ্যাশ্রিত ব্যাখ্যামূলক সমালোচন শুরু হয়েছে এ তাই।

বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক। মন ছিল প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানমুখী। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রত্যক্ষ ফল ছিল এসব লেখায়। সাহিত্য বিচারকে কখনো বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে মনের লীলায় পরিণত করেন নি তিনি। সাহিত্যকে দেশ-কালের উর্দ্ধোত্তি তুলে দেন নি। বরং পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের মতো ভাবতেন - 'সাহিত্যও নিয়মের ফল'।[২] এই ধারনা থেকে প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও প্রাচীন সমাজের নিয়ম খুঁজতেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে এই সমাজের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে ভিন্ন রীতির প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা দেখা গেল। তিনি এমন অনেক কবিতাও লিখেছেন যাতে এদেশের প্রাচীন সাহিত্য - ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের কাব্যলোক উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনায় ভক্তি বিনম্র ও সংবেদনশীল মন নিয়ে এগিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, সাহিত্য সমালোচনা হল প্রাচীন কবির কাব্যপূজা।[৩] সাহিত্যের বিচার অপেক্ষা তার ব্যখ্যাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর এ সব সমালোচনার অধিকাংশই আত্মভাবমুখ্য রচনা বা সৃজনধর্মী সমালোচনা। এ জাতীয় সমালোচনার দৃষ্টান্ত 'মেঘদূত', 'রামায়ণ'। 'রামায়ণে' ভাবসর্বস্বতার ভিতরেও মাঝে মধ্যে যুক্তির রেখাপাত লক্ষ্য করা যায়।[৪] কিন্তু 'মেঘদূত' সর্বত্রভাবেই ভাবনির্ভর সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় জীবনের পূর্নতা, আদর্শ লক্ষ্য করেছেন উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, কালিদাসের নাটকে। আনন্দ, ত্যাগ, সত্য, সৌন্দর্য ও শান্তি এসব যাবতীয় গুনাবলীর মূল উৎস সন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। 'রামায়ণ' সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন —

> যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খন্ডতার সুষমা, সমস্ত
> বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন
> ... 'রামায়ণ' সেই অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে।[৫]

রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বে ঐক্যচেতনা প্রবল ছিল। সবকিছুকে একটি ঐক্যবোধে সমন্বিত করে দেখবার বাসনা ছিল তাঁর। আধুনিক জীবনের নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেই ঐক্যানুভূতি অবারিত ছিল না। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে অতীত জীবনের মধ্যে সেই ঐক্য খুঁজতে হচ্ছিল। 'মেঘদূত' সম্পূর্ণতঃ সেই ঐক্য ও ঐক্যবিচ্ছিন্নতার আলোচনা। এখানে রবীন্দ্রনাথ একেবারে মেঘদূত সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন কাল সম্পর্কে আবেগ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি 'মেঘদূত' কাব্যের কোনো ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ণ করেন নি। কাব্যের টীকা-টিপ্পনীও রচনা করেন নি। 'মেঘদূত' কাব্য তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই তিনি মুগ্ধ চিত্তে ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলিতে কেবল মুগ্ধতাবোধ নেই, আছে রোমান্টিক কবির সৃজনধর্মিতাও। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যগুলি অবলম্বন করে আত্মজগৎ সৃজন করেছেন। সেজন্য এখানে যুক্তিপরম্পরার পরিবর্তে তীব্র অনুভূতির গুরুত্ব। বঙ্কিমের ইতিহাস বা সমাজনির্ভর বস্তুমুখ্য সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাবমুখ্য হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের পুণনির্মান করেছিলেন আত্মভাবনার দর্পনে। বুদ্ধদেব এই দুই পথ-ই পরিহার করে গেলেন। কিন্তু সম্পূর্ন পরিত্যাগ করতেও পারলেন না। তাঁর লেখায় নিজের ভাবনার আরোপ এল কালিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে। প্রাচীন ভারতের সবই মহিমাময় একথা তিনি মনে করেন নি। নিজেই একজায়গায় লিখেছেন —

> তৎকালীন মনীষীরা যেন ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে
> যা কিছু ছিলো, তাই মহিমান্বিত; তাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করতে
> শিখিয়েছিলেন, যাচাই করতে শেখান নি।[৬]

তাঁর মতে, "এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ।"[৭] এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেন নি। সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতেন; কাটা ছেড়া করে দেখা পছন্দ ছিল না তাঁর। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন। নিছক আত্মগতভাবে তার পুর্ননির্মান করেন নি।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল —

ক) 'রামায়ণ' (১৯৪৭) খ) 'মেঘদূত' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা প্রবন্ধ 'সংস্কৃত কবিতা' ও 'মেঘদূত' (১৯৫৭)
গ) 'মহাভারতের কথা' (১৯৭৪)

প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি সমালোচনার মধ্যে পার্থক্য দশ বছরের আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রচনার মধ্যে পার্থক্য সতের বছরের। এককথায় প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি ২৭ বছর সময় নিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর চিন্তা চেতনার বহু পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য শেষ রচনাটি নানাদিক থেকে পূর্ণায়ত এবং গভীর। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে সেজন্য 'রামায়ণ' প্রসঙ্গ প্রথমে উল্লেখ করা হল।

। ক ।

'রামায়ণ' (১৯৪৭) বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার আগে থেকেই রাম-রাবণের পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়ে, বুদ্ধদেব যে ভাবছিলেন, এর প্রমান পাওয়া যায়। 'রামায়ণ' বা 'মাইকেল' (১৯৪৬) প্রবন্ধ ছাড়াও 'রামায়ণে'র কাহিনী নিয়ে তিনি 'রাবণ' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। 'আমার যৌবন' গ্রন্থে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন —

> আমার 'রাবণ' নাটক আমার ঢাকা জীবনের সর্বশেষ রচনা ...
> সবই বলা যায় গতানুগতিক - আমার নতুনত্ব শুধু এটুকুতে যে
> আমার রাবণ পুরোপুরি একটি দুরাত্মা নন্, সীতাকে হরণ করে
> এনে এখন চান হৃদয় দিয়ে জয় করতে - তাঁর মনের একটি অংশে
> তিনি ভাবপ্রবণ।[৮]

এই রাবণকে তিনি বলেছেন 'প্রথাচ্যুত রোমান্টিক রাবণ'।[৯] এমন মনে করা, যেতে পারে যে,

> বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ'কেন্দ্রিক ই পুরাণ চেতনাই পরবর্তী কালের
> পুরাণ অবলম্বী রচনা গুলির অঙ্কুর পর্ব।[১০]

আর তাই বলা যায় প্রথম জীবনের রামায়ণ সম্বন্ধীয় চিন্তা চেতনার স্মৃতি হয়তো শেষ পর্যন্তও তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিলো।

বুদ্ধদেব বসুর 'রামায়ণ' সমালোচনাকে সূত্রাকারে সাজালে এরকম হতে পারে -

১. কাব্য হিসেবে 'রামায়ণ'
২. কৃত্তিবাস-বাল্মীকির 'রামায়ণে'র পার্থক্য
৩. রাম চরিত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা
৪. 'রামায়ণে'র অসংগতি, এবং
৫. 'রামায়ণে'র নবমূল্যায়ণ।

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ'কে দেখতে চেয়েছেন একটি সম্পূর্ন রচিত কাব্য হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিগত রামায়ণস্মৃতি-ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম

> সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ'।[১১]

কবিতা হিসেবে 'রামায়ণ' তাঁকে অভিভূত করেছিল। বুদ্ধদেবের নিজের কথা

> কবিতার যাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।[১২]

রাজশেখর বসু অনুদিত 'রামায়ণে'র কাব্য সৌন্দর্য, কবিত্বময় বর্ণনার অংশগুলিও বুদ্ধদেবের কবিমনকে আকৃষ্ট করেছে। কবিতার সেই আকর্ষনেই তিনি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পড়লেন। বাল্মীকি 'রামায়ণে'র সারানুবাদ পাঠ করলেন। তাই কৃত্তিবাসে এসে বাল্মীকির কবিত্বময় বর্ণনার অংশগুলি বর্জিত হলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। কৃত্তিবাসের রচনায় রামের দেবায়ণ ছিলো প্রধান লক্ষ্য। ফলে কবিত্বময় বর্ননার অংশগুলি তিনি অনায়াসে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু রামায়ণের কাব্যমূল্যকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। একারনে রামায়ণ পাঠের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের কাব্যকে তাঁর যথেষ্ট মনে হয় নি। রবীন্দ্রনাথও 'রামায়ণে'র কাব্যমূল্য স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে,

> এই 'রামায়ণ' কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর
> সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে;
> কেবল যে ইহাকে শিরোধর্যে করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের
> মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে,
> ইহা তাহাদের কাব্য।[১৩]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত 'বাল্মীকি রামায়ণ' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রবোধচন্দর সেনও লিখেছেন —

> 'রামায়ণ' কথা এইভাবে নানা জাতির চিত্তকে রসসিক্ত করিয়াছে।
> বিশ্বমানবের সাহিত্যরস পিপাসু মনের জন্য রাম কথা এক অক্ষয়
> রসভান্ডার রূপে বিরাজমান।[১৪]

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ডকেও যথেষ্ট কবিত্বমন্ডিত রচনা বলেছেন। রাজশেখর বসুর মতে, বাল্মীকি 'রামায়ণে'র কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন - উত্তরকান্ড। 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ড যে প্রক্ষিপ্ত, সে বিচার ঐতিহাসিকের বা ভারতবিদের বিচার। বিচারে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ন, কাব্য নয়। সেখানে লক্ষনীয় প্রাচীন কাব্যের মূল নির্ণয় করে তার রূপ ঠিক করা। একে Textual সমালোচনা বলা চলে। রাজশেখর বসু যখন এই উত্তরকান্ডকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করেন, তখন তিনি এই ঐতিহাসিকের যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। ঐতিহাসিকের বিচারে 'রামায়ণে'র মূল ক্ষেত্র যে লঙ্কা, তারও স্থান বিচার হয়েছে। 'রামায়ণ' কাব্যও এইরকম একটি স্বয়ংসম্পূর্ন রচনা নয় বলেই তাঁদের মত। Winternitz বলেন, এগুলি,

> Accumulations of very diverse poems of unequal
> value, which have arisen in the course of centuries
> owing to continual interpolations and alternations.[১৫]

রাজশেখরের বক্তব্যও বুদ্ধদেব মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে - লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা যদি অযোধ্যায় ফিরে এসে ঘরকন্না করে বাকি জীবন কাটাতেন, 'রামায়ণে'র সমাপ্তি যদি একরম হতো, তাহলে সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'রামায়ণে'র প্রভাব এমন ব্যপক, এমন গভীর হতে পারতো না। যে সীতার জন্যে এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র

উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ'লো, ছাড়তে হ'লো স্বেচ্ছায়,

এই কথাটাইতো রামায়ণের আসল কথা।[১৬]

অর্থ্যাৎ একজন আধুনিক মানুষের কাছে বিরহ বা বিচ্ছেদ বেদনার তীব্র আবেদন যতটা মূল্যবান সেই আলোকেই বুদ্ধদেব কাব্যের পরিণতি বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক অর্থে 'মেঘদূত' কাব্যে মানুষের চিরন্তন বিরহের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের আলোচ্য বিষয় ও সেই বিরহ তত্ত্ব - সীতাকে পেয়েও হারানোয় 'রামায়ণে'র মহত্ত্ব বিচার। অবশ্য একথা ও ঠিক বুদ্ধদেব যে খুব যুক্তিপূর্ণভাবে তথ্যপ্রমাণ সহকারে 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ড সম্পর্কে এমন একটা কথা বলেছেন তা নয়। এ তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশ বা Reflection মাত্র। বুদ্ধদেবের বক্তব্য উত্তরকান্ত যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন্ উত্তরকান্ড 'বাল্মীকি-প্রতিম'[১৭] নিশ্চয়ই। একথা স্বীকার করা এজন্যই অসম্ভব যে আদিকবির সঙ্গে উত্তর কবির ভাবনার অনৈক্য। কিন্তু যে কালে বুদ্ধদেব বসু কাব্য হিসেবে 'রামায়ণ' পাঠ করছেন সে কালের সাহিত্য গঠন বোধ থেকেই এরকম ধারনায় তিনি স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছেন। এ থেকে বুদ্ধদেবের চিন্তার দুটি চিত্র স্পষ্ট হয়।

১) কাব্য হিসাবে 'রামায়ণ' বহুশতাব্দীর গঠন নিয়ে যে অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছে - একালের কাব্য রসিকের কাছে তাকে সমগ্র এবং সম্পূর্নরূপে গ্রহণ করবার ঐক্য তত্ত্ব

২) যে রোমান্টিক বিরহ বেদনা রবীন্দ্রনাথেরও কাব্য আস্বাদনে প্রবল, সেই রোমান্টিক বিরহচেতনাই বুদ্ধদেবের লেখায় ছায়া ফেলে।

এখানে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত 'রামায়ণ' বোধের পক্ষের বিরহতত্ত্ব বা ঐক্যতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ন হলেও অন্যান্য অংশের সঙ্গে মিশিয়ে পড়লে আরও কিছু কথা এসে পড়ে। প্রথমত, বুদ্ধদেব কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনায় বাল্মীকির কথা আলোচনা করতে গিয়ে কৃত্তিবাস মহাকবির আত্মা উবে গেছে এরকম মন্তব্য করেছেন। একথা সত্যি বাল্মীকির মহোত্ম ভাব নিশ্চয় কৃত্তিবাসের কাব্যে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই সূত্রে বোধ হয় একথাও বলা যায় যে, যে বিরহ চেতনা তিনি 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ডের উপর প্রয়োগ করতে চান সেই বিরহ চেতনাই বাল্মীকির উপর আরোপ করা কিঞ্চিৎ কালাতিক্রম ই হয়ে পড়বে।

কৃত্তিবাসের কাব্যের সঙ্গে বাল্মীকির কাব্যাত্মার পার্থক্যের কথাও উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাল্মীকির কাব্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের স্বাদ, পাওয়া সম্ভব নয়। বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের পার্থক্যকে দীনেশচন্দ্র সেনও প্রশংসা করেছেন। সতাত্ব, ভ্রাতৃত্ব-ইত্যাদি আদর্শ রক্ষার জন্য কৃত্তিবাসের গ্রহণ বর্জনকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে, এর ঐতিহাসিক কারন থাকলেও, তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকায় এর সমর্থন পাওয়া গেলেও এই গ্রহন বর্জনে

আদি কবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে সন্দেহ নেই।[১৮]

কৃত্তিবাস এবং রাজশেখর বসুর অনুবাদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব দুই কবির আত্মগত ব্যবধান স্পষ্ট

করে তুলেছেন। বাল্মীকির কাব্যের অনেক তথ্য কৃত্তিবাস আদর্শ রক্ষার জন্য বাদ দিয়েছেন -

> রাম লক্ষণেরা মাংস খেতেন, সবরকম মাংস খেতেন, ... এমন কি,
> অমাংস ভোজনকেও তারা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ
> ছিলেন না তারা ...।[১৯]

কৃত্তিবাস সেসব প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্রও করেননি। রাম-অন্বেষণে বেরোবার পর ভারতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যেরকম আপ্যায়ন করেছিলেন; পান ভোজন এবং অপ্সরাদের সহবাসে তারা যেরকম তৃপ্ত হয়েছিলেন, তাও রাজশেখর বসুর অনুবাদে আছে, কৃত্তিবাসে নেই। ইন্দ্রিয় সুখের প্রসঙ্গে, বাল্মীকির অকুণ্ঠ উপস্থাপনা কৃত্তিবাসের কাব্যে আদর্শ রক্ষার চাপে সংকুচিত হয়েছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> জীবনের যেটা পার্থিব দিক, তাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে
> উদাসীন বা অনিপুন ছিলো না, বাল্মীকিতে তার প্রমান প্রচুর ....।[২০]

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে আত্মগত ব্যবধান তো ছিলোই। 'রামায়ণে'র কালের জীবনযাপনের যে আদিম স্বাভাবিকতা তা কয়েকশতাব্দীর নৈতিক শাসনে ক্রমশঃ পরিবর্তিত এবং নীতিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাস যখন 'রামায়ণ' অনুবাদ করেছেন ততদিনে এই নীতিশাসিত আদর্শায়িত জীবনচেতনা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপুষ্ট করেছে। বাংলাদেশের জীবনভাবনার লৌকিকতার উপরে আর্ঘশাসিত জীবনের ছাপ মুদ্রিত হচ্ছে। একে আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যে খুব দেখতে পাই। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জীবনচেতনার উপর এই ব্রাহ্মণ্য নীতিশাসিত জীবনতত্ত্বের প্রভাব দেখি যেমন মালাধরে, কৃত্তিবাসে তেমনই অন্যান্যদের লেখায়। মনে হয়, সেকালের জীবনের উপরে এই প্রভাব পুষ্টির আদর্শায়িত জীবনকে কৃত্তিবাস গ্রহন করেছিলেন। এই কারণে 'রামায়ণ', বাঙালীর সমাজ ও সংসার সংগঠনে খুব কার্যকরী ভূমিকা নিতে পেরেছে।

অন্যপক্ষে, বুদ্ধদেব যে দুই কবির ব্যবধানকে অনুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বাল্মীকির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন এর একটি কারণ হয়তো বিশ শতকী জীবনের সর্বৈব ভোগমুখ্যতার পুনঃপ্রবর্তিত ধারার মধ্যে নিহিত ছিলো। ইংরেজ শাসিত এবং ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ মধ্যযুগীয় নীতিচর্চার বাইরে পাশ্চাত্যচিন্তাচর্চার মধ্যে পার্থিব জীবনপ্রীতির স্বাদ পেয়েছিলো। রেনেসাঁসের মূলে তো এই পার্থিব জীবনধর্মকে বিশিষ্ট করে তোলাই ছিলো অন্যতম দিক। ফলে, আধুনিক মানুষের দৃষ্টিকোণ যে প্রাচীন পার্থিব জীবন প্রীতির মধ্যে একালের চিন্তার প্রতিফলন খুঁজবে, তাতে সন্দেহ কী? হয়তো এই পার্থিবতাকেই আধুনিকতার একটা দিক বলা যায়। শুধু বুদ্ধদেব নন, সেকালের আরো অনেকেই পশ্চিমের আদর্শে পার্থিব জীবনচর্চাকে বাংলা সাহিত্যের স্রোতোপথে বইয়ে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। এজন্যই কৃত্তিবাসের সংযত, আদর্শায়িত রামকাহিনী বুদ্ধদেবের যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। তিনি ফিরে আসেন বাল্মীকির উদার জীবনমুখী 'রামায়ণ' চর্চায়। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, জীবনের যেটা পার্থিব স্বাভাবিক দিক, তা যেন কৃত্তিবাসে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে - আদর্শের বাঁধারাঁধির চাপে। এইসময় প্রাচীন সাহিত্য ও

ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষন যেমন দেখা দিলো, তেমনই এই সাহিত্য ঐতিহ্যকে সাময়িক জীবনের সঙ্গে মেলাবার একটা প্রবণতাও দেখা গেলো। এই প্রবণতাই বুদ্ধদেবের লেখায় লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁর নাগরিক বিশ্বাত্মমুখী জীবন চেতনার সঙ্গে ফুলিয়ার বাঙালী কবি কৃত্তিবাসকে মেলাতে পারেন নি। তাঁকে কেবলই মনে হয় বড় বেশী প্রাদেশিক, বড় বেশী সংকীর্ণ, যেন তাঁর অশন-বসন-রীতি-নীতি সবই অনেকটা নীচু স্তরের। প্রকৃতপক্ষে আদি কবি বাল্মীকি যে সমাজ সভ্যতার বৃত্তে কাব্য রচনা করেছেন, সেখানে আধুনিক অর্থে না হলেও একধরনের ভোগবাদই মুখ্য ছিলো। জীবন ছিলো মুক্ত-বাধাবন্ধের বাইরে। সেই তুলনায় গোটা মধ্যযুগ ধরে একধরনের বদ্ধ সংকীর্নতা লক্ষণীয় রূপে প্রকট হয়েছে। হৈ পরিবেশের কবি ফুলিয়ার কৃত্তিবাস। কিন্তু, বুদ্ধদেব যে সাংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকে 'রামায়ণ'কে দেখেছেন, তার মধ্যে ও আছে পাশ্চাত্য পার্থিবতা প্রভাবিত জীবনচর্চার ইশারা। সেকারনে বুদ্ধদেবের চেতনায় ছিলো বাল্মীকির চিন্তারই প্রতিফলন। তাছাড়া, কৃত্তিবাসকে পুরো একটি কাব্য রচনা করতে হয়েছিলো, যার জন্য প্রয়োজন ছিলো শ্রোতা ও পাঠকের প্রীতিনিষ্ট মনোযোগ। আর বুদ্ধদেবকে লিখতে হলো সমালোচনা। যার জন্য পাঠকের এমন লোকায়িতিক হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিলো না। স্মরণ করা যায় তাঁর 'রাবণ' নাটক কোন নাট্যদলের পছন্দ হয়নি বলেই চলেনি। সুতরাং কৃত্তিবাসের পক্ষে এমনি একটি পরিকল্পনার কী ভবিষ্যৎ হতে পারতো তা সহজেই অনুমান করা যায়।

'রামায়ণ' সমালোচনায় বুদ্ধদেবের তৃতীয় প্রসঙ্গ রাম চরিত্র। রাম চরিত্রকে তিনি 'রামায়ণে'র সবচেয়ে বড় সমস্যা[২১] বলে চিহ্নিত করেছেন। আর সে সমস্যার মূলে আছে রামের সীতা বর্জনের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, রাম একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ -

> 'রামায়ণে' দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।[২২]

'রামায়ণ', 'মহাভারত' সমালোচনাকে তিনি অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র মনে করতেন। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমাদের ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়।

> সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহন করিয়াছে ... 'রামায়ণে' ভারতবর্ষ কোন আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।[২৩]

'রামায়ণে'র মহিমাকে তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধে নিহিত দেখেন নি। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার জন্য রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, 'রামায়ণে' তাই দেখানো হয়েছে। আর এই আদর্শগুলির প্রায় অধিকাংশের নায়ক রামচন্দ্র। 'বাল্মীকি-রামায়ণ' (সারানুবাদ) গ্রন্থের ভূমিকায় রাজশেখর বসুও রামের সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও দারুন কর্তব্যবুদ্ধিকে বড় করে দেখেছেন। রাম সম্পর্কে লিখেছেন —

যাঁর পিতার তিনশ পঞ্চাশ পত্নী সেই রাম চিরকাল এক ভার্যায়
অনুরক্ত রইলেন - পুরুষের একনিষ্ঠতার এই আদর্শ সেকালের পক্ষে
কত বড়, তা আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে ধারনা করা অত্যন্ত কঠিন।[২৪]

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন —

কি রাজধর্মে, কি সমাজধর্ম ও কুলাচার, কি পারিবারিক কতর্ব্যনিষ্ঠা -
সর্বত্র রামচন্দ্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতির অব্যভিচারী অনুসরণ করিয়াছেন।
কোথাও নিজে দেবত্বের সুযোগ লইয়া মানবিক অনুশাসনের অমর্যাদা
করেন নাই।[২৫]

'রামায়ণী কথা'য় দীনেশ চন্দ্র সেন ও আদর্শনিষ্ঠ রামের কথাই বলেছেন, অবশ্য তিনি লিখেছেন —

রামের চরিত্র কিছু জটিল। ... তাঁহার চরিত্রের কতগুলি আপাত-
বৈষম্যের সমাঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে।[২৬]

যিনি কৈকেয়ীর কাছে বলেছেন - আমাকে ঋষিগণের মতো বিমলধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলে জানবে, তিনিই মায়ের কাছে (কৌশল্যাকে) গিয়ে বিরুদ্ধ নিরশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গীতেও রামচন্দ্রের এই আদর্শনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা বা নৈতিকসত্তা প্রাধান্য পায় নি। তিনি রামের মধ্যে 'সাম্রাজ্যবাদী সীজারের''[২৭] সাদৃশ্য দেখেন। রামকে তিনি শ্রেষ্ঠ 'কূটনীতিজ্ঞ'[২৮] বলেছেন। কূটনীতির সঙ্গে তিনি ধর্মনীতিকে মোটের উপর মিলিয়ে নিয়েছেন। রাজশেখর বসু মনে করেছিলেন, রাজ্যের জন্য রামচন্দ্রের পত্নীত্যাগের ঘটনায় এবং তখনকার হারেমবিলাসী যুগে রামচন্দ্রের সারাজীবন এক পত্নীত্বে অনুরক্ত থাকার ঘটনার মধ্যে রামচন্দ্রের আদর্শ ও একনিষ্ঠতার চূড়ান্ত পরিচয় আছে। এ প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেবের জিজ্ঞাসা —

কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন
সমাজব্যবস্থা অনুসারে?[২৯]

তিনি রাজশেখর বসুর অনুবাদ উদ্ধৃত করে দেখালেন সীতার প্রতি রামচন্দ্রের রুচিহীন আচরণ। যুদ্ধের সমাপ্তিতে এত দুঃখে ফিরে পাওয়া সীতাকে প্রথম দেখে রাম বললেন —

তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, ... আমি মতিস্থির
করে বলছি, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ,
যাকে ইচ্ছা কর, তাঁর সঙ্গে যাও অথবা তোমার যা অভিরুচি কর ...।[৩০]

এর সমালোচনা করে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

ছী-ছী! আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল করে বলে ওঠে ছী-ছী!
কী করে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন ....।[৩১]

এবং এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে রামচন্দ্রকে এতটা নীচে নামাতে হয়েছিলো বলেই তাঁর মানবিক

স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বুদ্ধদেব একালের নৈতিকতা দিয়ে সেকালের জীবনতত্ত্বকে ধিক্কার দিচ্ছেন। সেকালের সঙ্গে একালের পার্থক্য রাখছেন না। এছাড়াও বলতে হয় নিতান্ত একালেও পরপুরুষ দ্বারা হৃত নারীর মর্যাদা খুব বাড়েনি। একালের উচ্চারণ ভিন্ন। রামের মতো স্পষ্ট নয় কিন্তু আচরণ রামের চাইতে কিছু ভিন্নময়। দ্বিতীয়তঃ মহাকবির যে নিরঞ্জন বাস্তবতার তিনি গুণকীর্তন করেন তাকে তো সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন বলেই মনে করি। তৃতীয়তঃ মহাকবির কাছে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক রচনা অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল রামের মহোচ্চ চরিত্র রচনা। সে চরিত্রে ছিল সেকালের জীবনাদর্শ। তাতে নারীর জীবন কী হবে কোন দিকে যাবে তার স্থান নির্ণয় হয় নি বলে প্রাচীন ভারতীয় নারীর প্রতি পুরুষের আচরণের চিত্রে উষ্মা প্রকাশ করা যায় কিন্তু মহাকবির আদর্শ ছিলো যে রামের চরিত্রের নানা দিক উন্মোচন করে দেখানো তা করা হয় না।

আসলে, রামচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুবর্তী দীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়। বরং বুদ্ধদেবের ধারনা খানিকটা স্বতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টিতে রাম মানবিক ত্রুটির বাইরে আদর্শের প্রতিভূ হতে পারে নি। মহাপুরুষ বা অবতার সে নয়। তাঁর চোখে রাম মানুষ, বীর-কর্মিষ্ঠ-ধর্মের খানিকটা অনুগামী। তিনি রাম চরিত্রের সারাৎসার ভেবেছেন এভাবে, রাম কর্মকে মেনেছেন সবার চেয়ে বড় বলে। কর্মের মাহাত্ম্যকেই তাঁর চরিত্রের মূল ভেবেছেন; তবে তাঁর যাবতীয় কর্মই নিস্কাম। নিজের জন্য তাঁর প্রত্যাশা নেই। তাঁর অভিযান ও জয় সমস্তই পরার্থে। এমনকি, নিজের জীবনের সুখ, সম্ভোগ, শান্তিও। তাই তিনি মহৎ। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার প্রতীক। তবে, তিনি রামকে যে 'সাম্রাজ্যবাদী' বলেছেন সে প্রসঙ্গে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। কেননা, কোনো সাম্রাজ্য তিনি গ্রাস করেননি, তাঁর আত্মভোগের জন্য কোনো রাজ্যজয় ও দেখানো হয় নি। বরং প্রজানুরঞ্জন ও দুঃখময় ত্যাগকেই তাঁর জীবনের ব্রতরূপে তিনি গ্রহন করেছেন। আবার, রাম চরিত্রের নবমূল্যায়ণের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু এককথায় আমাদের চিরাচরিত সংস্কারের গায়েই আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই কি সেই সংস্কারের উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন? রামচরিত্র সম্পর্কে একধরনের দ্বিধা তাঁর মধ্যে ছিলো তাই তিনি বলেন —

> তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালীন আদর্শ যদি না দেখতে পেলাম
> তবে তিনি রাম কিসের।[৩২]

অর্থ্যাৎ রামের অবতারত্বের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আমরা এখানে পেয়ে যাই। আর, সেকারনেই আদর্শচ্যুত রামকে 'অরাম' বলে উল্লেখ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

'রামায়ণ' সমালোচনায় বুদ্ধদেবের আর একটি প্রসঙ্গ হলো রামায়ণের অসংখ্য অসংগতি গুলির আলোচনা। এই অসংগতির কারন নির্দেশ করেছেন অনেকেই। রাজশেখর বসু লিখেছেন —

> রামায়ণ পাঠে কয়েকস্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত রয়ে যায়।[৩৩]

'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই অসংগতির দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে আনেন উপেক্ষিতা উর্মিলাকে। 'রামায়ণে'র অসংগতিগুলির উল্লেখ করে, বুদ্ধদেব বসু এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যভাবে। তাঁর মতে, আদি কবি উদাসীন। আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন। তাঁর বাস্তবতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে,

ঘটনা বর্ণনে কি চরিত্রবিত্রণে নিছক বাস্তব সদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন।[৩৪]

উপেক্ষিতা উর্মিলার সঙ্গে তিনি আরও অনেক উপেক্ষিত চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। শিল্পীর উপেক্ষা লক্ষ্মণের প্রতিও। বনবাস যাত্রার সময়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস কিংবা একটু বিদায় পর্যন্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হ'ল না তাঁকে। কৈকেয়ী সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে বুদ্ধদেবের মনে - রামকে অকারণে বনবাসে পাঠিয়ে, পরে একবারও কি তাঁর অনুশোচনা হয় নি? আবার, 'রামায়ণে'র মুখ্যচরিত্র রামের মধ্যেও বুদ্ধদেব শিল্পীর উপেক্ষা লক্ষ্য করেছেন। কেননা, প্রেমিক রামের পূর্ণচ্ছবি রামায়ণে নেই। তাঁর দাম্পত্য জীবনের সুখচ্ছবি ক্ষুদ্র, প্রায় সারাজীবন রামকে কাটাতে হয় সীতা বিরহে। যে রাম রাজধর্মের তাগিদে সীতাকে বিসর্জন দিলেন, অন্ততঃ হৃদয়ধর্মের তাগিদে তাঁর শোকোচ্ছ্বাস স্পষ্ট করতে পারতেন কবি। অবশ্য এসব প্রশ্নের উত্তরও বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে যথাসাধ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, হয়তো এই উদাসীনতা, এই উপেক্ষাই শ্রেষ্ট নিরীক্ষা; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিল যা আদিকবিকে চিরকালের শিল্পী করে তুলেছে। বুদ্ধদেব বসু তাই বলেন যে এসব প্রশ্নের উত্তর আছে প্রতি রামায়ণ পাঠকের হৃদয়ে। আর - 'সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি।'[৩৫] কেননা,

> আদিকবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য এইখানে যে .... তিনি নিজে
> যা বলতে ভোলেন সে কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে।[৩৬]

এমনও সম্ভব যে, কোনো মহাকবিরই এমন ছোটখাট বিষয়ে যথা উর্মিলার কাছে লক্ষ্মণের বিদায় প্রার্থনা-রামের বনবাসে কৈকেয়ীর দুঃখ - মনোযোগ দেবার অবকাশ ছিল না। কারন যে বৃহত্তের সংগীত তাঁদের কাব্যে রচিত হচ্ছে তাতে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাবগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব বা অনুপযুক্তও বটে।

সাহিত্য হিসেবেই বুদ্ধদেব 'রামায়ণে'র রসবিচার করেছেন। 'রামায়ণে'র মতো প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনায় তিনি পূর্বতন সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন নি। ভারতবর্ষের আবহমান কালের চিরাচরিত ধারনার বশবর্তী না হয়ে তিনি সম্পূর্ন ভিন্নভাবে রামচরিত্র এবং রামকাহিনী উভয়কেই বিচার করেছেন। 'রামায়ণে' পরিবারের আদর্শ চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন দীনেশ চন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'গৃহাশ্রমের কাব্য'।[৩৭] বুদ্ধদেব বসু এঁদের বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি। কেননা, 'রামায়নে'ই আছে ঘরের শত্রু বিভীষণ - কুভ্রাতা, বালী,-পত্নী তারা -সাধ্বীচ্যুতা। এঁরা অনার্য বলে এঁদের কথা বাদ দিলেও অন্য অনেক চরিত্রই আদর্শনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল।

> ইক্ষ্বাকু বংশজাত দশরথ ভার্যার মান ভঞ্জনের জন্য মোহাচ্ছন্নভাবে
> বলেছেন - 'বলো কোন অবধ্যকে বধ করতে হবে, কোন বধ্যকে
> মুক্তিদান করবো? (অযোধ্যা : ১০:১৩)[৩৮]

বুদ্ধদেবের প্রশ্ন —

> সেই দশরথ কি গৃহপতির ভূমিকায় চলনসই রকম ও ভালো?[৩৯]

আবার, নিজের স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্মণের, নিষ্ঠুর উদাসীনতা, এবং ভ্রাতৃবধুর প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষনকেও বুদ্ধদেব আদর্শনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত মনে করেন না। 'রামায়ণ'কে তাই তিনি আদর্শ পারিবারিক চিত্র বলতে চান না। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, ভারতীয় গৃহাশ্রম নিজের সুখ-সুবিধা, স্ত্রী-পুত্র নিয়েই নয় - সেই গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারন করে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে তাত্ত্বিক দিকে থেকে মেনে নিয়েও বুদ্ধদেব বলেছেন যে, - গৃহের কেন্দ্রবিন্দুটি নিভৃত ও ঘনিষ্ঠ, অল্প কয়েকটি সহবাসী ও সহযোগী মানুষকে ঘিরে ঘিরেই তা গড়ে ওঠে ও সমাজকে আতিথ্য দেবার মতো বল প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের গৃহ রচনার অবকাশ রামের জীবনে অল্পই এসেছিলো। পারিবারিক সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি, রাম সেভাবে সম্পর্কে ধরা দেননি কখনো। তিনি সবসময় মহত্ত্ব দ্বারা মন্ডিত হয়ে আছেন। যেখানে তিনি পুত্র বা পতি বা ভ্রাতা, সেখানেও তিনি প্রভাবশালী লোকনায়ক। তাঁর সঙ্গে কারো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই। রাম-লক্ষ্মণের সম্পর্ক

> দুই সমকক্ষ ভ্রাতার নয়, আদেশ কর্তা প্রভু ও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের।[৪০]

পিতার মৃত্যু সংবাদে রাম বিচলিত হয়না খুব বেশী। পত্নীকে বিনাদোষে ত্যাগ করেন নির্লিপ্তভাবেই। বহুদিন পরে নিজের পুত্রদের সামনে পেয়েও আবেগে ব্যাকুল হয়ে কোনো গদগদ ভাষণ নেই তাঁর মুখে। রাজা, যোদ্ধা, সত্যব্রত বীর, আর শেষপর্যায়ে নিঃশোকভাবে যজ্ঞপরায়ণ - এইসব প্রধান ভূমিকায় রামকে দেখে দেখে আমরা এতদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়েছি যে; চেষ্টা করেও কোনো অন্তঃপুরে বা গৃহাঙ্গণে তাঁকে ধরাতে পারি না - কেবলই মনে হয়, গার্হস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বেশী মহৎ তিনি, অত্যন্ত বেশী বৃহৎ'।[৪১] তাই, বুদ্ধদেবের মতে বাল্মীকি সচেতনভাবে কোনো গৃহাশ্রমের কাব্য লেখেন নি। তাঁর রামায়ণ ঘোষিত ভাবে এক মহাপুরুষের জীবনচরিত।[৪২]

বুদ্ধদেব বসু রামায়ণের যে সমালোচনা করেছেন তাতে কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'রামায়ণে'র মতো ধ্রুপদী সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি আদি কবির ক্লাসিক্যাল নিরঞ্জন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। অথচ শুদ্ধ, সত্য, সেই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কথা বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং সবসময় মনে রাখেন নি। 'রামায়ণে'র খুঁটিনাটি অসংগতি গুলির সবিস্তার সমালোচনা করেছেন তিনি। রাবণ বধের পর রাম যেরকম কটু ভাষায় সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার সমালোচনা করে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ছী - ছী! ... কী করে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা
> পেরেছিলেন কী করে।[৪৩]

ধ্রুপদী কবির অসচেতন সহজ সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রাখলে বুদ্ধদেব এ প্রশ্ন তুলতেন না। সীতার প্রতি রামের এই আচরণ যে হৃদয়হীন, রুচিহীন একথা তিনি বলতে ভোলেন না। আবার, যে রামচরিত্রের নবমূল্যায়ণ করে তিনি বলেছেন —

> দেহধারী মানুষ হয়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হয়ে যতটা মুক্ত,
> শুদ্ধ ও সম্পূর্ন হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তাই। ... এমনকি,
> মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকেও তাঁর রক্ষা নেই।[৪৪]

সেই তাঁকেই বলতে শুনি -

> আমার মনে হয় যে, রামের দিক থেকে সমস্তটাই ছল। সমস্তটাই
> লীলা, ... সীতাহরণটার আর কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল।
> আর রাবণ বধও আর কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম উদ্‌যাপনের উপলক্ষ।[৪৫]

একথা স্বীকার করলে যেন চিরপুরাতন ভারতীয় লীলাবাদে প্রছন্ন বিশ্বাসের ইঙ্গিতই ফুটে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু আরো বলেন যে সীতা উদ্ধারের ঘটনা উপলক্ষ, 'লক্ষ্য হল রামের সর্বাঙ্গীন মরত্বভোগ।' [৪৬] শুধু মরত্বভোগের জন্যই যদি রামকে দেহধারন করতে হয়, এবং তাঁর কার্যকলাপকে যদি 'লীলা' বলেই মনে হয়, তবে দোষে গুণে জড়িত মানুষ বলে আর তাঁকে ভাবা যায় না।

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ' সমালোচনার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দুটি ভূমিকা নিয়েছেন। (১) চিরকালীন আদর্শে মানুষ হিসাবে রামের গুরুত্ব দেখানো বা বিচার করা এবং (২) আদি কবির আদি Classic দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'রামায়ণ' বিচার। যদি আদি কবির আদি Classic দৃষ্টিভঙ্গির উত্থাপন করতে হয় তাহলে, সেকালের আদর্শ না এসে পারে না। শম্বুক বধ বা অন্যান্য কাজ সেকালের আর্য-বিধিতে অন্যায় ছিলো না। অন্যায় একালের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। বুদ্ধদেব বসু একালের সঙ্গে আদি কবির দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন।

বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ' সমালোচনার মূল কারণ দুটি। প্রথমতঃ মাইকেলের 'রামায়ণ' সম্বন্ধে প্রথাবিরোধী ভাবনার সীমাবদ্ধতা বুদ্ধদেবের চোখে পড়েছিল। রাজশেখর বসুর 'রামায়ণে'র সারানুবাদ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াকে বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ' সমালোচনার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল মাইকেল ছিলেন 'প্রথাভীরু'[৪৭] সে কারণে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন কেন। সম্ভোগের জন্য?'[৪৮] এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। রাজশেখর বসু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। উত্তরে লিখেছিলেন — 'বলবান লম্পট চিরকাল যা করে থাকে রাবণও তাই করেছেন।'[৪৯] বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে লিখেছেন যে রাজশেখর বসুর বইখানিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে তাঁর মনের মতো উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না।[৫০] রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন সীতাকে সম্ভোগের জন্য - এরকম ভেবে নিলে রাবণের মহত্ত্ব নয় দুশ্চরিত্রতাই প্রতিপন্ন হয়। মাইকেলের কাব্যে প্রোথিত এই জিজ্ঞাসার একটা আনুমানিক উত্তর বুদ্ধদেব দিতে চেয়েছেন এইভাবে -

> এরকম অনুমান করতে বাধা নেই যে রাবণ সত্যিই সীতাকে
> ভালোবেসেছিলেন, আধুনিক অর্থে ভালোবেসেছিলেন; তাহলেই
> রাবণের ব্যবহার আমাদের চোখে সংযত লাগে, এবং তাঁর চরিত্রে
> মহত্ত্বের সম্ভাবনাও আমরা দেখতে পাই।[৫১]

অর্থ্যাৎ, সম্ভোগের জন্যে নয়, ভালোবেসেই রাবণ সীতাকে অশোকবনে একাকিনী রেখেছিলেন। কিন্তু, বুদ্ধদেবের এই স্বকপোলকল্পিত উত্তর প্রসঙ্গে একটি কথাই বলা দরকার যে তাঁর মতো আধুনিক ভালোবাসার তত্ত্বে বিশ্বাস করতে হলেও অন্ততঃ এটুকু প্রয়োজন ছিলো যে রাবণ একলহমার জন্যে হলেও সীতাকে

আগে দেখেছেন - এ ধরনের কোনো সূত্র 'রামায়ণে' নেই, বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রবনজাত প্রেম এক্ষেত্রে কাজে লেগেছে কিনা বুদ্ধদেব বসু এরও কোনো ইঙ্গিত দিয়ে যান নি। আর তাই একথা বলা যায় যে তিনি তাঁর নিজের মতো করেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছেন।

বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধটি ১৯৪৭ সালের লেখা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আর গোটা পশ্চিম জুড়ে নেমেছে যুদ্ধ শেষের ক্লান্তি আর হতাশা। দুদিক থেকে জীবন কেবল যাপনের মাত্রা পাচ্ছে। একদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে দুদিনের জীবন সম্ভোগ। যে বিরাট যুদ্ধের ভয়াবহ বৈনাশিকতা মানুষের জীবনের সব মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তা এই জীবনের স্থিতিকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে গেল জীবনের স্থায়িত্ব কিছু নেই। তাই কেবল জীবন সম্ভোগ। জীবনকে নিয়ে হাসিকান্নার খেলাঘর গড়ে তোলাই হল একটা লক্ষ্য। আর একদিকে এসে ঘিরেছে এই জীবনের সারহীনতা। একটা বিষন্নতা, একটা প্রবল ঔদাসীন্য জীবনকে গ্রাস করেছে। পশ্চিমের এই ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছিল তখনকার সাহিত্যে এবং দর্শনে। তার রেশ এসছিলো এদেশে। মনে করতে পারি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিমী সাহিত্যের আবহাওয়ায় জন্ম নিয়েছিলেন এদেশের আধুনিকেরা - তারই লালন চলছে এই মধ্যবর্তী পর্বে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী হাওয়া সব মানবিক উচ্চারণকে স্তব্ধ করে দিয়ে এই জীবনের ক্ষণিকত্বকেই যেন স্পষ্ট করে দিল। বুদ্ধদেব এই আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছিলেন বলেই ব্যক্তিগত ভাবনার দর্পনে তিনি 'রামায়ণে'র ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিগত ভাবে রবীন্দনাথের রামায়ণ সমালোচনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কম। পার্থক্য শুধু এইখানে যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'রামায়ণ'কে ভারতবাসীর চিরকালীন এক সাহিত্য বলে ধরে নিয়েছেন, বুদ্ধদেব বসু সেখানে আধুনিক চিন্তা, চেতনা ও মননের মধ্যে মহাকাব্যের উত্তর প্রত্যাশী। বুদ্ধদেব তাঁর কালের ভাবনার আলোয় 'রামায়ণ' পাঠ করেছেন, 'the good and the beautiful' এর তত্ত্বের ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে তৎকালীন 'poetry as a text' এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যাকে 'New Criticism' এর দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায়, সেদিক থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তাঁর সমালোচনাও একপ্রকার 'Impressionistic criticism' যা রবীন্দ্রনাথের মতো এতোটা ভাবোত্তেজিত না হলেও আত্মভাবময়।

। খ ।

উনিশ শতকে প্রাচীন সাহিত্যের দিক চোখ ফেরানো শুরু হয়েছিল ইংরেজদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য চর্চার অনুসরণে। বিশেষ করে কালিদাসকে সারা পৃথিবীর মানুষ তখন আবিষ্কার করেছিল। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র মাধ্যমেই সারা পৃথিবীর কাব্য রসিক মানুষের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মুগ্ধ পরিচয় হয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে কালিদাসের আলোচনার একটা ধারাবাহিতকা ছিল। তবে নব্যশিক্ষিতেরা তাঁকে ততটা গুরুত্ব দিতেন না। তাঁদের কাছে শেক্সপীয়ার ছিলেন বড় কবি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমূখেরা ছিলেন এই ধারার মানুষ। বিদ্যাসাগর অবশ্য কালিদাসের কবিত্বকে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় উপস্থাপনযোগ্য ভেবেছিলেন। বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে চন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত কালিদাস সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি শেক্সপীয়ারের সঙ্গে কালিদাসের কবিপ্রতিভার তুলনার একটি ভালো দৃষ্টান্ত।

উনিশ শতকের এইসব চিন্তাচর্চায় ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল। ক্রমশঃ বাঙালীর জীবনে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছিল। এর কারণ মনে হয় পাশ্চত্য ভাবপ্রেরণোর জায়গায় ভারতীয় ভাবপ্রেরণার প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমে দুই প্রেরণার একটা সমানুপাতিকতা রক্ষার চেষ্টা ছিল। কিন্তু ঝোঁক ছিল প্রাচ্যাদর্শের দিকে। রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন পাশ্চত্য কাব্যপ্রেরণা নিয়ে। কবি শেলী, কীটস প্রমূখের রোমান্টিক দর্শন তাঁকে আবিষ্ট করেছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা মোড় ফেরাও শুরু হয়েছিল। ভারতীয় দর্শন এবং কাব্যসাহিত্যের দিকে তিনি প্রবল আগ্রহে তাকিয়েছিলেন। এর ফলে যেমন প্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থাবলী, তেমনি কালিদাসও নূতন করে আবিষ্কৃত হয়েছেন।

প্রাচীন ভারতের চিত্তদূতরূপে কালিদাসকে একালে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর লেখায় কালিদাসের প্রসঙ্গ প্রচুর। কেবল 'মেঘদূত' নিয়েই ১১টি রচনার উল্লেখ করেছেন ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫২] কালিদাসের কাব্যরীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির পার্থক্য ছিলো।[৫৩] তিনি কালিদাসের কাব্যের অন্তর্গত বস্তুরূপের ভাবটুকুকে একালের দৃষ্টিতে উন্মোচিত করেছেন। 'মেঘদূত' কাব্যে তিনি যে বিরহের চিরকালীন ব্যঞ্জনা সন্ধান করেছেন কালিদাসের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়বার কথা নয়। কালিদাস বিশেষের অন্তরে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা খোঁজেন নি,এর কাব্যিক ভাবভূমিতে তাঁর সঞ্চারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ভাবনার সেই নির্বিশেষ ভাবরূপকে এই 'মেঘদূত' কাব্যের মধ্যে খুঁজলেন। মেঘদূত নিয়ে তাঁর প্রথম লেখা 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' (১৮৯০) কবিতা। সেখানে যে চিরন্তন বিরহ, প্রাচীন ভারতের যে সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে সেই সৌন্দর্যের অলকাপুরীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তাই গদ্যভাষায় লিখলেন দু'বছর পরে ১৮৯২ সালে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে 'প্রাচীন সাহিত্যে' যা সংকলিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূতে'র যে সমালোচনা করেছেন, তা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যপাঠের ভাবোত্তেজিত প্রতিক্রিয়া। 'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষের বিরহকেই তিনি সঞ্চারিত দেখেছেন প্রত্যেক মানুষের হৃদয়লোকে। তাহলেও, রবীন্দ্রনাথের কাছে মেঘদূত অবলম্বনমাত্র। মেঘদূতকে কেন্দ্র করে তিনি একটা চিরন্তন বিরহের ধারনা গড়ে তুলেছেন। তাঁর নিজস্ব আনন্দ ও সৌন্দর্যের দৃষ্টি থেকেই 'মেঘদূত' কাব্য ব্যাখ্যা করেছেন।

> "রসভোগ তাঁর মূল উদ্দেশ্য এবং রসভোগের জন্য তিনি
> মেঘদূতকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।"[৫৪]

এখানে 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি স্মরণ করা যায় যেখানে তিনি অনুরূপ ভাবই অবলম্বন করেছেন। তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে আছে, প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে আধুনিক সৌন্দর্যহীন সংসারের প্রতিতুলনা। একটা বিরহের ভাবাত্মক ধারণা এই কাব্যটিকে অবলম্বন করে গড়ে তোলা হয়েছে। সে বিরহ যেমন অতীত ও বর্তমানে, তেমনি মানুষে মানুষে, আবার তা মানুষের অন্তরে ও বাইরে। আর কেবল শিল্পবস্তু এই বিরহের দুই কোটির মধ্যে একটা সেতু রচনা করে। তাই সমালোচনা হিসেবে 'মেঘদূত' আত্মগত ভাবোচ্ছাসে পরিপূর্ন এক নতুন সৃষ্টি, — Creation within a creation.

অনূদিত কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' শিরোনামে বুদ্ধদেবের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'ল ১৯৫৭ সালে। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত লেখার প্রায় ৬৫ বছর পরে। ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যে দুটি পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আর সেই সঙ্গে সাহিত্যে রবীন্দ্রভাবিত চিরবিরহের তত্ত্ববোধেরও মৃত্যু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনতা বোধের পাশে পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদ এবং জীবনের ক্ষণিকত্ববোধ এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তাই 'মেঘদূত' সমালোচনায় পূর্ববর্তীদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের চিন্তার পার্থক্য ঘটেছে। এ পার্থক্য নিম্নরূপ —

১) রবীন্দ্রবেতনায় বিরহ বলয়ের বাইরে গিয়ে ভাবনা
২ রোমান্টিক কবির মনের নিরিখে না দেখে বস্তুকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা, আর
৩) যুগজীবনের ধর্মে, কবির মনোধর্মে এবং নতুন কাব্যবোধের ধর্মে স্বাতন্ত্র্য।

এই তিনটি বিষয়ের কথা মনে রেখে বুদ্ধদেবের 'মেঘদূত' সমালোচনাকে দেখতে হবে।

তর্কাতীত হলেও বুদ্ধদেব আরও একবার কালিদাসের অসাধারণ কবিত্ব শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। 'মেঘদূত' কাব্যগুণে লোকপ্রিয় হয়েছে। সংস্কৃত কবিতাকে সামগ্রিকভাবে বুদ্ধদেব বলেছেন কৃত্রিম। আর, এই কৃত্রিমতার মূল কথা হল শব্দ, চিত্রকলা, উপমা সবই একটা তৈরী করা আদর্শের অনুসরণকারী। একে এলিয়ট তাঁর 'Whatis classic' প্রবন্ধে maturity নামে অভিহিত করেন। পরম কৃত্রিম আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কবিতা কত ভালো হতে পারে তার নিদর্শন আছে 'মেঘদূত'-এ। এতে ব্যকরণের চাতুরী থাকলেও কাব্যগুণ এত বেশী আছে যে পাঠকের পক্ষে দুস্পাঠ্য মনে হয় না। 'মেঘদূতে'র সঙ্গে সংস্কৃতে লেখা বাল্মীকি-রামায়ণের তুলনায় 'মেঘদূতে'র দৈর্ঘ্য অনেক কম বলে তা পাঠকের পক্ষে ভার হয়ে ওঠে না। এই ব্যস্ততার যুগেও একে বার বার পাঠ করা যায়।

কালিদাসের কবি মানসিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। আধুনিক কবিদের মতো তিনি নিজেকে অপূর্ব ও নতুন মনে করেন না। তিনি নিজেকে জানেন এক দীর্ঘ কবিবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে। এই কবিবংশের উত্তরাধিকার তত্ত্ব আছে এলিয়টের 'Tradition and Individual Talent' প্রবন্ধে। এলিয়ট বলেছেন প্রত্যেক কবিকেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। ক্লাসিক কবিকে তো বিশেষ করে যুগমানসের পরিণত মন এবং ঐতিহ্যবোধকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠতে হয়। তাই কালিদাসের স্বীকারোক্তি কোনো নতুন বিষয় উন্মোচিত করে না বলেই আমাদের মনে হয়। 'মেঘদূতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> "এই কাব্য আদিরস ও করুণসের এক বহুবর্ণ সন্নিপাতরূপে আমাদের
> মনে প্রতিভাত হয় .... এই সমন্বয় সাধনে বাল্মীকির আদর্শ কত
> কাজে লেগেছে, তার প্রমান স্তরে স্তরে পাওয়া যায়।"[৫৫]

এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বাৎস্যায়ণ, অশ্বঘোষ ও ব্যাপকভাবে বাল্মীকির 'রামায়ণে'র কাছে ঋণী। তিনি প্রাচীন সাহিত্যের ধর্মরূপে আদি ও করুণ দুইরসের প্রায় যৌগপত্য দেখাচ্ছেন। 'রামায়ণ', 'বুদ্ধচরিতে'র প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং 'মেঘদূতে'র তুলনা আসছে এই রসযুগলের অঙ্গাঙ্গী উপস্থাপনার দিক থেকে। আর এর মধ্যে দেহাচেতনা সম্বন্ধে আধুনিক কবিদের যে বোধ তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কিংবা এই বোধকেই বুদ্ধদেব কাব্যের মধ্যে খুঁজেছেন। ফলে, নিজের যুগচৈতন্যের সম্প্রসারণ হিসেবে 'মেঘদূতে'র মধ্যে সেই চিন্তা চর্চাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিরহ ব্যাথার প্রথম উচ্চারণও তিনি দেখেছেন বাল্মীকিতে। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পরে রাম সর্বভূতে সীতার প্রতিরূপ দেখতে লাগলেন। রামের সেই আকুলতা যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত কবিতায় প্রতিধ্বনিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। 'উত্তর মেঘের' প্রথম শ্লোকেও বাল্মীকির প্রতিধ্বনি আছে। অলকায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন লঙ্কাপুরীর একাধিক লক্ষণ। যক্ষের উন্মত্ততা দেখে কিস্কিন্ধ্যাকান্ডের রামকে এবং তার পত্নীকে দেখে সুন্দরকান্ডের সীতাকে মনে পড়ে। শিল্পতাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন প্রতিভার লক্ষণ হল নানা বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্যিটিকে অনুধাবন করবার ক্ষমতা। বুদ্ধদেব 'রামায়ণে'র সঙ্গে মেঘদূতের এই বিরহ-কারুণ্যগত সাদৃশ্য বা ভাবৈক্য খুঁজেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ঐক্য দেখাতে তিনি বিরহকাতর সীতা আর যক্ষপ্রিয়ার তুলনা দেখালেন। তাহলেও 'মেঘদূত' কাব্যে 'রামায়ণে'র প্রভাব কত ঘনিষ্ঠ কিংবা বুদ্ধচরিতের শ্লথাঞ্চল রমণী বর্ননা এখানে অন্বিষ্ট নয়, বাৎস্যায়ণের বিস্তারও মুখ্য প্রসঙ্গ নয়। এর মধ্যে থেকে যে তথ্য পাই আমরা তা হল — সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারীরূপে 'মেঘদূতে'র প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষের বিরহ প্রধান প্রতিপাদ্য। দীর্ঘকাল প্রিয়তমার অদর্শনে যক্ষ ব্যাকুল। এমনকি, অপ্রকৃতিস্থ কিন্তু বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ নেই, বরং পাওয়া যায় একটি সুবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রায় হিসেবি মনের পরিচয়। যে মন কোনো প্রয়োজনীয় ছোটো তথ্যও ভোলে না। বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কাজ আদান করে নিতে চায় সে। হতে পারে, এও প্রণয়ীর ব্যকুলতার

এক ধরনের উন্মাদনা। কিন্তু, এই যক্ষই যখন নিপুনভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দূতকে পথ নির্দেশ দেয়, গন্ত ব্যপথে নানা রমণীয় নয়ণ-শোভন দৃশ্য, মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে থাকে, পূর্বমেঘের যাবতীয় বর্ননার মধ্যে, প্রেমিক যক্ষের নিবেদনের মধ্যে একটু অসংগতি যেন থেকেই যায়। শুধু পূর্বমেঘেই নয়, উত্তরমেঘেও দেখা যায় - মেঘ কোন্ জায়গা থেকে যক্ষপ্রিয়াকে দেখবে, কেমন করে দেখবে, কি সম্ভাষণ করবে, যক্ষ সমস্তই নির্দেশ করছে। প্রেমিক যক্ষের এই সতর্কতা, ধাপে ধাপে নিখুঁতভাবে ভেবেচিন্তে বার্তা প্রেরণ পদ্ধতিও বিস্ময়কর। ঠিক প্রেমিক বলতে যা বোঝা যায়, সেই চিরপরিচিত ধারণার মধ্যেও কোথায় যেন খটকা বাঁধে। রেনেসাঁ-পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে আমাদের বৈষ্ণব ও আধুনিক সাহিত্য থেকে প্রেমিক সম্বন্ধে যে ধারনা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তার সঙ্গে এই যক্ষের মিল নেই। সে বিরহ ব্যাকুল হয়েও যুক্তি-বুদ্ধি মেনে চলে, কান্ডজ্ঞান হারায় না। তার কথা শুনে তাকে প্রেমিক মনে হয় না, বরং খাঁটি সংসারধর্মী সে। এইভাবে 'মেঘদূতে'র রবীন্দ্রব্যাখ্যার বিরহবোধ একেবারে বিপরীত দিক থেকে বিশ্লেষণের অবকাশ পায়। বুদ্ধদেব লিখেছেন—

> "এ কেমন বিরহী ... যে তার লক্ষ্যের প্রতি তন্ময় হয়ে নেই,
> দূতকে তাড়া না দিয়ে, যে উল্টে তাকে বার বার বিরাম দিতে বলে,
> বলে ঘুরে যেতে ... নানা প্রমোদ মেতে উঠতে?"[৫৬]

এটা কি এমন যে যক্ষ মেঘকেই মধ্যস্থ করে এই তথ্যনিবিড় আপাত মন্থর বর্ননার মধ্যে নিজের আত্মসম্ভোগেরই কাজ করছে? এজন্যই হয়তো এমনভাবে মেঘকে প্রিয়ার কাছে যেতে বলার তাড়া নেই, প্রিয়ার কাছে যাওয়ার উপলক্ষটাই আসল। কালিদাস কবি হিসেবে কখনো একালের কবির মতো বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে মিশে যাননি। বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বজায় রাখবার artistc ধর্ম বজায় আছে। সেজন্যই কবি কালিদাস আর যক্ষ পৃথক ব্যক্তি। কবিধর্মের সুমিত সংহতি, আভ্যন্তর শৃঙ্খলা আর মার্জিত ভাষণ 'মেঘদূত' কাব্যে দেখি। আর মেঘকে যে বছর বছর সুখসম্ভোগে নিরত করে রেখেছেন কবি, তার মূলেও আছে অতীতকালের কাব্য-সৌন্দর্য চেতনার ভিন্নবোধ। কবি একদিকে বিরহী নায়িকার বেদনা, অন্যদিকে মেঘের দৃশ্যসম্ভোগের চিত্র রচনা করে কাব্যটির মধ্যে বিরহের আর্তি ঘনিয়ে তুলেছেন।

মনে রাখা দরকার, কালিদাসের কালে আমরা যাকে রোমান্টিক মানুষ বলি তার দেখা মিলত না। জীবনে মানসিক বিরহের চাইতে দৈহিক বিরহই ছিল গভীর। বুদ্ধদেব নিজে মনে করেছেন যক্ষের কাতরতা কবির বর্ণনায় যতটা আছে, তার কথায় বা ব্যবহারে ততটা নেই। কাব্যে যক্ষের কাতরতা তার নিজের প্রিয়া-বিরহে তত নয়, যতটা প্রিয়ার প্রিয়তম বিরহের আকুলতা। প্রিয়তমা বুঝি বিরহ-দুংখে কাতর হয়ে প্রাণত্যাগ করে - এই আশংকাতেই যক্ষ সারাক্ষণ শঙ্কিত। যক্ষ বার বার মেঘকে অনুনয় করেছে, তার বার্তা নিয়ে প্রিয়াকে দেওয়ার জন্য। প্রিয়ার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে আসার জন্য উত্তর মেঘে একবার মাত্র সে উল্লেখ করেছে।

> 'পাঠাবে প্রিয়া তার কুশল-সমাচার, এনো অভিজ্ঞান সঙ্গে
> প্রভাত কুন্দের মতোই স্খলমান আমার জীবন ও রক্ষা করো।[৫৭]

এছাড়া সারাক্ষণ সে তার প্রিয়ার জীবন রক্ষার কথাই ভেবেছে। নারী যখন স্বীয় প্রেয়সী, তখন বিরহীর কাছে এতখানি পরোপকারবৃত্তি একেবারেই আশা করা যায় না। যক্ষের এই আচরণ তার প্রেমিক বৃত্তির অন্তরায় হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যেন সত্যিকার বিরহের প্রকাশ ঘটেনি। বুদ্ধদেবের মতে, 'মেঘদূতে'র বিষয়বস্তুতে বিরহ-যন্ত্রনার অবকাশ নেই। কেননা, যক্ষের সঙ্গে তার প্রিয়তমার বিচ্ছেদ নাতিদীর্ঘ। এই ক্ষণিক বিচ্ছেদে বিরহের তীব্রতা দেখানোই সম্ভব নয়।

বুদ্ধদেব 'মেঘদূত'কে বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক বিরহের কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রোমান্টিক কাব্যবোধ দিয়ে ক্লাসিক কাব্যচিন্তার বিচার করেছেন। বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যে 'মেঘদূত' এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্ষা ও বিরহের সম্বন্ধবিষয়ক কবিতায় 'মেঘদূত' অতুলনীয় নয়। কখনো কখনো বৈষ্ণব পদাবলী বা রবীন্দ্র কবিতায় বিরহের প্রকাশ হয়েছে অনবদ্য। তিনি বৈষ্ণব কবির 'এভরা বাদর, মাহ ভাদর ....' এবং রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এর আবেদনের সেঙ্গ 'মেঘদূত'কে তুলনাযোগ্যই মনে করেন না। এদের অন্তর্নিহিত আবেগ পাত্র ছাপিয়ে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অফুরন্তভাবে উপচে পড়ে, সে ধরণের প্রত্যক্ষ আঘাত বর্ণনা প্রধান 'মেঘদূতে' পাওয়া যায় না। বর্ষা ও বিরহ পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন চিত্রাবলীতে দেখা যায়। কিন্তু এর একীভূত সীমাহীনতা মনকে দোলা দেয়নি কখনো। হতে পারে ক্লাসিক কবির রচনা রীতিই এরকম - চিত্রধর্মিতা বেশী গীতিধর্মিতা কম। বৈষ্ণব কাব্যে তা প্রায়ই ঘটে থাকে। এবং তা কোনো বিশেষ বিরহী বা বিশেষ বিরহের কথা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে সর্বকালের বিরহ ও বিরহীর অন্তরতম বার্তা। বুদ্ধদেবের মতে, 'মেঘদূত' কাব্যের সবচেয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক প্রসঙ্গই হ'ল এই বিরহ। আর,এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর 'মেঘদূত' সমালোচনার সবচেয়ে বড় পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়া কোনো ব্যক্তি বিশেষ নন্। রবীন্দ্রনাথ যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়ার মধ্যে তাঁর চিরপোষিত ধরা-অধরা, খন্ড অসীমের ধারনা ব্যক্ত করেছেন। তাকে তাঁর নানা কবিতায় যে ভাবে পাই — অসীমের অধরা রহস্যের প্রতি গভির যে আগ্রহ পাই সে দিক থেকে দেখতে হবে। সেখানে তারা ব্যক্তি নয় - জগৎজোড়া বিরহের প্রতীকমাত্র। Particular কে ব্যক্তি হিসেবে দেখাটাকে Romantic কবির রোমান্টিকতার একটা অবলম্বন বলতে পারি। বুদ্ধদেব বসু বাল্মীকির 'রামায়ণে' সীতা হরণের পর রামের বিরহের সঙ্গে 'মেঘদূতে'র বিরহের তুলনা করে বলেন - রাম সীতাকে সন্ধান করে নানাদিকে সেখাবে ধাবিত হচ্ছিলেন, রোষ ও পরিতাপে, বেদনা ও সন্তাপে, দুঃখে ও যন্ত্রনায় যেভাবে জ্বলে উঠেছিলেন, তাতে তাঁর বিরহ যন্ত্রনা ও দুঃখবোধ প্রসঙ্গে একটুও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু 'মেঘদূত' প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে। যক্ষের সাজানো গোছানো বিরহ প্রকাশের জন্য বুদ্ধদেব তাকে ভেবেছেন একজন 'ভোগবঞ্চিত নাগররূপে'। তাঁর মনে হয়েছে যক্ষের পুরো উক্তিটি একটি সযত্নসাধিত সুগন্ধী প্রেমপত্রের মতো বুদ্ধদেবের এই ব্যাখ্যাতেও যুগমানসিকতার প্রতিফলন সন্ধান করা যায়।

বুদ্ধদেব কোনো কোনো আধুনিক কবিতার সঙ্গে 'মেঘদূত'কে তুলনা করে দেখিয়েছেন এর বিরহ কতটাই কৃত্রিম ও আরোপিত। ফাদার রবার্ট আতোয়ান বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলেছেন —

তাঁর কাছে পাণ্ডিত্য ছিল অনুভূতির অধীনস্থ সহকারী।
একথাটি তাঁর অনুবাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৮]

নরেশ গুহ বলেছেন,

অবিরাম তিনি যুদ্ধ করেছেন আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে।

এ সমস্ত মন্তব্য থেকে বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গিগত দুটি দিক পাই —

১) তাঁর অনুবাদে অনুভূতির গুরুত্ব এবং

২) তাঁর অনুভূতি আধুনিকতার স্বপক্ষে।

'মেঘদূত' অনুবাদ প্রসঙ্গে তাই বলতে পারি তিনি আধুনিকতাকে মুখ্যতঃ মনে রেখেছেন বলে 'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। তিনি জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' কবিতার—

সুরঞ্জনা ঐখানে যেওনাকো তুমি

. . . .

ফিরে এসো সুরঞ্জনা
নক্ষত্রের সোনালী আগুন ভরা রাতে [৫৯]

'ফিরে এসো' আহ্বানের মধ্যেই অভাবের শুদ্ধবেদনা সঞ্চারিত দেখেন সারাবিশ্বে। জীবনানন্দ এমনকি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যেও বিরহ অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হয় তাঁর কাছে। অবশ্য এখানে আধুনিক মন নিয়ে একালের বিরহ ও বিরহীকে খোঁজা হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যবিচারে এখানেই সীমানা লঙ্ঘন হওয়া সম্ভব। বুদ্ধদেব আধুনিক বিরহ বিষয়ক কবিতার সঙ্গে এভাবেই তুলনা করেছেন 'মেঘদূতে'র বিরহকে। তাঁর এমনও মান হয়েছে এই আধুনিক কবিতায় বিরহ তীব্রতার চাপে দেহের সীমা অতিক্রম করে যায়। অতিক্রম করে যুক্তি, বুদ্ধি, পরিম্পর্যও। কোনো স্থির সংগতির জন্য তাঁদের নায়ক-নায়িকার বিরহ অপেক্ষা করে থাকে না। কিন্তু, কালিদাসের নায়ক বিরহের মধ্যেও সম্ভাব্য বস্তুর কল্পনা করে। অসম্ভব, অকল্পনীয় বিষয় যে সন্তর্পনে, সতর্কতায় পরিহার করে এগিয়ে চলে। তাই প্রিয়ার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে তার পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিতে চায় সে। কখনো বড়জোর যে হাওয়া প্রিয়াকে স্পর্শ করেছে, তাকে আলিঙ্গন করে শীতল হতে চেয়েছে যক্ষ। বাস্তবের সম্ভাব্য লক্ষ্য বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তার বিরহ। তাই আধুনিক বিরহের কবিতার তুলনায় 'মেঘদূতে'র বিরহকে কৃত্রিম বলেছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক কবিদের এক একটি রচনা হল শূণ্যতার হাহাকার, আর যক্ষের উক্তি একটি 'অভিরাম কারু কর্ম'। যাতে বিরহদশার কৃত্যসমূহ প্রথামতো সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের একটি কবিতার সঙ্গেও 'মেঘদূতে'র একটি অংশের তুলনা করেছেন বুদ্ধদেব। যক্ষ তার প্রিয়ার তুলনা অন্য কোনো বস্তুতে খুঁজে পায় না, তাই গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। সুধীন্দ্রনাথের নায়ক প্রিয়তমার প্রেমে সন্দিগ্ধ হয়। বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথের নায়কের দুঃখকেই তুলনায় গভীরতম মনে করেন। দুই নায়কই বিরহী। দুটিই বিরহের কবিতা। তবু, এই যে বিরহের প্রকৃতি আলাদা হয়ে গেলো, মাত্রারও পার্থক্য ঘটে গেলো, এর কারণ হিসেবে তিনি কবিত্ব শক্তির তারতম্যের কথা বলেন নি, বলেছেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক জগতে চলে আসার কথা। এজন্যই

রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' থেকে বিষয় আহরণ করে যে 'স্বপ্ন' কবিতা লিখেছিলেন, কালিদাস তা কখনো বলতে পারতেন না - এমনই মনে করেন বুদ্ধদেব বসু। আসলে, বুদ্ধদেব আর রবীন্দ্রনাথের বিরহ চেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাছাড়া, ক্লাসিক কবির কাল আর আধুনিক কবির একালের জীবন বোধের পার্থক্যও লক্ষনীয়। যে কালে কালিদাস 'মেঘদূত' লিখেছিলেন সেদিনকার কালধর্ম ও কাব্যরূপকে অবলম্বন করে তিনি তার মধ্যেও সঞ্চার করতে পেরেছেন বিরহের এমন এক অনুভূতি যা কেবল বস্তু বর্ননার মধ্যেই যে আবদ্ধ থাকে এমন বলা যায় না। বরং তাঁর কবিতার স্তবক বিন্যাসের স্থির চিত্রের ভেতরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এমন এক হৃদয় সঞ্চারী আনন্দবোধ যাকে এই কাব্যের বিশেষ ধর্ম বলা যায়। তবে, কোথাও কোথাও প্রায় একই প্রসঙ্গ 'মেঘদূত' যা আছে তাই উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ —

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্তে রাখি
নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি,
হে বন্ধু আছ তো ভালো ?[৬০]

'মেঘদূতে'র উত্তরমেঘও আছে —

তোমার সহচর যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে
অবলা, তোমাকে সে কুশল জিজ্ঞাসে ... ।[৬১]

বুদ্ধদেব মনে করেন, 'মেঘদূতে'র যক্ষের প্রশ্ন একজন নীতিজ্ঞ জড়বাদীর। তার প্রিয়া যে মরে যায়নি, শারীরিক কুশলে আছে, শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছে সে। আর, রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নে ধ্বনিত হচ্ছে এক জন্ম জন্মান্তরের বেদনা, যা হৃদয়ের মধ্যে অনবরত উত্থিত হয় কিন্তু কোথাও যার উত্তর নেই। এই 'না বলা বানীর ঘন যামিনী'র মধ্যে এটি একটি সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে বিরহের গান। প্রেমের এই ভাষা, এই উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথে এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। আসলে, রবীন্দ্রনাথ এতে যেভাবে বিরহ খোঁজেন, আমরাও সেভাবেই কাজকে বুঝি। হয়তো 'মেঘদূত' সে অর্থে বিরহের কাব্য নয়, প্রেমের কাব্য। যে অর্থে আধুনিক রোমান্টিকতার প্রতি তুলনায় 'মেঘদূতে'র প্রেম ও বিরহকে বিচার করা হয়েছে তারও বিবেচনা জরুরী। 'স্বপ্ন' কবিতায় এই যে নায়কের ভাষা হারিয়ে গেলো, নায়িকাও কোনো উত্তর দিতে পারল না, তাদের এই অকথিত বাণীর সীমাহীনতা স্পর্শ করেছে কবিতাটিকে। শেষ পর্যন্ত এক নিঃসীম শূণ্যতার মধ্যেই কবিতাটি মিলিয়ে যায়। রজনীর গাঢ়তার অন্ধকারের মধ্যে অনাদি ও অনন্ত বিরহের ছায়া ঘনীভূত হয়েছে। রজনী প্রভাত হলে এই স্বপ্ন থাকবেনা, স্বপ্ন শেষে প্রিয়তমাও হবে অন্তর্হিত। ফলে, এই তৃষ্ণা এমন, যা কোনোদিন মিটবেনা, এই প্রিয়া এমন যে স্পর্শমাত্রে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। নায়িকা এবং প্রেমের এই অধরা মাধুরী রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিকে একটি ভিন্নমাত্রায় ঋদ্ধ করেছে। হতে পারে, এ বিরহ বাস্তবের নয়, এ বিরহ স্বপ্নের ও বিস্মরণের। প্রিয়তমাও শুধু স্বপ্নের নায়িকা। কিন্তু, যে অপার তৃষ্ণায় মাথিত হয়েছে নায়ক, ট্যান্টেলাসের অতৃপ্ত পিপাসার মতো সে তৃষ্ণা

সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সকল কালের, সকল প্রেমিকের আকণ্ঠ পিপাসাকে যেন নাড়া দেয় গভীর করে। স্বপ্ন হলেও প্রেম-বিরহের এই ক্ষর্ণপ্রভা মিলিয়ে যায় না একেবারে। তুলনায় যক্ষের প্রেমকে বুদ্ধদেব 'শৃঙ্গারবাসনায় সীমাবদ্ধ'[৬২] বলেছেন। তার প্রেমিক বা বিরহীরূপ আধুনিক দৃষ্টিতে মেনে নেওয়া যায় না। তাকে 'লিবিডোভারাতুর', 'কামাতুর'[৬৩] জীব বলেছেন তিনি। সুদীর্ঘ আট মাসব্যাপী সম্ভোগের অভাবে তার যে অবস্থা হয়েছে, সর্ববস্তুই তার মনে যেভাবে যৌন চিত্রকল্প জাগিয়ে তুলেছে, যেভাবে তার কাম যথাযথ পাত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে, নিসর্গে ছড়িয়ে পড়লো, বুদ্ধদেব তার নাম দিয়েছেন, 'নিখিল কামুকত্ব'।[৬৪] এই যে কাম বা প্রাম পাত্রান্তরিত হয়ে নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো, "মদন ভস্মের পর" কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথে একই বিষয়বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেলো। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বায়বীয় নির্যাসে' পরিণত করেছেন, কালিদাসে আমরা পাই তার 'রক্তমাংসনির্ভর আকার ও আকৃতি'[৬৫] এখানে কালিদাসের এবং তার কালের ধর্মই যেন ফুটে ওঠে। কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই যক্ষের কামনায় অনুরঞ্জিত পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের ভূ-দৃশ্য ও নিসর্গের চিত্ররূপ স্বাভাবিক হয়েছে। মেঘকে দূত করে যে পথে যক্ষ বার্তাপ্রেরণ করেছে সে পথের যাবতীয় নিসর্গ চিত্র-ই রময়ীয়। কিন্তু বারংবার রতি প্রসঙ্গের উল্লেখেও সেগুলি ক্লান্তিকর হয়নি। বুদ্ধদেব এখানে কালিদাসের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র কাম ও যৌনতাকে অবলম্বন করে কালিদাস অসামান্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন। যক্ষের কামপিপাসাকে তিনি এমন পরিশীলিত, বহুমুখী ঔ দ্যুতিময় করে তুলেছেন যে, শুধু তাকে অবলম্বন করে একটি সম্পূর্ন কাব্য রচনা সম্ভব হলো। এই অপরিসর বিষয়বস্তুর মধ্যে কালিদাস যেভাবে বৈচিত্র্য ও সরসতা সঞ্চার করেছেন, পাঠকের সম্পূর্ন মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা হয় না। 'মেঘদূত' পাঠের মাধ্যমে 'মেঘদূতে'র সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, তত বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। কাব্য পাঠের এই আনন্দ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। তাছাড়া, কাম এখানে রোমান্টিক বেদনায় রূপান্তরিত না হলেও বিশ্বের পটভূমিকায় বিন্যস্ত হয়েছে। কামের এই বিশ্বরূপ অন্য কোনো কাব্য আমাদের দেখাতে পারেনি।

তাছাড়া, 'মেঘদূত' কাব্যে সত্যিকারের বিরহ না থাকলেও উত্তরমেঘের শেষ অংশে কাব্যটি ধীরে ধীরে মর্মস্পর্শী হয়েছে। বলাবাহুল্য, আধুনিক কাব্যবোধে মর্মস্পর্শিতার ধারনা প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে কাব্যশৈলীর মহিমা ছিলো অত্যন্ত বাঞ্ছিত। যক্ষের বিলাপের মধ্যে বুদ্ধদেব দেখেছেন একটি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ। হতে পারে সে অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়দমনের ক্লেশজনিত, কিন্তু, কালিদাস একে দুঃখের মর্যাদা দিতে পেরেছেন। 'মেঘদূত' বিরহের কাব্য কি-না, 'মেঘদূত' এর নায়ক যক্ষ সত্যিকারের বিরহী কি-না, যাবতীয় প্রশ্ন যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। স্বপ্নে-স্বপ্নে মেঘকে দূত করে যে বার্তা যক্ষ পাঠাতে চেয়েছে, তা একটি কল্পিত অভিযান হলেও হৃদয়-ছোঁয়া। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে বাস্তব সত্যের পার্থক্য থাকলেও সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে পাঠকের হৃদয়কে উন্মুখ করে তোলে 'মেঘদূত'। 'মেঘদূতে'র বর্ণনা সবই স্বভাবসিদ্ধ-স্বাভাবিক, শুধু একটি মাত্র কল্পনা স্বভাব-বিরোধী। মেঘকে সচেতন জীব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া, আপাত-অসম্ভব, অকল্পনীয় বস্তু মহাকবি তাঁর কাব্যে সম্ভবপর করে তোলেননি। মেঘকে

দূতরূপে বার্তাপ্রেরণ স্বপ্নেই সম্ভব। তবে কালিদাস স্বপ্নের হাতেও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেন নি। কেবল স্বপ্নের কথাই বলেন নি, যুক্তি দিয়ে সচেতনভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন এই স্বপ্নের কারণ। স্বপ্নচারী কল্পনার যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ রোমান্টিকতার পরিপন্থী। কালিদাস অস্বীকার করেছেন রোমান্টিক সাহিত্যের বিশ্ববিস্তৃত ধারাটিকে। বাল্মীকি বা দান্তে রোমান্টিক কবি হলেও তাঁদের মধ্যে রোমান্টিকতার লক্ষণ কোনো না কোনোভাবে এসে পড়েছে। কিন্তু, কালিদাস এর বাইরে থেকে গেলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ গন্ডী অতিক্রম করলেন না তিনি। প্রসঙ্গতঃ বুদ্ধদেব কোলরিজের 'কুবলাখান' কবিতাটির কথা বলেছেন। সেখানে, স্বভাব-সাযুজ্য নেই'এ মন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সেইসব অসম্ভব সমাবেশ রচনার জন্য তাঁর কোনো জবাবদিহি নেই। কালিদাসের কাব্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষাও এসেছে বাস্তব যুক্তি সম্ভাব্যতার পথ ধরে। স্বকীয়তার চেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে কবিপ্রসিদ্ধিগুলি। কবি প্রসিদ্ধির প্রশ্ন এলে পূর্বসূরীদের ঋণের কথা বলতে হয়। প্রশ্ন দাঁড়ায় কালিদাসের কাব্যে বাল্মীকির ঋণ ঋণাত্মক মাত্র, নাকি স্বকীয় সৃজন মূল্যে সমৃদ্ধ? আর কবি প্রসিদ্ধি বলতে এত বছর ধরে আমরা যে উপমাগুলিকে বুঝি সেগুলিতো কালিদাসের হাত থেকে উত্তরকালের ব্যবহার জীর্ণ করে তুলেছে। কালিদাসের কোনো উপমায় এমন কিছুই নেই, যা প্রথাসিদ্ধ নয়, আক্ষরিক নয়, অলংকারধর্মী নয়। বুদ্ধদেব অবশ্য একথা বলেননি যে, কালিদাসের উপমাগুলি সবই পূর্বসূরীদের ভান্ডার থেকে আহরণ করা। তবে পাদটীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন —

> ''অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ক্রয়ী' গ্রন্থে ও অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাল্মীকি ও কালিদাস' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৬) দেখিয়েছেন, উপমাদি বিষয়ে বাল্মীকির কাছে কালিদাসের ঋণ অগণ্য।''[৬৬]

'মেঘদূতে'র চিত্রধর্মী উপমাগুলিও কোনো অপ্রত্যাশিতের চমক সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি কালিদাসের উপমাগুলিকে দান্তের উপমার সঙ্গে তুলনা করে বলেন - দুইয়েরই উদ্দেশ্য দৃশ্যগুলিকে মনের সামনে সুনির্দিষ্ট করে তোলা, স্পষ্ট করে দেখানো। কিন্তু, দান্তের উপমার উদ্দেশ্য শুধু দৃশ্যরূপ বা ছবি ফোঁটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এর বাইরে এক অন্তর্নিহিত প্রাণধর্মে তা সুন্দর হয়ে ওঠে। আপাত বিসদৃশ বস্তুগুলিকে সূত্রবদ্ধ করে দান্তে বহুযুগ আগেই যুগান্তর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু, কালিদাসে তা নেই । তাঁর কাব্যে ঘুরে ফিরে আসে 'বিরহিনী ও শীর্ণ চাঁদ', 'দুঃখিনী ও মেঘলা দিনের পদ্ম'। নারীদেহের বর্ননায়ও পরিচিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছের বাইরে যাননা তিনি। অথচ, নারীদেহের মতো ব্যবহৃত পরিচিত প্রসঙ্গেও যে কল্পনাকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায় এর প্রমাণ বুদ্ধদেব খুঁজে পান জীবনানন্দের কবিতায়। আপাত-অসংগত, বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে যে ভাবগত ও প্রকৃতিগত সাযুজ্য খুঁজে নেওয়া হয় জীবনানন্দের কবিতায়, কিংবা পাঠকও ক্ষণে-ক্ষণে আবিষ্কার করে নেন - সেই আবিষ্কার ও অন্বেষণের আনন্দ কালিদাসে কোথায়? এই প্রশ্ন তুলেছেন বুদ্ধদেব। জীবনানন্দের 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিঃস্তব্ধতা এসে যেভাবে জানালায় উঁকি মেরে কবিতার নায়ককে মৃত্যুর পরামর্শ দিয়ে

যায়, তা কালিদাসের রচনায় কল্পনাতীত। বস্তুর সঙ্গে ভাবনার, পরিচিতের সঙ্গে দূরবর্তীর, মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের তিনি তুলনা করেননা, যেসব বস্তুর কোনো-না-কোনো স্বাভাবিক লক্ষণগুলো পরস্পরের অনুরূপ, শুধু তাদেরই একসূত্রে বাঁধেন। কেমন করে কবির চিত্তে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমান্তরেখা ভেঙে যায়, সব বিপরীত অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে, কবি জয় করে আনেন অজানা এক অন্য ভুবন — এই সব আছে বোদলেয়ারের কবিতায়। এই জয়ের আনন্দ আছে আধুনিক বাংলা কবিতায়। জীবনানন্দ সেখানে পথিকৃৎ হয়ে আছেন। বুদ্ধদেব মনে করেন, কালিদাসে সে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথাবদ্ধতার বাইরে যাননি তিনি।

কবি হিসেবে কালিদাস তাই ক্লাসিক সাহিত্যের পূর্ণ প্রতিনিধি। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যেমন হোমার অপেক্ষা ভার্জিলকেই ক্লাসিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যে এই স্থান কালিদাসের। ক্লাসিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণকে এলিয়ট বলেছেন 'maturity',

> maturity of mind, maturity of manners,
> maturity of language [৬৮]

কালিদাসের কাব্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি যেন নিজেই ক্রমশঃ এই পরিপূর্ণতার দিকে যাচ্ছেন। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রাঞ্জল হলেও দুর্বোধ। কেননা, তাঁর এমন অনেক পংক্তি পাওয়া যায় যেগুলির অর্থ সারাজীবন ধরে খুঁজলেও যে অবধি নেই। প্রসঙ্গতঃ তিনি শেক্সপীয়রের 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকে মরনোন্মুখ নায়িকার কিছু সংলাপ তুলে ধরেন। যে সংলাপ পাঠককে বিস্মিত করে, যেগুলির রহস্য পাঠককে খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু, কালিদাসের কবিতা দুরূহ হতে পারে, দুর্বোধ নয়। শেক্সপীয়র বা অন্যান্য রোমান্টিক কবির কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা যে ব্যাখ্যা দেন, তাতে কবিতা অনেকটা বোঝা গেলেও শেষ পর্যন্ত কিছু বাকি থেকে যায়। 'মেঘদূতে' কিছুই বাইরে পড়ে থাকে না। 'মেঘদূতে'র একেকটি শ্লোকের একাধিক অর্থ থাকলেও, তার প্রতিটি অর্থ-ই সুনির্ণেয়, তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা বহু অস্পষ্ট সম্ভাবনার সূত্রে আমাদের মনকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত করে তুলবে। এসব সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করলেও বুদ্ধদেব অবশ্য মনে করেন, গোটা সংস্কৃত সাহিত্যে 'মেঘদূত' এরকম একটি কাব্য, যা বার-বার পড়া যায়, যার প্রতি অফুরন্ত উৎসাহ দেখানো যায়, যার অনেক অংশ স্মৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মনে হয়, শব্দ ও অর্থের সুনিশ্চিত আত্মতার বাইরে মেঘের চলমানতা, বিরহী যক্ষের প্রিয়া সম্মিলনেচ্ছা এবং বিভিন্ন বস্তুতে সেই কামীর মনোভাবভূত কামনা প্রকাশক রূপচিত্র - এসবই কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অনুষঙ্গে মনকে দূরান্তরে নিয়ে যায়। এতে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ নেই, অজানাকে জানার শিহরণ নেই। তথাপি পাঠের পুনরাবৃত্তিতে 'মেঘদূত' ক্লান্তিকর মনে হয় না। এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটিই 'মেঘদূতে'র উদ্বৃত্ত অংশ। যার জন্য নিত্য নতুন হয়ে ওঠে মেঘদূত। এই উদ্বৃত্ততা রোমান্টিকতার লক্ষণ। উদ্বৃত্ত তত্ত্ব - surplus theory হয়তো তিনি নিয়েছেন পশ্চিমের কাছ থেকে। মেঘদূতের উদ্বৃত্ত অংশ মূলতঃ দুটি সূত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রথমতঃ মেঘদূতের ছন্দ, ধ্বনি, যার আবেদন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুতন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছে যায়,

দ্বিতীয়ত ঃ মেঘদূতের গতিধর্ম, যা রোমান্টিকতারও গোত্রচিহ্ন। এই দুটি গুণ-ই কাব্যটিকে চিরনতুন করে রেখেছে। কালিদাস অন্য কোথাও মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহার করেন নি, অন্য কোনো সংস্কৃত কাব্যই শুধুমাত্র ধ্বনির মাধ্যমে এরকম আবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। শুধুমাত্র ধ্বনিই নয়, মন্দাক্রান্তা ছন্দের ঢেউ এর পর ঢেউ যখন কান ও মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, তখন ধ্বনিকল্লোল, ছন্দকল্লোল মিলেমিশে মায়ামন্ত্রের মতো কাজ করে। যে মন্ত্র কানের ভিতর দিয়ে মর্মে স্পর্শ করে। পাঠক আকুল হয়। মেঘদূতের একেকটি পংক্তি সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের বক্তব্য -এযেন সেই পংক্তি, যা আমাদের দেহকে রোমাঞ্চিত করেই চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে পারে, যার কোনো আধেয় বস্তুর প্রয়োজন নেই।

'মেঘদূত' সমালোচনায় পূর্ববর্তীদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের চিন্তার পার্থক্য
এবং তাঁর স্বাতন্ত্র্যের কারণ হিসেবে তিনটি বিষয়কে তুলে আনা যায় —

(১) রবীন্দ্র চেতনার বিরহ বলয়ের বাইরে গিয়ে ভাবনার স্বাতন্ত্র্য —

বুদ্ধদেবের কালে যখন সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন 'অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ / অসংগত চির প্রেম' সে কাল ইউরোপ থেকেও শিখেছে তাৎক্ষণিকের মূল্য। সেখানে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন বিরহের তত্ত্ব কার্যত অনাদৃতই হয়ে পড়েছে।

(২) রোমান্টিক কবির মনের নিরিখে না দেখে, বস্তুকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার প্রবণতা —

বুদ্ধদেব যেখানে দেহচেতনাকে গুরুত্ব দেন মনে করেন সূর্য সম্ভোগের প্রদীপ সেখানে তাঁর মনোধর্মের মধ্যে অধরা রহস্যময়তার প্রতি আগ্রহ সত্ত্বেও বাস্তব পৃথিবীর চেতনাই বড় হয়। সুতরাং সাহিত্যের বস্তুময় রূপকে তিনি ছেড়ে যেতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বস্তুকে অবলম্বন করে নিজের মনের ধর্মে যে বিরহবোধের বিস্তার ঘটিয়েছেন তা সাহিত্যের বিষয়ে নেই। বুদ্ধদেব একালের বস্তুচেতনার বাইরে যেখানে যান সেখানেও তাঁর এই অপরূপী অলৌকিক ভুবন নির্মিত হয়না।

(৩) যুগজীবনের ধর্মে, কবির মনোধর্মে এবং নতুন কাব্যবোধের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য —

আধুনিক কবিদের কব্য চেতনায় রোমান্টিকদের সুদূরাভিসার নেই, যা আছে তাতে শব্দের ভিতর থেকে রহস্যময়তার রোমাঞ্চ সন্ধান। এজন্য জীবনানন্দ, বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপীয়রের সেই শ্রেনীর কাব্যাংশ উদাহরণ হিসেবে ফিরে আসে। কালিদাস যে যুগে যে যুগমানসকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন তার মধ্যে এই সম্ভাবনা ছিলোনা। কাব্য সম্বন্ধে ভিন্ন বোধ থেকে রচনার নির্মান শিল্পের দ্বারা রসোদ্রেকের কাজ তাঁরা করেছেন। এজন্য কালিদাস যেখানে বিবিধ বস্তুজগতের উপমায় কামীর মনোভাবের রূপ নিরীক্ষণ করেন সেখানেই তার শিল্পরচনার সার্থকতা স্বীকৃত হয়। বলার ভিতরে না বলা বানীর রহস্য সন্ধান কালিদাসের কবিপ্রতিভার ধর্ম নয় - তার সন্ধান সার্থক হতে পারে না।

বুদ্ধদেবের এই তুলনায় দুই যুগের কাব্য ধর্মের তুলনা এসেছে। তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রায় সারা বিশ্বের কাব্য মানচিত্রে কালিদাসের স্থান নির্নয় করেছেন এবং দ্বিতীয়ত ঃ, আমাদের কালের জীবনধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও নির্দেশ করেছেন।

। গ ।

'রামায়ণ' প্রবন্ধ (১৯৪৭) এবং 'মেঘদূত' অনুবাদ কাব্যের ভূমিকা হিসেবে 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' (১৯৫৭) প্রবন্ধ রচনার সতেরো বছর পরে 'মহাভারতের কথা' প্রকাশিত হ'ল। এই সতেরো বছরের মধ্যে মহাভারতচর্চা তাঁকে খুব বেশী করে প্রভাবিত করেছে। তাঁরে অনেকগুলি কাব্যনাট্য লেখা হয়েছে এই মহাভারত থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে। 'মহাভারত' চর্চা শুরু ১৯৬৩-৬৪ সালে, যখন তিনি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দোইউরোপীয় এপিক পড়াতে গিয়েছিলেন। আর তাঁর আন্তর্জাতিক ছাত্রদের প্রশ্নে উদ্বেজিত হয়েছিল 'মহাভারত' চিন্তা প্রসঙ্গ। তাঁকে ভাবতে হল মহাভারতের বিভিন্ন উপকরণের তাৎপর্য।

> 'মহাভারত'কে তিনি কোনো নান্দনিক সূত্রে বিচার্য'[৬৯]

মনে করেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক বা বহুকথিত বৈজ্ঞানিকনয়, বরং 'মহাভারতে'র মধ্যে তিনি একটি অখণ্ড মিথ চর্চার উপাদান উপকরণ খোঁজেন - সামগ্রিক দৃষ্টিতে মহাভারতকে দেখতে চান।

> এই পঞ্চম বেদটির স্বরূপ ঠিক বুঝতে হ'লে একে খণ্ডিত ভাবে
> দেখা চলবে না।[৭০]

বাংলায় মহাভারতচর্চা নতুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসু তাঁদের 'মহাভারত' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় আংশিক ভাবে 'মহাভারতে'র সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) 'মহাভারত' সমালোচনার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার মূল লক্ষ্য কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিপাদন করা। বঙ্কিমচন্দ্রে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় অনুশীলন তত্ত্বের সারবত্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুশিলন তত্ত্ব যে অবান্তর তত্ত্বমাত্র নয়, জীবনে তাঁর প্রকটন সম্ভব, বঙ্কিম এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অবলম্বন করে তা দেখালেন। বঙ্কিমের আগে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা কালচার তত্ত্বকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপাদন করেছিলেন। স্পেন্সর এবং ম্যাথুআর্নল্ড এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বঙ্কিম সেই কালচার তত্ত্বকে ভারতীয় হিন্দুধর্মের দিক থেকে দেখেছেন। বঙ্কিমের আগে অনেক অনুশীলনতত্ত্ব বেত্তা (সীলি, রানা) যীশুকে আদর্শ মানব বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রিস ডেভিসের মতো পণ্ডিতেরা বুদ্ধকেই বলেছিলেন আদর্শ মানব। কিন্তু, বঙ্কিমের মতে, সংসারত্যাগী যীশু বা বুদ্ধ কখনোই আদর্শ মানব হতে পারেন না। কেননা সন্ন্যাস মোটেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়। বঙ্কিম যে প্রত্যক্ষবাদ মানেন তাতে জীবনই সত্য - তাঁর আস্থা humanism -এ, মানবতাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে মানবতা জীবনের বৃত্তি সমূহের সম্যক অনুশীলন, এজন্য বঙ্কিম কৃষ্ণকে আদর্শ অনুশীলিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এতে যেমন কৃষ্ণের ভগবত্তা অস্বীকৃত হয়েছে, তেমনই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আর, এই অনুশীলিত চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণের চরিত্র ব্যাখ্যান দ্বারা তিনি তত্ত্বব্যাখ্যাই করেছেন মাত্র।

এখানে বঙ্কিম একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়েছেন। সে দৃষ্টিকোণ তৎকালীন দর্শনের একটি নবীন ঈক্ষণভঙ্গি। উনিশ শতকের মানবতাবাদ তাতে সন্নিবেশিত। আর তার সঙ্গে অণ্বিত হয়ে

আছে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাচীন সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতি। বঙ্কিমের দৃষ্টি সেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমের এই যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা পদ্ধতির প্রভূত প্রশংসা করে লিখেছিলেন বঙ্কিম শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করে বুদ্ধিবৃত্তিকে গৌরবের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে দিয়েছেন।[৭১] 'কৃষ্ণচরিত্রে'র বাইরে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র একটি রচনা 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'মহাভারতে' আছে সম্পদ ভোগের জন্য আত্মবিরোধের ইতিবৃত্ত। এপ্রসঙ্গ বঙ্কিম বিশেষ করে ব্যাখ্যা করবার সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' চর্চা এদেশের এবং বিদেশের কবি পণ্ডিতদের বার বার আকর্ষণ করেছে। বহু বিদেশী কবি বিদ্বান এই কাব্যগুলির প্রতি আগ্রহ অনুভব করেছেন। 'রামায়ণে'র গভীর অনুভূতি উদ্দীপক রচনাবৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই মনে করেছেন। বঙ্কিম মহাভারতচর্চা করেন উনিশ শতকের পশ্চিম প্রত্যাগত উপযোগিতাবাদ এবং মানব বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে। বঙ্কিমের চর্চা ছিল পশ্চিমী চর্চাকারদের অনুসারী। মানবমুখী দৃষ্টির যুক্তিপরম্পরা তিনি সাজিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একে ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলেন, দেখালেন ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু তাঁর ভাবনা বঙ্কিমের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র মধ্যে কাহিনী উপকরণের তুলনা করলেন।

বঙ্কিম বিশ্লষণধর্মী, রবীন্দ্রনাথ সংশ্লেষণধর্মী। রবীন্দ্রনাথ 'মহাভারত'কে একটি ঐক্যবোধের দিক থেকে দেখেছেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণকে অবলম্বন করে একটি ঐক্য চিন্তার কথা ভেবেছেন। এই চিন্তার পিছনে বঙ্কিমের প্রবন্ধের উদ্দীপনা থাকা সম্ভব। 'মহাভারতে'র কাহিনী কল্পনার পিছনে একটা সামাজিক রূপক সন্ধান করেছেন তিনি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার মধ্যে 'মহাভারতের কথা' একেবারে ভিন্নধর্মী রচনা। মেঘদূত' বা 'রামায়ণ' প্রবন্ধের মতো এ একেবারেই নয়। কোনো সাময়িক উত্তেজনার চেয়ে বরং এর মধ্যে আছে দীর্ঘদিনের ভাবনার উত্তাপ, যা একটি অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে বাইরে বেরিয়ে আসার অবকাশ পেলো। বুদ্ধদেব বসুর এ রচনা একটিমাত্র ক্ষুদ্র নিবন্ধে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর বিষয় বিস্তৃত, এর আলোচ্য বিষয় পৃথিবীর বিস্তৃততম সাহিত্য কিংবা ইতিহাস, এবং এর চর্চার প্রকৃতি প্রকরণ এমনই যে তা কেবলই 'মহাভারত'চর্চা থেকে তুলনামূলক মহাকাব্যচর্চার জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর, সেই তুলনাত্মক চর্চাকে তিনি সুবিন্যস্ত ও সংবদ্ধ করে সাজিয়ে তুলেছেন আধুনিক মিথ চর্চার প্রকরণে। তিনি পাশ্চাত্ত্য মিথসাহিত্য পরিভ্রমন করে 'মহাভারতে'র পক্ষে ব্যবহার্য যে সব তথ্য সূত্র পেয়েছেন, তাকে চিন্তাসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তাঁর নিজস্ব গভীর অধ্যয়ণ এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। মার্কিন দেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে, পাশ্চাত্ত্যের মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভারতীয় মহাকাব্যকে। প্রসঙ্গতঃ ভারত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের জীবনদর্শন, এবং পাশ্চাত্ত্যের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জীবনবোধগত গভীর পার্থক্য।

ফলে, পার্থক্য ঘটেছে মহাকাব্য চিন্তায়ও। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপাত্তির জন্য-ই তাঁর 'মহাভারতের কথা' এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন -

> ফলে 'মহাভারতে'র বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্র তাৎপর্যে সমৃদ্ধ ও
> নতুন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ... 'মহাভারত'কে বিশ্ব
> ভূমিকায় স্থাপন করে তার স্বরূপ নিরূপণের এই প্রচেষ্টা গ্রন্থখানিকে
> একটি 'বিস্ময়কর' অপূর্বতায় মণ্ডিত করেছে। শুধু তাই নয় তিনি
> ভারতবর্ষের-ই অপর মহাগ্রন্থ 'রামায়ণে'র পটভূমিকায় স্থাপন করেও
> মহাভারতের বিশিষ্টতাকে নূতন করে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭২]

'মহাভারত' সমালোচনায়, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ সাহিত্যিক, তিনি নিজেই বলেছেন—

> আমার আলোচনার ধারা সাহিত্যিক, ... বলা যাক্,
> কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজির উপর নির্ভরশীল।[৭৩]

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে 'মিথপুরাণ সন্ধানী' কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলোই। আধুনিকতার একটি লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছিলো এই মিথ পুরাণের ব্যবহার।

> আধুনিক কবি বা শিল্পী তাঁর আদর্শ বা স্বপ্নকামনা কিম্বা
> অচরিতার্থ বাসনার প্রকাশ দেখেন জগতের প্রাচীন মিথ্-
> পুরাণের কাহিণী গুলিতে।[৭৪]

বুদ্ধদেবের অনেক কবিতায়, কাব্য-নাট্যে মিথের ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর 'মহাভারত'চর্চাতেও প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য মিথ, মিথিক কাহিনী সম্ভারের আবিস্কার লক্ষণীয় হয়েছে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য মিথ পুরাণের উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর 'মহাভারত' সম্বন্ধীয় ধারনা ব্যক্ত করেছেন।

> পশ্চিম দেশীয় প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্য, নানা দেশের ও
> নানা যুগের কল্পনাচিত্র যারা পরস্পরের দর্পনের কাজ করে[৭৫]

- এই সব কিছু সংসর্গে স্থাপন করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে,

> 'মহাভারত' কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়,
> আবহমান মানব জীবনের মধ্যে প্রবহমান।[৭৬]

তিনি 'মহাভারত'কে দেখেছেন একটি অখন্ড সাহিত্য হিসেবে, - বিরাট স্ফীতকায় ভারত সংহিতার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন কতিপয় গ্রন্থিসূত্র। সমগ্র 'মহাভারত'কে তাঁর মনে হয়েছে, একটি অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত সমগ্র কাব্য, 'Organic whole', আর, এই ঐক্য সাধনের অবলম্বন হিসেবে আছে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। সেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বা নায়ক বীরবাহু, পরাক্রমী কোনো বীর নয়, মহামহিমাময় সর্বক্ষমতার অধিকারী 'লোকোত্তর বাসুদেব' নন, তিনি এক সাধারণ, মিত বুদ্ধি, শান্ত, সংযত, নিষ্ঠাবান, সর্বোতোভাবে মানবিক গুণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির। তাঁর ক্রমবিকশিত ব্যক্তিত্ব-ই উদ্ঘাটিত হয়েছে 'মহাভারতের কথা'র বিভিন্ন খণ্ডিত পর্বগুলিতে। সেই টানেই এসেছে প্রাচীন প্রাচ্য পুরাণের সঙ্গে

প্রতীচী পুরাণের তুলনা, প্রতিতুলনা। পাশ্চাত্ত্য মিথগুলি উঠে এসেছে সেই সূত্রে, কোনো কাহিনীগত পূর্বাভাস, প্রতিভাসের প্রকল্পনায়। প্রাচ্য 'রামায়ণ' ও অন্যান্য পুরাণ প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে গ্রথিত হয়েছে কখনো। তাঁর 'মহাভারত'চর্চায় তাই তুলনামূলক পুরাণচর্চা একটা উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে। অবশ্য পুরাণের তুলনা, প্রতিতুলনা এসেছে তাঁর সাহিত্যিক ব্যাখ্যার পথ ধরে। সাহিত্যিক ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি কখনো তদ্‌গতভাবে বিশ্লেষণমুখী হয়েছেন, কখনো কোনো প্রসঙ্গের সূত্রমাত্র গ্রহণ করে আত্মতান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রাচীন সাহিত্যের। সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের তুলনা। এর মূল অবশ্য নিহিত ছিলো সমালোচকের ব্যক্তি মানসিকতার মধ্যে, তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য পুরাণচর্চা, গভীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মধ্যে। বিশ্বকাব্য - সমুদ্র মন্থনের প্রতিফলন আছে তাঁর 'মহাভারতের কথা'য়।

অখণ্ড সাহিত্য মহাভারত ঃ

'মহাভারতে'র বিরাট স্ফীতকায় আয়তনের জন্য 'মহাভারত' আদ্যন্ত পাঠ করা কষ্টসাপেক্ষ। রাজশেখর বসুর অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষেপীকরণকে বুদ্ধদেব কখনো পর্যাপ্ত মনে করেন না। তিনি এই অনুবাদ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, তা থেকে যা কিছু বর্জিত হয়েছে তা-ই আমাদের পক্ষেও পরিত্যাজ্য নয়। কারন, সমগ্রটির সঙ্গে পরিচিত না হলে 'মহরাভারতে'র ঐশ্বর্য বিষয়ে আমাদের ধারনা অস্পষ্ট থেকে যায়।

মহাভারতের এই বিশাল অবয়বকে সংক্ষেপীকৃত করে আমরা তাকে হয়ত আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারি। কিন্তু তার বর্জিত আপাত তাৎপর্যহীন অংশের মধ্যেও থেকে যেতে পারে কোনো অনুচ্চারিত ইশারা। এই কারনে প্রাচীন মহাকাব্যের অন্তর্বর্তী পুরাণ বিশ্লেষনে সেগুলির গুরুত্ব থেকে যায়। এই অন্তর্নিহিত সূত্র বুঝতে পারলে তখন আর এই কাব্যের গঠনকে অবিন্যস্ত বলে মনে হবে না। বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যেই সমগ্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। বুদ্ধদেবের 'মহাভারত' চর্চায় মিথ একটি দৃষ্টিকোণ। আর এই মিথের তাৎপর্য বোঝার পক্ষে কোনো অংশের গুরুত্বই উপেক্ষণীয় নয়। এই কারনেও মহাভারতের ভাব সমগ্রতার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধদেবের 'মহাভারত' চর্চার মূলে যে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ তার দিক থেকেও তিনি অখণ্ড মহাভারতের সমগ্রতার পক্ষপাতী। তাই অন্যান্য আলোচকদের বর্জিত অংশের মধ্যেও এই একটি ভাবগত ঐক্য তিনি খুঁজে পান। এই কারণে সৃষ্টিতত্ত্বগত কাহিনীও তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। বুদ্ধদেবের মতে, 'মহাভারতে'র মূল কাহিনী তাঁর প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত - অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে। তিনি তাই 'মহাভারত'কে তুলনা করেছেন এক অন্তহীন অরণ্যের সঙ্গে। এই নিশ্ছিদ্র অরণ্যের মধ্যে দিয়েই এর কাহিনী এগিয়ে যায় এক অমোঘ পরিণামের দিকে। 'মহাভারতে'র কাহিনী এক মণ্ডলাকার সম্পূর্ণতা নিয়ে সমাপ্ত হয়। এই ঐক্যকে তিনি 'মহাভারতে'র পক্ষে সবচেয়ে বড় বিস্ময় বলেছেন। এবং একারনেই এটি শেষপর্যন্ত বহুবিদ্যার সংগ্রহশালা না হয়ে একটি গ্রন্থ হতে পেরেছে।

বুদ্ধদেব 'মহাভারত'কে একটি পরিকল্পিত কাহিনী সজ্জা হিসেবে, আধুনিক পারিভাষিক ধারনায় প্লটের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেছেন। এই দৃষ্টি সমগ্রতার অভিনবত্ব এই যে, যে কোনো রচিত

সাহিত্যকে তা সংশ্লেষণী দৃষ্টি থেকে উপস্থিত করতে চায়। কিন্তু জাত মহাকাব্য সম্পর্কে আবহমান প্রচলিত দৃষ্টিকোণ এই যে, এই সব কাব্য কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি বা সম্পাদনা নয়। বহু স্তর পরম্পরায় এই কাব্য গ্রথিত এবং সংন্যস্ত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সংন্যস্ত কাহিনীগুলির তেমন কোনো ভাবগত ঐক্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিকোণ স্বীকার করলে এই স্তর পরম্পরায় বিন্যাসের ধারণাকেই অস্বীকার করতে হয়।

'মহাভারতে'র এই কাহিনীগত ঐক্যের সূত্রেই বুদ্ধদেব 'গীতা'কেও 'মহাভারতে'র অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁর মতে, 'গীতা' কোনো স্বনির্ভর গ্রন্থ নয়, 'মহাভারতে'র সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। এবং সেই পটভূমিকায় স্থাপন করলে 'গীতা'র মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে এক তীব্র নাটক, বিগত ও পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে যা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এসব কথা অবশ্য ঐতিহাসিকেরা কেউ স্বীকার করেন না। Winternitz উপরন্তু 'ভগবদ্গীতা'র মধ্যে বহু Contradiction দেখেছেন। এরকারন কেউ ভেবেছেন বইটি systematic philosophy নয়। Humboldt বলেন বইটি কোনো দার্শনিকের রচনা নয়, তা এক ঋষির মনোগত প্রেরণার ফল, R. Gorbe অবশ্য 'গীতা'র মধ্যে বহু Interpolation লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি 'গীতা'র মূল অংশটিরও পুণর্নির্মাণ করেছিলেন। Winternitz এর বক্তব্য -

> There can hardly be any doubt that the Bhagabadgita
> did not belong to the origial heroic poem[৭৭]

তবে, 'গীতা'র একটি প্রাচীন রূপ মহাভারতের আদি অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে তাঁর ধারণা।

বুদ্ধদেবের মতে, 'গীতা' 'মহাভারতে'রই অংশ। 'গীতা'র কবিত্ব অপূর্ব। কিন্তু আমরা 'মহাভারতে'র কথায় তাকে কি মূল 'মহাভারতে'র অংশ বলে স্বীকার করবো ? মনে রাখতে হবে, 'গীতা'য় যুধিষ্ঠিরের কোনো ভূমিকা নেই। আর যে জগৎবরেণ্য নাট্যচেতনা সম্পন্ন কবি এই অপূর্ব কাব্য প্রকটন করেছেন তাঁর মনে কি এই ভাবনা ছিল না যে, 'মহাভারতে'র নায়ক অন্ততঃ যুধিষ্ঠির নয়, - তিনি অর্জুন ; যাঁর সামান্য অস্ত্রত্যাগেও এই যুদ্ধজয় ছিল ধারণার অতীত - এই সব প্রশ্নও সংগত মনে হয়। তাছাড়া, যদি স্বীকার করি, 'মহাভারতে'র মূলে আছে একটি মহান পরিকল্পনা তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সেই পরিকল্পনা কার ? নিশ্চয় কোনো প্রজননশীল অথচ ধীমান স্রষ্টা তাঁর একক চিন্তায় গড়ে তুলেছেন সেই মহাকাব্যের ব্যাপ্তিমান বৈভব, যাকে এখন প্রায় এককজীবনে আয়ত্ত করাও মনুষ্য বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। আর, তা স্বীকার করলে নস্যাৎ করতে হয় এতদিনকার সমগ্র 'মহাভারত'চর্চার নিশানা। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বাঙালী বঙ্কিমের 'মহাভারতে'র প্রক্ষেপ বিচার থেকে অধুনাতন পুরাণ 'পণ্ডিতদে'র যাবতীয় গবেষণার সারাৎসার এক লহমায় বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, এঁদের প্রায় সকলেরই চিন্তার ঐক্যসূত্র দেখতে পাওয়া যায় 'মহাভারতে'র বর্তমান আয়তনের ক্ষেত্রে শ্লোকের পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ায়। আর নতুবা স্বীকার করতে হয়, যেমন 'রাজসিংহে'র আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন বিধাতা পুরুষের ভূমিকা, অনকেটা তাঁকেই। তাঁরই অদৃশ্য পরিকল্পনায় স্তরীভবন প্রক্রিয়ায় জমে উঠেছে এই মহাভারতের পাললিক শিলার পার্বত্যপুঞ্জ। কিন্তু একথা কি বুদ্ধদেবও স্বীকার করবেন - এ প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার, অন্য আর একটি

সূত্র ধরে বলা যায় - লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, ক্রমশ যা ক্ষয়িষ্ণু, যা আত্মবলহীন, যার মধ্যে সাহিত্য সৌন্দর্যের নিশানা ছিল না, ক্রমশঃ সেই কাহিনী কবিতাগুলি লোকস্মৃতি থেকে ঝরে গেছে - কালকবলিত হয়ে। লোকশ্রুতিরই স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশঃ এসে জড় হয়েছে বহু কাহিনী যা মূলকাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে কোনো অক্ষীণ বা উদ্দীপনাময় সূত্রে। আর হয়তো এজন্যই সেই আদি Ballad গায়কদের মধ্যে মূল কাহিনী - গ্রহণের কৃতিত্বে ব্যাসদেব নিত্যস্মৃত হয়ে চলেছেন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ঃ

'মহাভারতে' ঐক্যের অবলম্বন হিসেবে বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলেছেন। কৃষ্ণ বা অর্জুন নয়। দুর্বল, উদ্যমহীন, ভীরু যুধিষ্ঠিরই 'মহাভারতে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র। রাজশেখর বসুও তাঁর অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় যুধিষ্ঠিরকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আলোচনা করেছেন। তাঁর চরিত্রে নায়কোচিত অনেক গুণারলীরই অভাব, কিন্তু তিনি ধর্মবীর। তিনি পার্থিব আয়োজন, আড়ম্বব, ধনবাহুল্য এবং রাজীতিক ষড়যন্ত্রে থেকেও মুক্তিপ্রয়াসী। তবে পুরাণ শ্রবণে, জ্ঞান অর্জনে অন্য অনেকের চেয়ে তিনি মনোযোগী। তাঁর শিক্ষা অস্ত্রবিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয়, আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধানে এবং বিশ্বচেতনায়। গোটা বনপর্ব যুধিষ্ঠিরের নীরব শিক্ষালাভের ইতিহাস। বারো বছর ধরে যে শিক্ষা তাঁর লব্ধ হল, এর পরে তা প্রয়োগ করতে হবে অরণ্যের নির্জনতায় নয় - 'রাজসভায়'।

সেরকম ক্রমাগত শিক্ষায় আত্মসচেতন ও প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন কোনো মানুষ, বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সেই আত্মনিবিষ্ট, শিক্ষায় মনোনিবিষ্ট এক নায়ককে দেখেছেন। 'মহাভারত' একমাত্র তাই যুধিষ্ঠিরের কথা তাঁর ক্রমবিকশিত ব্যক্তিত্বের কথা। "বিভিন্ন কোরাস" নামক অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন এক যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন কোরাসের মিলিত সঙ্গীত। একদিকে তিনি শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, অন্যদিকে তিনি, প্রাজ্ঞ। যুধিষ্ঠির যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় জীবনকে মৃত্যু যেখানে উপস্থিত ও স্বীকৃত। তাই, মৃত্যু অনিবার্য জেনেও, আমরা মৃত্যুর কথা ধারণা করিনা — একে তিনি পৃথিবীর আশ্চর্য বলেছেন। আর এভাবেই ক্রমে তিনি পৌঁছে গেছেন একটি উপলব্ধির স্থিরবিন্দুতে। 'অর্জুন ও যুধিষ্ঠির' খণ্ডপর্বে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন অর্জুনের ক্ষাত্রতেজ ও বীর্যবত্তার পাশে যুধিষ্ঠির প্রায় নগন্য। অর্জুনের তুলনায় তাঁর চিত্তের স্থিরতা নেই একেবারে। কিন্তু সেই যুধিষ্ঠির কিরকম অনমনীয়ভাবে যুদ্ধে ইন্ধন যুগিয়েছেন। অন্যায় গদাযুদ্ধে ভীষণভাবে আহত দুর্যোধনকে পান্ডবের হাতে প্রাণ দেবার জন্য আহবান জানাতে তাঁর দ্বিধা হল না। কৃষ্ণের প্ররোচনায় একটি অর্দ্ধসত্য কথাও উচ্চারণ করেছেন। এই পর্যন্ত দেখলে ধর্মপুত্রকে ভন্ডচূড়ামনি কূটনীতিক বলে মনে হয়। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ভেবে দেখতে হবে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে কী করতে চেয়েছেন ব্যাসদেব,
> 'মহাভারতে'র মহান পরিকল্পনা কীভাবে এবং কী পরিমানে যুধিষ্ঠিরের
> উপর নির্ভর করছে।[৭৮]

বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চেয়েছেন যুধিষ্ঠির এই যে তাঁর ধর্মের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এলেন, তার প্রয়োজন ছিলো এবং 'মহাভারতে'র পরিকল্পনা অনেকাংশেই যুধিষ্ঠিরের উপর নির্ভরশীল। তিনি যেমন জীবন—

বিনষ্ট করতে চাননা, হিংসা পরিত্যাগ করতে চান, তেমনই তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়বান। যে মাতা, পত্নী ও ভ্রাতাগণ তাঁরই জন্য পথে-পথে ঘুরছে, তাদের প্রতি তিনি উদাসীন নন। একদিকে যুদ্ধ, ক্ষয়ও হিংসায় অনীহা, অন্যদিকে দায়িত্বের বিরাট গুরুভার - এই দুই সংকটে যুধিষ্ঠির দ্বিধাগ্রস্থ, অনবরত দোলায়মান। তাই তাঁর সংশয় ও অনিশ্চিতিবোধেরও শেষ নেই। শেষপর্যন্ত স্খলন-পতন স্ববিরোধ ও মনস্তাপের মধ্যদিয়েই তাঁর বিবর্তন রেখা স্পষ্ট হয়েছে 'মহাভারতে' —

তাই আমাদের মনের মধ্যে তিনি বড় হয়ে ওঠেন ক্রমশ।[৭৯]

এই বিবর্তনের ধারায় যুধিষ্ঠির এগিয়ে গেছেন 'মহাভারতে' - একটি বিন্দু থেকে ক্রমে জীবনের স্থির প্রত্যয়ে। মাঝে আছে জীবনের নানা ঘটনা - খণ্ডও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু, অর্জুনের মধ্যে সেরকম কিছু নেই। তাঁর প্রথম প্রত্যয়-ই স্থির-অভিজ্ঞতা রূপান্তরহীণ। বুদ্ধদেবের ভাষায় -

এক পরিণতিহীণ চির প্রফুল্ল বালক যেন অর্জুন, ... যাঁর সংকল্প
ও সম্পাদনায় কোনো ব্যবধান নেই।[৮০]

আর, যুধিষ্ঠিরের সংকল্প সুন্দর। কিন্তু সংকল্প রূপায়ণের পথে কত নানা ঘটনা - কত ক্ষয় ব্যক্তিত্বের, কত যে ছেড়ে দিতে হয় নিজেকে, কত যে বিশ্বাস ভেঙে যায়, - টুকরো টুকরো ভগ্ন প্রত্যয় থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের স্থির প্রত্যয়ে পৌছুতে পারেন তিনি। তাঁকে ধর্মপুরুষ, হিসেবে ভাবলে ও মহাপুরুষ হিসেবে সকলের নাগালের বাইরে রেখে দেওয়ার কথা মনে হয় না। রাম মহাপুরুষ অবতার ও মুক্তপুরুষ, কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে, 'মহাভারতে'র যুধিষ্ঠির অবিরত কর্মে জড়িত, মানুষের মতোই পদে পদে তাঁর স্খলন-পতন। সেকারনেই তিনি রামের চেয়েও অনেক বেশী জীবন্ত, মানুষ হিসেবে স্মরণযোগ্য হয়ে আছেন।

এ আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে বুদ্ধদেবের মতো অন্যান্য আলোচকদের যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রতিপাদনের অবকাশ ছিলো না। বুদ্ধদেব যেহেতু পরিকল্পনা প্রবণ, কাহিনী সমগ্রতার ভাবকেন্দ্রে যুধিষ্ঠিরকে নায়ক হিসেবে উপন্যস্ত করতে চান তাই 'মহাভারতের কথা' চর্চার শুরুই হয়েছে বনবাসের শেষ দিন থেকে। যেখানে অর্জুনের বীরত্ব বা ভীমের বাহুবল নয়, যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানবল, তাঁর আত্মশক্তির মহিমা জ্ঞাপনের সুযোগ ছিল। ইংরেজ লেখকদের কারো কারো লেখায় - 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের plot বিন্যাসের মহত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। 'ইলিয়ড' কাব্যের এই plot চিত্রণ অ্যারিষ্টটলেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল। আধুনিক সামলোচকের কেউ কেউ plot বিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অ্যাকিলিসই 'ইলিয়ড' কাব্যের নায়ক। বিগত যুদ্ধক্লান্ত বৎসরগুলির অনুন্মোচিত কাহিনীপট দশম বৎসরের যে ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রথম উন্মোচনের অবকাশ লাভ করতে পারলো, সেখানে অ্যাকিলিসের চিত্তদীর্ণ অপমান এবং ক্ষোভই হয়ে উঠলো মুখ্য, এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই এই অ্যাকিলিসই হলেন বীর নায়ক - কারন হেক্টরের মৃত্যুতে উচ্চারিত হল তাঁরই জয়গাথা। 'ইলিয়ডে'র plot নায়কের জন্ম থেকে মৃত্যুতে সম্পন্ন হয়নি - তা ওডিসির মতো নায়কের বহুবীরত্বপূর্ণ কাহিনীর বিন্যাস নয়, কোনো এক নায়ককেন্দ্রিক বহু উপকাহিনীর মালা নয় —

The plot of the Illiad focouses on one episode in the

hero's life, just as his characterisation focouses on the
element of his psyche and the subeject is the same in both anger.[৮১]

কীভাবে অ্যাকিলিসের মধ্যে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো এবং কীভাবেই বা হেক্টরের মৃত্যুতে তার প্রশমন ঘটলো এরই কাহিনী 'ইলিয়ড'।

অন্যপক্ষে, এরকম কোনো একটি সূত্রে 'মহাভারতে'র কাহিনীকে বিন্যস্ত করা দুস্কর। কারণ 'মহাভারতে'র কাহিনীবৃত্তকে একটি সমগ্রের পরিকল্পিত বিন্যাস বলে স্বীকার করলে আর বনবাসের শেষদিন থেকে তাকে পুণর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। বরং প্রচলিত অর্থে কাহিনী যেমন মহাকাব্যে episode আকার ধারণ করে 'মহাভারত'ও সেই বহু উপকাহিনীতে ভরা। সেখানে পান্ডবদের উত্তর পুরুষদের পাপস্খালনের জন্য কাহিনী গ্রথিত হচ্ছে। পুরুষানুক্রমিক পরিচয়, যুধিষ্ঠিরের বা পান্ডব ও কৌরবদের জন্ম কথা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান বিসম্বাদের কাহিনী-মধ্যবর্তী কাহিনী উপকাহিনী পার হয়ে এবং শোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত হচ্ছে। নায়কের জন্ম মৃত্যু বর্ণনার যে ছক মহাকবিরা ব্যবহার করেন এ কাব্য তা থেকেও মুক্ত নয়। সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে নায়ক হিসাবে উপস্থাপিত করতে চাইলেও সুবিন্যাস্ত plot -এর ধারণা গ্রহণ করা দুস্কর হয়ে পড়ে।

তুলনামূলক পুরাণ চর্চা ঃ

'মেঘনাদবধ'কাব্যের পৌরাণিক উৎস প্রসঙ্গে বন্ধু রাজনারয়ণ বসুকে একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছিলেন —

I love the grand mythology of our ancestors. It is full of
poetry. A fellow with an inventive head can manufacture
the most beautiful things out of it.[৮২]

মেঘনাদবধ কাব্যে গ্রীক প্রভাব প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকে আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন —

It is my ambition to exquisite the graces of Greek mythology
on our own;[৮৩]

প্রতীচ্যও প্রাচ্য পুরাণকাহিনীর উপাদান গ্রহণ করে তিনি অভিনব শিল্পকর্মের স্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণের নবায়ণ লক্ষ্যণীয় হয়েছে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতেও। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' নবরূপা 'মহাভারতে'র মনিপুর রাজকন্যাকে নিজস্ব কল্পনার পটে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য পুরাণচর্চা বিশেষভাবেই জায়গা করে নিয়েছিলো। বুদ্ধদেবের পুরাণচর্চা এই ধারায় উল্লেখযোগ্য।

'মহাভারতের কথা'য় তাঁর পুরাণচর্চার বিশেষত্ব হলো — শুধু নিজের মনোভূমির দর্পনে প্রাচ্য পৌরাণিক প্রসঙ্গের নবীকরণ নয়, কিংবা পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখমাত্রও নয়। 'মহাভারত' সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পুরাণ প্রসঙ্গের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কখনো একটি প্রসঙ্গের মধ্যে পূর্ববতী বা পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস দেখতে পেয়েছেন। 'পূর্বাভাস ও

প্রতিরূপ' নামের খণ্ডিতপর্বে এরকম অনুরূপ, প্রতিরূপ পুরাণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাচ্য-প্যাশ্চাত্ত্য মিথ-পুরাণের তুলনা করেছেন তিনি। 'মহাভারতের কথা'র মুখবন্ধে তিনি নিজেই লিখেছিলেন যে, তাঁর 'মহাভারত'চর্চা 'মিথলজির উপর নির্ভরশীল।'[৮৪] দ্বিতীয়তঃ, তিনি উল্লেখ করেছেন —

> আমার প্রধান আলোচ্য 'মহাভারত' হলেও তুলনা ও প্রতিতুলনার
> ধরনে 'রামায়ণ' ও অন্যান্য পুরাণের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই
> গ্রথিত হয়ে গেছে ...।[৮৫]

ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'রামায়ণ' প্রবন্ধে (১৯৪৭) তিনি 'রামায়ণে'র সঙ্গে 'মহাভারতে'র তুলনা করেছেন। তাঁর মতে -

> 'মহাভারতে' দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের
> প্রতিবিম্বনঃ তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাই যাতে এই ঘোর
> কলিতে আমরা আঁতকে উঠি, ... এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি
> তাতে 'রামায়ণ' সম্ভবত সমৃদ্ধতর।[৮৬]

'মহাভারতের কথা'র মহাভারতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গে 'রামায়ণে'র তিনি তুলনা করেছেন। 'এক বিশ্ববিদ্যালয়' নামক খণ্ডিত পর্বে তিনি উল্লেখ করেছেন, পৌরাণিক পুরুষ

> কৃষ্ণের পরেই যাঁর স্থান - তিনিও ভ্রাতা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে
> চোদ্দ বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন।[৮৭]

বলাইবাহুল্য, এখানে বনপর্বে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের বনবাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে 'রামায়ণে'র রামচন্দ্রের বনবাসকে। অবশ্য এই দুই বনবাসের মধ্যে চাক্ষুষ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের অন্তঃপ্রকৃতি যে ভিন্ন তাও উল্লেখ করেছেন রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনার মাধ্যমে। দুই বনবাসের মূলেই ছিলো সত্য রক্ষা। একজন পিতৃসত্য পালনার্থে, অন্যজন দ্যূতক্রীড়ার সত্য রক্ষার্থে-বনবাসী। রামের বনবাসের কারন রাম নিজে নয়, যুধিষ্ঠিরের বনবাসের কারন নিজের দ্যূতক্রীড়া, স্বদোষ এবং স্বকৃত কর্মেরফলে তাঁর বনবাস। নিজে তিনি অপরাধী, তাই মনে তাঁর সুখ নেই। কিন্তু, রাম সদা প্রসন্ন। ভালো কাজ করে বনে এসেছেন তিনি। রামও যুধিষ্ঠিরের তুলনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আরো জানিয়েছেন যে দুজনেই বহুদুঃখ ভোগী। কিন্তু, যুধিষ্ঠির যা কিছু নন বা হতে পারেননি, রাম সহজাতও সমন্বিতভাবে তা-ই। কর্মিষ্ঠ তিনি, বীর যোদ্ধা, তিনি রাজনীতি বোঝেন, আত্মবিশ্বাসে অটল, সর্বোতো ভাবে লোকনায়ক হবার যোগ্য তিনি।[৮৮] আর যুধিষ্ঠির সম্পর্কে লিখেছেন —

> যুধিষ্ঠির তিনি ? রাজ্য হারিয়ে তেমনি কি তিনি ব্যাকুল,
> যেমন কান্তাবিরহে রামচন্দ্র? না, তা তিনি নন, ...।[৮৯]

'মহাভারত' সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব মহাভারতীয় পুরাণকথাক 'রামায়ণে'র কাহিনীর সঙ্গেও তুলনা করেছেন। 'রামায়ণে'র তুলনায় 'মহাভারতে'ই তিনি গার্হস্থ্য চিত্র বেশী দেখেছেন। 'ঘরে বাইরে' এই খণ্ডপর্বে বুদ্ধদেব 'রামায়ণে'র তুলনায় 'মহাভারত'কেই 'গার্হস্থ্য আশ্রমের কাব্য' বলেছেন। রামায়ণ

আসলে এক মহাপুরুষের জীবনচরিত। এই মহাপুরুষ স্বয়ং রামচন্দ্র। অন্যদিকে, গার্হস্থ্যধর্মের মূর্তবিগ্রহ 'মহাভারতে'র যুধিষ্ঠির। ধর্মপুত্র হয়েও কাম ও অর্থকে তিনি অবজ্ঞা করেন না। তিনি সর্বলক্ষণযুক্ত, গৃহস্থ। তাঁকে দেখা যায় প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বিধবা মাতা ও চার ভাই ও সহধর্মিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের ভরণ পোষন ও রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছে। ধর্মবকের প্রশ্রের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, অঋণী, অপ্রবাসী হয়ে যিনি স্বগৃহে শাকান্ন ভোজন করেন সেই সুখী। যুধিষ্ঠিরের এই উত্তরের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় -গার্হস্থ্যধর্মী যুধিষ্ঠিরকে। গৃহাশ্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো বিবাহিত অবস্থা। যুধিষ্ঠির এই ধর্মেও একনিষ্ঠ। ভীম ও অর্জুন একাধিক ভার্যা পরিবৃত। কিন্তু-এক পত্নীত্ব যুধিষ্ঠিরের সারাজীবন। নিরীহ যুধিষ্ঠিরকেই ভার্যার বিষোদ্গার সহ্য করতে হয়েছে বেশী। মোটকথা, গার্হস্থ্য জীবনের বিষামৃত পান করেছেন তিনিই -

> তাঁর গৃহস্থোচিত কর্তব্য তাঁকে জাগিয়ে রাখে, সর্বদা বেদনা দেয়।[৯০]

সেই বেদনার তীব্রতম প্রকাশ যুদ্ধকালীন ক্রিয়াকর্মে। পরম গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারন হতে হলো তাঁকে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ব্যসদেব যেন আমাদের মর্মে শেল বিঁধিযে বুঝিয়ে দিলেন
> গৃহাশ্রমের দায়িত্ব কী নিদারুণ।[৯১]

টলস্টয় লিখিত 'war and peace' উপন্যাসের প্রধানতম পুরুষ চরিত্র পিয়ের বেজুখহ্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন যুধিষ্ঠিরকে। নেপোলিয়ানের রুশ অভিযান ব্যর্থ হলেও তাঁর সৈন্যদের হাতে বন্দী রুশ সেনাদের মধ্যে পিয়েরও একজন। সদ্য ঘটে যাওয়া যুদ্ধের বীভৎসতায় ক্ষত বিক্ষত পিয়ের। কিন্তু, এর মধ্যদিয়ে সে উপলব্ধি করেছে, জীবনের যা কিছু সারতত্ত্ব, তা আছে জীবনেরই মধ্যে। জীবনের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের উপস্থিতি - জীবনই ঐশ্বরিক চেতনার অন্যনাম। মৃত্যুকীর্ণ জীতনের মধ্যেই আছে মুক্তির স্বাদ। এই পিয়ের নাটাশা রস্তভকে বিয়ে করে বাঁধা পড়লেও গার্হস্থ্যবৃত্তে -

> গৃহ রচনা করলো পিয়ের নাটাশা, কিন্তু শুধু নিজেদের জন্য -
> রবীন্দ্রনাথের অর্থে গৃহাশ্রম সেটিকে বলা যায় না, সমাজের জন্য
> কোনো আশ্রয় নেই সেখানে, ... বিশ্বজীবনের বিপুল অর্কেষ্টার
> ক্ষীণতম মূর্চ্ছনাও সেখানে পৌঁছয় না।[৯২]

গার্হস্থ্যগণ্ডীর এরকম অপরিসর বৃত্তের মধ্যে পিয়ের - নাটাশার জীবন -পরিক্রমা অস্বাভাবিক মনে হয়। মনে হয়, এক বৃহত্তর, মহত্তর জগৎ থেকে টলষ্টয় তাঁদের নির্বাসিত করেছেন। এই অতৃপ্তিবোধ 'war and peace'এর পিয়ের নাটাশার বৃত্তে যেমন থেকে যায়, তেমনই হতে পারতো যুধিষ্ঠির - দ্রৌপদীর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপরবর্তী গার্হস্থ্য সুখচিত্রণে। কিন্তু ব্যাসদেব তা করেননি। তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে এক বৃহত্তর জগতে মুক্ত করে দিলেন, পাঠকের প্রত্যাশা অনুযায়ী। গার্হস্থ্য ধর্মে তীব্র আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, 'অসংখ্য বন্ধনমাপে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ পেতে ক্রমে তিনি উত্তরণের পথে এগিয়েছেন।

হোমারের 'ওডিসি' কাব্যের নায়ক আদিসেয়ুসের সঙ্গেও তুলনা করছেন বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরকে।

তাঁর মতে, আদিসেয়ুস হলেন যুধিষ্ঠিরের বিপরীত মেরুতে। আদিসেয়ুস নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে স্বদেশে ফিরে গার্হস্থ্য সুখে মগ্ন হয়েছিলেন। হোমার তাঁর মধ্যে আর কোনো বেদনার অবকাশ রাখেন নি। কিন্তু গ্রীক কবি নিকোস কাজান্তজাকিস -এর কাব্যে আদিসেয়ুসের উত্তরজীবন ঘটনাবহুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় জীবনে নানা ধ্বংশ, নির্মান, সংগ্রামের অভিজ্ঞতার শেষে দক্ষিণ মেরুপথে যাত্রা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভ করলেন আদিসেয়ুস। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে এই গ্রীক কবির কাব্যের আদিসেয়ুসের মধ্যেই আছে ভারতীয় সাহিত্যের অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মিলিত রূপ। তিনি লিখেছেন —

মনে হয় যেন অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে এক সত্তায় মিলিয়ে দেয়া হ'লো।[৯৩]

ওডিসির নায়ক গার্হস্থ্যজীবনে বদ্ধ হয়েছিলেন, আর গ্রীক কবি কাজান্তজাকিস্-এর নায়ক পশ্চিম সমুদ্রে মহামুক্তির পথে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। গার্হস্থ্য ধর্মে যুধিষ্ঠিরেরও আগ্রহ ছিলো, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, সম্ভোগের পথে যখন শুধু পাণ্ডবেরই অধিকার - তখন কি এক অমোঘ আকর্ষণে মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন যুধিষ্ঠির -

হিমালয়ের ধাপে ধাপে তাঁর উর্দ্ধারোহনের শেষ দৃশ্যটিতে যুধিষ্ঠির
লব্ধ হলেন তাঁর পরিপূর্ণতা - আদিসেয়ুসের ধরনে নয়,
সম্পূর্ণ নিজের ধরনে - তাঁর সমগ্র অতীত জীবনকে এবং
'মহাভারতে'র বিশাল কাহিনীকে যেন অল্প কয়েকটি ধ্যানগম্ভীর
মুহূর্তের মধ্যে সংহত করে নিয়ে।[৯৪]

শুধূ ওডিসির অদিসেয়ুস প্রসঙ্গ নয় 'পূর্বাভাসও প্রতিরূপ' খণ্ডপর্বে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন

প্রতিরূপ আরো পাওয়া যায় - মহাভারতের বাইরে জাতকগ্রন্থে
... দেব ধর্মজাতক কথিকাটিকে মনে হয় 'রামায়ণ',
'মহাভারতে'র সংমিশ্রণে রচিত।[৯৫]

বুদ্ধদেব এখানে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, তিনি 'মহাভারত' প্রসঙ্গে যেসব পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো 'তুলনা ও প্রতিতুলনা' সেইসব পৌরাণিক প্রসঙ্গের উৎস নির্নয় বা কালগত ব্যবধান নিয়ে তিনি ভাবিত ছিলেন না। তাই 'মহাভারতে'র সঙ্গে 'রামায়ণের' যেমন তুলনা করেছেন, তেমনি সেই তুলনার টানে যুক্ত হয়েছে জাতকের কাহিনী। জাতক-কাহিনী তিনি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করে দেখলেন যে, এর সঙ্গে কাহিনীগত দিক থেকে 'রামায়ণের' সাদৃশ চোখে পড়ে। কিছুদুর পর্যন্ত 'রামায়ণ' পরে 'মহাভারতে'র সঙ্গেও মিল দেখিয়েছেন তিনি। — জাতকের কাহিনীতেও আছে বোধিসত্ত্বের বিমাতার চক্রান্তে বনবাসী হওয়ার কাহিনী। এর সঙ্গে 'রামায়ণের' সাদৃশ্য থাকলে ও পরবর্তী অংশের সঙ্গে 'মহাভারতে'র ঘটনাগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 'মহাভারতে' ধর্মবকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের উত্তরদানের ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষনীয় হয়েছে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এখানেও এক সরোবর, কুবেরসখা উদকরাক্ষস তাঁর অধিকারী ;

এখানে ও জলাহরণ ও প্রশ্নোত্তর, অপমৃত্যু ও উদ্ধার।[৯৬]

অবশ্য বুদ্ধদেব বলেছেন যে রাম যেমন যুধিষ্ঠিরের অনাত্মীয় বোধিসত্ত্বের সঙ্গেও যুধিষ্ঠিরের কোনো সাদৃশ্য নেই -দুজনেই দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। বোধিসত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের তুলনায় অনেকবেশী প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্বভাবতই কতৃত্বক্ষম। জলাহরণ করতেগিয়ে ভ্রাতৃবর্গ সরোবরবাসী যক্ষ কর্তৃক নিগৃহীত হলে উভয়েই ভ্রাতৃউদ্ধারে ঘটনাস্থলে যান। ধনুর্বান ও অসি নিয়ে প্রস্তুত হলেন বোধিসত্ত্ব, আর যুধিষ্ঠিরের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। তবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে একমত না হয়ে বলা যায় যে এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির অনেকবেশী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অস্ত্রবলে যে তিনি পেরে উঠবেন না তা জানতেন বলেই বুদ্ধির উপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য, একটি ভ্রাতার পুণরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে উভয়েই চাইলেন বৈমাত্রেয়কে। বুদ্ধদেব বসুর মতে, তাঁদের প্রত্যাশায় আপাত মিল থাকলেও প্রণোদনায় এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন লোকনিন্দা বিষয়ে সতর্ক আর যুধিষ্ঠির নিজের হিতাহিত না ভেবে, শুধু চেয়েছিলেন তাঁর বিমাতারও একটি অন্ততঃ পুত্র বেঁচে থাক।

'আগুন জলের গল্প' শিরোনামে বুদ্ধদেব যে খণ্ডপর্বটি উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তিনি এমন কয়েকটি মিথের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি ভারতীয় পুরাণে নেই। পাশ্চাত্ত্য সেইসব মিথগুলির সঙ্গে তিনি মহাভারতের কোনো পৌরাণিক ঘটনার তুলনা করেছেন। খাণ্ডব বনদাহনের ঘটনাটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অরণ্যের সঙ্গে কৃষিসভ্যতার দ্বন্দ্ব। বুদ্ধদেব লিখেছেন -

> খান্ডববন দাহনের উপরিস্তরজাত অর্থটি খুব স্পষ্ট। নগর নির্মানের
> জন্য অরণ্য ধ্বংস করা হ'লো, ... একে বলা যায় মানবেতিহাসের
> একটি প্রধান পদক্ষেপ, বলা যায় বর্বরতার বিরূদ্ধে সভ্যতার অভিযান।[৯৪]

এই খাণ্ডবদাহনের ঘটনার মধ্যেই তিনি আরো অনেক অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে,

> একটি বৈশ্বিক পটভূমির উপর এর প্রতিষ্ঠা।[৯৫]

ইলিয়াড বর্ণিত নদীর সঙ্গে অ্যাকিলিউসের সংগ্রাম (সর্গ-২১) - এই মিথটির সঙ্গে বুদ্ধদেব খাণ্ডবদাহনের মিল দেখেছেন। অ্যাকিলিউসকে যুদ্ধসজ্জা তৈরী করে দিয়েছিলেন হেফাইস্তস। আমাদের ভাষায় যাঁর নাম বিশ্বকর্মা। সেই সজ্জা গ্রহণ করে আকিউলিস হয়েছিলেন অগ্নির মতোই ভয়ংকর। এবং শেষে হেফাইস্তস নিজহাতে যুদ্ধভার গ্রহণ করেন —

> তাঁর ফুৎকারে জ্বলে উঠলো আগুন - ... দগ্ধ হ'লো শবপুঞ্জ
> ও প্রান্তর ... এমনকি জলের তলায় যে মাছেরা নিশ্চিন্তে
> খেলা করে, তারাও বিদ্ধ হ'লো সেই উত্তাপে, ... আগুনে দগ্ধ
> হ'লো জল।[৯৬]

পাশ্চাত্ত্য এই মিথের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ও পরিপ্রেক্ষিত আলাদা হতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু সাদৃশ্য আছেই খান্ডববন দাহনের সঙ্গে। খান্ডবদাহনেও অগ্নি তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে দগ্ধ করে ফেলে সবকিছু। আগুন জলের দ্বন্দ্বেঅগ্নি দেবতাই জয়ী হলেন, 'মহাভারতে' এবং 'ইলিয়ডে'। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য

মিথ দুটির মধ্যে অভিপ্রায় গত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। দুটি মিথেই আছে দ্বন্দ্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক।

'ইলিয়ডে'র এই অংশের সঙ্গে খান্ডববন দাহনের যে মিল তা হল - দুটো ঘটনাতেই আছে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনী। তবে বুদ্ধদেব বসু এই দ্বন্দ্বের আড়ালে অন্য এক বার্তা পরিবেশন করেছেন বলে মনে হয়, যা মানুষের চিত্তবৃত্তিগত এবং প্রাকৃত তা হল

> বৃষ্টির বিরূদ্ধে দাবানল, শান্তিজলের বিরূদ্ধে রণাগ্নি, নিম্নগামী
> স্নিগ্ধতার বিরূদ্ধে উত্তপ্ত ও আরোহমাণ উচ্চাভিলাষ, বিভেদহীন
> স্রোতের বিরূদ্ধে বিচ্ছেদপ্রবণ সংগ্রামলিপ্সা।[১০০]

আগুন জলের দ্বন্দ্বের মধ্যে এ সবই গৃহীত হয়েছে। জলের বিরূদ্ধে আগুনের যুদ্ধ অর্থ্যাৎ স্নিগ্ধতার বিরূদ্ধে উগ্রতার যুদ্ধ সেদিন থেকেই শুরু, হ'ল। এর হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই।

তবে 'আগুন-জলের গল্পে' শুধু শত্রুতাই নয় - একটি মিত্রতার সুরও বুদ্ধদেব বসু খুঁজে পেয়েছেন। 'ইলিয়ডে' দেখি যে নদী শেষপর্যন্ত কথা দিয়েছিল ট্রয়বিরূদ্ধ কাজ আর করবে না। আর খান্ডবদাহনে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং জলেশ্বর অর্থ্যাৎ বরুণই অর্জুনকে দান করেন গাণ্ডীবধনু, দুটি অক্ষয়তূণ এবং বিশ্বকর্মা রচিত একদিব্যরথ। আর তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন —

> জলের সঙ্গে আগুনের যুদ্ধে জলেশ্বরই সহকারী।[১০১]

বিষয়টি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। রাজনৈতিক কোনো চুক্তি কিংবা হিংসার বিরূদ্ধে হিংসা কখনোই সৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারে না। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

> সন্ধি, যোজনা, মিলন - এবং দুই বিরূদ্ধ শক্তির মিলন -
> ... নারীর গর্ভে জল, পুরুষের বীর্যে আগুন - এদেরই সহকর্মিতার
> ফলে জন্ম নেয় প্রাণীরা। ... বিপরীত এই সন্ধির উপরেই নির্ভর
> করে আছে অন্য সব জন্ম ও উৎপাদন।[১০২]

বৃষ্টি ও রৌদ্রের সমবায়ে ফসল উৎপন্ন হয়, আর আগুন ও জলে তৈরী হয় আমাদের খাদ্য - অন্ন। আর-

> জড়প্রকৃতির এই মিলনধর্মিতা থেকেই যুধিষ্ঠির একটি মানবিক
> নীতি আহরণ করেছিলেন।[১০৩]

তবে এই নীতি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁকে সাহায্য করেনি। আর সেকারনেই, আধুনিক যুগের সমালোচক যুধিষ্ঠিরের 'চিন্তাপীড়িত অস্থৈর্যের চেয়ে' অর্জুনের 'নিঃসংশয় যুদ্ধনীতিকেই' গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করেন।

একহিসেবে, যুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক কবি-শিল্পীরাই মিথ পুরাণের ব্যবহার করেছেন বেশী। এই বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকীত্ব ও যন্ত্রনায় জর্জরিত হয়ে তাঁরা আদিম মিথিক ভুবনে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। বুদ্ধিগত চৈতন্যের উপর স্থান দিতে চেয়েছেন আদিম স্বপ্ন কল্পনার জগৎকে। কবি শিল্পীর

মনের যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রত্যাশা একটি স্থিরভূমি পেয়েছে মিথ পুরাণ বিষয়ক রচনাগুলিতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বুদ্ধদেব তাঁর ভারতকথা ব্যাখ্যা করেছেন। মিথ-পুরাণের আলো জ্বালা পথে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রতিপাদন করেছেন তিনি। জীবনের সমস্ত সমস্যা, বেদনা, বিচ্ছেদ-অন্তর্দাহের দিনগুলি পেরিয়ে সবশেষে তিনি হলেন অমৃতাভিলাষী। অনন্তের পথে তাঁর এই অভিযাত্রা আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে একটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। তিনি যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্থানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আবহমান মানবজীবনের চিত্র। বহুভাষাবিদ বুদ্ধদেব ভারতীয় - অভারতীয় সাহিত্য নির্বিশেষে পাঠ করতেন। এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাঁর সমালোচনা কর্মে। তিনি পৃথিবীর সাহিত্য ও পুরাকথার সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনার মাধ্যমে 'মহাভারত' কথা ব্যাখ্যা করেন। তাই 'মহাভারতে' যুধিষ্ঠিরের কথা বলতে গিয়ে তিনি 'ওডিসি'র আদিসেয়ুস প্রসঙ্গ ভোলেন না। তিনি উল্লেখ করেছেন গ্রীক কবির নায়ক আদিসেয়ুসের মধ্যে যেন যুধিষ্ঠির, অর্জুনের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে। এই দুই সত্তার মিলিত রূপ আদিসেয়ুস। আসলে, বুদ্ধদেবের গভীর অধ্যয়ণশীল মন 'মহাভারত' সমালোচনায় পৃথিবী পরিক্রমা করেছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অজস্র মণিমুক্তাগুলি সূত্রবদ্ধ করেছেন তিনি। বিভিন্ন সাহিত্যে, পুরাকথায় ছড়ানো উপাদান গুলির সংযোগে তিনি ভারতকথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'মহাভারত' সমালোচনায় তাই হোমারের 'ওডিসি' - সেই সূত্রে দান্তে, এমনকি গ্রীক কবি, লাতিন সাহিত্যিকের রচনাও বাদ পড়েনি।

। ঘ ।

'রামায়ণ' সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের রচনা মাত্র পনেরো ষোল পাতার একটি প্রবন্ধ। আর 'মহাভারত' সম্বন্ধে তিনি পরিণত বয়সে ক্রমাগত গভীর আগ্রহ বোধ করে চলেছেন। 'রাবণ' নামে যে নাট্য প্রচেষ্টা তাঁর কৈশোরক রচনা হিসেবে উক্ত হয় তা কেবল ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে এখন আমাদের কাছে আত্মরক্ষা করে চলেছে। তাঁর এই প্রবন্ধটি ছাড়া বড়জোর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্য নাট্যের একটি দেহপঞ্জর কিংবা 'মাইকেল' প্রবন্ধে দু'চারটি মন্তব্য 'রামায়ণ' সম্বন্ধে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্যপক্ষে 'মহাভারত' তাঁকে যুগিয়েছে বহু কাব্যোপকরণ - কাব্যবস্তু চিন্তার বহু উপাদান। একটি বৃহৎ গদ্যরচনা - চিন্তামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মহাভারতে'র বিশ্লেষণী আলোচনাও তিনি লিখে গেছেন যা অন্য কোনো প্রাচীন সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে রচিত হয়নি।

বুদ্ধদেবের প্রাচীন সাহিত্যচর্চার আশ্রয় তিনটি মাত্র গ্রন্থ 'রামায়ণ', মেঘদূত' এবং 'মহাভারত'। প্রথম দুটির মধ্যে ব্যবধান দশ বছরের, পরের দুটির ক্ষেত্রে ব্যবধান যদিও সতের বছরের, তবু, ১৯৬৪-৬৫তেই এই ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে এবং তার লালন প্রকর্ষে কেটেছে আরো প্রায় আট/দশ বছর। প্রাচীন সাহিত্যর চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম অভিমুখিতা 'রামায়ণে'র দিকে।

'রামায়ণ' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে কটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেগুলি সম্ভবতঃ তাঁর আগে তোলা অসম্ভব ছিলো। বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক ধ্যান-ধারনার খোলা হাওয়া তাঁরা নিয়ে আসতে চাইলেন তাতে কোনো রচনাকে কেবল সাহিত্যবোধের দৃষ্টি থেকে দেখার সুবিধা হ'ল। একথা ঠিকই যে, সাহিত্যিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিমের বা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিও লেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যচর্চায় বঙ্কিম ইতিহাসের বিচার ও পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজের চিন্তার দর্পনে 'মহাভারতে'র যুগ ও জীবনের পুণর্গঠন করেছিলেন। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' সেইরকম রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' চর্চার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে তাতে কখনো সাহিত্য সমালোচনার বিচারমূলকতা বড় হয়নি। কখনো বা ভক্তির আবেগ কাজ করেছে কখনো বা কাজ করেছে সমাজ ও ইতিহাস ব্যাখ্যার দৃষ্টি। ফলে, 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা কিংবা জাভাযাত্রীর পত্রে, 'রামায়ণের' মধ্যে জাতিগত বিরোধ ও সমণ্বয়ের রূপ কিংবা কৃষি সভ্যতার রূপক সন্ধান করেছেন তিনি। 'রামায়ণে'র এইরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইংরেজ আলোচকরা অগ্রণী ছিলেন। ওয়েবার কিংবা লাসেন 'রামায়ণে'র মধ্যে দক্ষির ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের রূপক সন্ধান করেছিলেন। কারো কারো মতে, 'রামায়ণে' রাম-রাবণের যুদ্ধ আসলে ছিল আর্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধের রূপক মাত্র। সুতরাং এই রূপক চর্চার একটা সূত্র ছিলোই। রবীন্দ্রনাথও এই রূপক বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভাবগত ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। 'রামায়ণ' সাহিত্য কিন্তু সেই সাহিত্যের মধ্যেই আছে ইতিহাসের দিকনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাস ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিএকেবারে বর্জন করেন নি। তাঁরও মনে হয়েছে, webar এর মতো, 'রামায়ণে' আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘাতের চিত্র আছে। হরধনু ভঙ্গ 'রামায়ণে' একটা মোড় ফেরার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ 'জাভাযাত্রীর পত্রে' লিখেছিলেন —

> আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত
> কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল সে সহজে
> হয়নি, তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই
> ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত-অরণ্যের
> সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।[১০৪]

সুতরাং 'রামায়ণের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও ঐতিহাসিক সমাজভিত্তিক ব্যাখ্যার মডেল গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ভিন্নরীতির কিন্তু মডেলটি বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সমাজভিত্তিক। কিন্তু দেখা গেল যে, বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ' চর্চায় এই সমাজভিত্তিক ব্যাখ্যা একেবারেই ব্যবহার করলেন না। তিনি বরং সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'রামায়ণ'কে দেখলেন। যদি 'রামায়ণ' সম্বন্ধে আমাদের বোধ কোনো গভীরতা পায় তাহলেই, সেই দৃষ্টিকোণের মূল্য অবশ্য গ্রাহ্য হবে।

বুদ্ধদেব বসু শুধু 'রামায়ণ'-ই নয়, 'মেঘদূত' বা 'মহাভারত' তিনটি ক্ষেত্রেই এই সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। মনে রাখা যেতে পারে এই দৃষ্টিকোণ তখন পশ্চিমের সাহিত্য ব্যাখ্যায় গুরুত্ব পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, যাঁরা আধুনিক সমালোচনা লিখছিলেন, New criticism-এর চর্চা করছিলেন, তাঁদের কাছে এই দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব ছিল। বুদ্ধদেব এই পশ্চিমী সাহিত্যভাবনা গ্রহণ করেছিলেন বললে ভুল হয় না। সাহিত্যের ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত মনন প্রাধান্য বা বুদ্ধিচেতনা কিংবা সমাজতাত্ত্বিকের ভাবনা যে তাঁর পছন্দ ছিল না সেকথা বোঝা যায় 'পরিচয়' এর আড্ডা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবে। এবং

অতিরিক্ত বুদ্ধিময় ব্যাখ্যার চাইতে তিনি সহজ জীবনরসের আস্বাদনের দিক থেকে সাহিত্য বিশ্লেষণে অধিকতর স্বচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাই 'রামায়ণ' সম্বন্ধে তাঁর যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হ'ল সেগুলি কিন্তু এই জীবনরসের আস্বাদনের দিক থেকেই উঠতে পারলো। আগে বলা হয়েছে কেবল আধুনিকতার বাতাবরণের মধ্যেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ'চর্চার পক্ষে মূল প্রশ্ন 'রামায়ণে' সীতাহরণের উদ্দেশ্য সন্ধান। এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন যুগ বিভিন্নভাবে দিয়েছে, তিনি তাঁর মতো করে এর উত্তর দিলেন। তাঁর উত্তর যদিও গোটা 'রামায়ণ' ব্যাখ্যার পক্ষে একটু লঘুত্ব বাচী বলে আমাদের মনে হয়, তব তাকে বর্জন করা যায় না। 'রামায়ণে' সীতাহরণের মধ্যে তিনি সম্ভোগ লিপ্সার চেয়ে প্রেমাভীপ্সাকেই মুখ্য স্থান দিতে চান। একথা ঠিকই যে, বহু রূপকথার কাহিনীর মধ্যে নারী হরণ করে তার সমর্থন পেতে রূপকথার রাজারা বহুবছর অপেক্ষা করে থাকতেন। এমনও তো দেখা গেছে যে, প্রাচীনকালে বিবাহ ব্যাপারটাই ছিল হরণভিত্তিক এবং রামের স্ত্রীকে হরণ করে রাবণ এমন কিছু একটা রাক্ষুসে কান্ডও করেননি বরং সেকালের ধর্মই পালন করেছিলেন। বুদ্ধদেবের এই কেন্দ্রীয় প্রশ্নকে ঘিরে এসেছে সাহিত্যবিচারে কিছু ভাবনা। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির তুলনা, আদি কবির অকৃত্রিম জীবন-প্রীতির প্রসঙ্গ, এবং রামচরিত্রের প্রতি উৎক্ষিপ্ত সেইসব প্রশ্ন যা সব আধুনিককালের মানুষকেই প্রশ্নমনস্ক করেতুলেছে। রামের বালীবধ বিশেষতঃ সীতাবর্জন সকল মানুষেরই মনে প্রশ্ন উত্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথও সেই প্রশ্ন না তুলে পারেননি। তবু রামের মধ্যে, মানুষের চরিত্রের যে পূর্ণতার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন 'বহুকালগত গুণাবলীর পূর্ণবিকশিত মূর্ত্তিরূপে যাকে দেখেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে তাঁকে আর সেই চরিত্রবত্তার দিক থেকে দেখাই সম্ভব হল না। বরং, তিনি খুঁটে খুঁটে বিচার করে তুলে আনলেন রামচরিত্রের সেই দ্বিখণ্ডিত সত্তা - একদিকে তাঁর চরিত্রের নিরঞ্জন প্রশান্তি আবার তাঁর চরিত্রের সেই বিভ্রম সৃষ্টিকারী ত্রুটি বা সাধারণ ন্যায়ের বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত। তাঁর পক্ষে 'রামায়ণে'র রামের সঙ্গে ইতিহাসের জুলিয়াস সীজারেরও তুলনা দেওয়া সম্ভব হ'ল কেবল এই করণে যে, রাম সম্বন্ধে তিনিও কোনো উচ্চবাচ্য মাত্র না করে আমাদের প্রথাগত ভাবনার বাঁধিগৎটাকে ভেঙে দিতে চান। তবু, 'রামায়ণ' ভাবনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবেরও যেন চিন্তা দ্বিধান্বিত কিংবা দ্বিচিত্রিত। কেননা, যাঁর কাজকে একদা ধিক্কারযোগ্য মনে হয় তাঁর - ছি ছি করে ওঠে তাঁর অন্তরাত্মা সেই তিনিই যদি রামের কাজকে পুরোপুরি লীলা বলে মনে করেন, তাহলে পূর্ববর্তী খেদ ও ধিক্কার অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। রামকে যদি ভাবা সংগত হয় কেবল

> পাঠমুখস্থ করে রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী হবে,
> তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না,[১০৫]

তাহলে সেই রামের প্রতি কোনো ধিক্কার প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয় না বরং সেখানে সেই বক্তব্যই সংগত বলে মনে হয় যে, আদি কবির নিরঞ্জন ও সর্বংসহ বাস্তবতার কোনো আধুনিক ব্যাখা অর্থহীন।

তবু, কেবল শিল্পশক্তির বিচার বিশ্লেষণ-ই 'রামায়ণে'র পক্ষে চূড়ান্ত বিচার কি-না সে প্রশ্ন ওঠেই। 'রামায়ণে'র পক্ষে সেই প্রশ্নের সংগতি এই কারনে যে, যেকোনো জাত মহাকাব্যই অনেকটা পাললিক শিলাস্তূপের মতো কালে কালে বহু কবির বহু কাব্যময় আখ্যানের সমন্বিত প্রকাশ হয়ে দেখা

দেয়। ঐতিহাসিকদের বিচারকে সাহিত্যিক পূর্ণতা তত্ত্ব দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রশ্ন একেবারেই যে বুদ্ধদেবকে নাড়া দেয়নি, তাই বা বলি কী করে। তিনি নিজেই একটি ঈশারা আমাদের দিয়েছেন শেষ বাক্যে। রামায়ণের দ্বিধা বা অসংগতি বা অনেক প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই বলে তিনি লিখেছেন —

> হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি
> অব্যর্থ সন্ধান ছিলো যা ফিরে পেতে হলে সমস্ত সভ্যতা লুপ্ত
> করে দিয়ে মানবজাতিকে আবার নতুন করে প্রথম থেকে
> আরম্ভ করতে হবে। [১০৬]

'রামায়ণের' উত্তরকান্ড সম্বন্ধে বুদ্ধদেব একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। তিনি আগাগোড়াই মনে করে এসেছেন রামায়ণ একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা। আর, উত্তরকান্ড তারই অঙ্গবিশেষ। 'রামায়ণে' উত্তরকান্ড যোজনার তাৎপর্য এই যে তিনি একালের দৃষ্টি থেকে গোটা 'রামায়ণে'র তাৎপর্যকে ভেবেছেন পেয়ে হারানোর বিষাদ। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূতে'র মধ্যে খুঁজেছিলেন চিরন্তন বিরহের কথামালা, তাই 'রামায়ণে'র যন্ত্রনা হৃদয়স্পর্শী। 'মহাভারতে'ও তাই, 'মেঘদূত'কে ও হয়তো এই বিষাদকারুণ্যের দিক থেকে দেখা যেতে পারে। যে সীতার জন্য এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, জীবন-পণ সাগর বন্ধন, সেই সীতাতেই রামের কোনো আসক্তি নেই। যেমন 'মহাভারতে' বহুকথিত, তেমনি 'রামায়ণে'ও এই অকথিত অনুচ্চার বাণীই মুখ্য যে, প্রাচীন ভারত কোনো আসক্তির বন্ধন স্বীকার করে না - চিত্ত উন্মাদ কর 'প্রেমেরও জন্য তার টান নেই - কেবল কর্ত্তব্য এবং ধর্মপালন এবং বীতস্পৃহ হয়ে কর্মপালন করা - এই তার শিক্ষা। বুদ্ধদেব এরকম একটা ইঙ্গিত 'রামায়ণ' থেকে দেখেছেন নিশ্চয় কিন্তু তারই সুতোয় 'মেঘদূত' কাব্য সমালোচনাকে টেনে আনেননি। নাহলে একথা তো আমাদের মনেই হয়, যে - নৈর্ব্যক্তিকতা এবং নিরঞ্জন বাস্তবতা আদি কবির বস্তু ছিলো তাই কবি কালিদাসের রচনায় কেমন ভোগপাণ্ডুর হয়ে পড়েছে। 'মেঘদূত' কাব্যে তাই তিনি দেখালেন। 'রামায়ণ' - 'মহাভারতে' যদি কেবল বীতস্পৃহ মানসিকতার জয়োচ্চারণ হয়, তাহলে ভোগকুণ্ঠিতের আর্তি ব্যক্ত হয়ে ওঠে 'মেঘদূত' কাব্যে। 'মেঘদূত' কাব্যের বিচারে বুদ্ধদেব এই ভোগলিপ্সার উচ্চারণ খুঁজেছেন। কেবল সম্ভোগলালসা একটি কাব্যের বিষয় হলে যা দাঁড়ায়, 'মেঘদূত' বুদ্ধদেবের চোখে আসলে তাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো অতলান্ত এবং সর্বব্যাপ্ত বিরহ এখানে খুঁজে পান না বরং 'মেঘদূত'কে তাঁর প্রথম থেকেই মনে হয় কৃত্রিম কারুকৃতি - সেই কৃত্রিমতা বাক সজ্জায় এবং বিষয় বক্তব্যেও। যক্ষের বিরহের তেমন কোনো কারণও তিনি খুঁজে পান না। যা কিছু তাঁর কষ্ট কেবল বর্ষকাল ভোগসঙ্গিনীর অভাবজনিত - এবং তাও কিছু দুঃসহ বলে বুদ্ধদেব বসু মনে করেন না। তবু, 'মেঘদূত' যে কাব্য হিসেবে আমাদের মনকে এতটাই আক্রান্ত করে তার কারন আমরা আত্মগত অনুভবের দিক থেকে তাকে দেখি। বুদ্ধদেব অবশ্য বলেন, এর অসাধারণ কাব্যবিন্যাসের উপাদান ছন্দ আর ধ্বনি - আর কাব্যের একটা গতিময় আকর্ষণ।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের দুই পুরোধা ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনার ক্ষেত্রে

বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল বিশ্লেষকের। তাই তিনি 'মহাভারতে'র উপর বহু প্রক্ষেপ অভিক্ষেপ অনুসন্ধান করেছিলেন। 'মহাভারতে'র মূল অংশ সন্ধানে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও এই বিশ্লেষণী মনোভাব আরোপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ', 'মহাভারতে'র মতো গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে — পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যার কথা বলেছেন। এবং তাঁকে প্রকৃত সমালোচনা বলেছেন।[১০৭]

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে লিখেছেন —

> সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ ; এক প্রাচীন
> কুসংস্কারের নিরাস ; অপর, সত্যের সংগঠন।[১০৮]

বুদ্ধদেব বসু প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হলেও 'মহাভারত' সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হলেও 'মহাভারত' সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বরং রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবের দৃষ্টির মধ্যেও ঐক্যবোধ আমরা লক্ষ্য করি। সেকারনেই 'মহাভারতে'র সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র তিনি আবিস্কার করেন। 'মহাভারতের কথা'র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন —

> আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু
> সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন,) আমি সে
> গুলিকে 'অবাস্তব' বলে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেইসব বাস্তবাতীত
> রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার সন্ধান করেছি।[১০৯]

তিনি এখানে বলেন যে যেখানে কুসংস্কার আছে, সেই কুসংস্কার উচ্ছিন্ন করার অর্থ হল এর অন্তর্লীন বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটানো। আর তাই সাহিত্যিক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি 'মহাভারতে'র পাতায় পাতায় সৌন্দর্য ও কল্পনার অফুরান ভাণ্ডার আবিস্কার করেছেন। সেজন্যেই 'রামায়ণে' রামের প্রতি তিনি অকরুণ, সীতাবর্জন, বালীবধ প্রভৃতি কার্যের কঠোর সমালোচনা তিনি করেন কিন্তু 'মহাভারতে'র নায়ক যুধিষ্ঠিরের তিনি সমর্থনকারী। তাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন ধর্মের বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন সেই ঘটনারও ব্যাখ্যা দান করতে তিনি কুণ্ঠিত হন না।

নির্দেশিকা

১। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১, পৃঃ ১২৯

২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খন্ড, কলিকাতা, পাত্রজ পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ, জুন ১৯৮৩, পৃঃ ১৭৫

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ১১।

৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১, পৃঃ ১৪

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ১২

৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত (অনূদিত), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ৫

৭। তদেব, পৃঃ ৫

৮। বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবন কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৭৭, পৃঃ ৮০

৯। তদেব, পৃঃ ৮১

১০। রায় আনন্দ (সম্পা)। 'বুদ্ধদেব বসুর রামায়ণ ভাবনা', বুদ্ধদেব বসু ঃনানা প্রসঙ্গ, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ, ১৯৭৮, পৃঃ ১৮৭

১১। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৫৪, পৃঃ ৯

১২। তদেব, পৃঃ ৯

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩১০

১৪। সেন, প্রবোধচন্দ্র, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (অনূদিত), ভারবি, ১৯৭৫

১৫। Winternitz, A History of Indian Literature, Vol-I, Part-II, Calcutta, Calcutta Univ. Press, 1978, Page-277.

১৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ' সাহিত্যচর্চা, রামায়ণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৫৪, পৃঃ ১৯

১৭। তদেব, পৃঃ ১৯

১৮। তদেব, পৃঃ ১২

১৯। তদেব, পৃঃ ১৪

২০। তদেব, পৃঃ ১৬

২১। তদেব, পৃঃ ১৬

২২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ৮

২৩। তদেব, পৃঃ ৭

২৪। বসু, রাজশেখর, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৭৮

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ভূমিকা, শ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, কথা রামায়ণ, ২-য় খন্ড, শ্রীরামাশ্রম (প্রকাশন), ডুমুরদহ, ১৩৬৪ (১ম সংস্করণ)

২৬। সেন, দীনেশ চন্দ্র, রামায়ণী কথা, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩১০, পৃঃ ৫১

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৬

২৮। তদেব, পৃঃ ১৬

২৯। তদেব, পৃঃ ১৬

৩০। বসু, রাজশেখর, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ৩২৯

৩১। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৮

৩২। তদেব, পৃঃ ১৭

৩৩। বসু, রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ ভূমিকা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৭৮

৩৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২৩

৩৫। তদেব, পৃঃ ২৩

৩৬। তদেব, পৃঃ ২৩

৩৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য , কলিকাতা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ৯

৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫১

৩৯। তদেব, পৃঃ ১৫১

৪০। তদেব, পৃঃ ১৫৩

৪১। তদেব, পৃঃ ১৫৪

৪২। তদেব, পৃঃ ১৫১

৪৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৮

৪৪। তদেব, পৃঃ ২১

৪৫। তদেব, পৃঃ ২১-২২

৪৬। তদেব, পৃঃ ২২

৪৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২৯

৪৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২১

৪৯। বসু, রাজশেখর, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৭৮, পৃঃ ১১২

৫০। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২১

৫১। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২৯

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ ২১৫

৫৩। বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭, পৃঃ ৪৩

৫৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'প্রাচীন সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ, ২-য় খন্ড, পৃঃ ২২২

৫৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ (১ম প্রকাশ), পৃঃ ৩৪

৫৬। তদেব, পৃঃ ৪১

৫৭। বসু, বুদ্ধদেব, শ্লোক ১১৬, 'উত্তরমেঘ', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ১২৭

৫৮। আতোয়ান, ফাদার রবার্ট, বেতার জগৎ, ২২শে মে, ১৯৭৪, পৃঃ ৪১১

৫৯। দাশ, জীবনানন্দ, 'আকাশ লীনা', আধুনিক বাংলা কবিতা, বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ ৮১

৬০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্ন', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড, জন্ম শত বার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃঃ ৭০০

৬১। বসু, বুদ্ধদেব, ১০৪ নং শ্লোক, 'উত্তরমেঘ', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ১২১

৬২। তদেব, পৃঃ ৫০

৬৩। তদেব, পৃঃ ৫০

৬৪। তদেব, পৃঃ ৫০

৬৫। তদেব, পৃঃ ৫১

৬৬। বসু, বুদ্ধদেব, পাদটীকা, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ৫৬

৬৭। Eliot, T. S. 'What is classic', On poetry and poets, London, Boston, Faber and Faber, First Published 1933, Page- 54

৬৮। Ibid, Page- 59

৬৯। বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৩০

৭০। তদেব, পৃঃ ৩৩

৭১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণ চরিত্র', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, এয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৯২৬

৭২। সেন, প্রবোধ চন্দ্র, 'বাংলা মহাভারত চর্চা', উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ২২

৭৩। বসু, বুদ্ধদেব, মুখবন্ধ, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

৭৪। চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল ঃ মিথ পুরাণের সন্ধানে', বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা, পুস্তক বিপনি, অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃঃ ৮৩

৭৫। বসু, বুদ্ধদেব, মুখবন্ধ, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

৭৬। তদেব, মুখবন্ধ

৭৭। M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol, Part II, Calcutta, Calcutta University Press, 1978, Page- 384

৭৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'যুধিষ্ঠির ও অর্জুন', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ১০৫

৭৯। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮০। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮১। Scholes, Robert and Kellogy Robert, OUP, London Oxford, New York, 1968, Page 210

৮২। দত্ত, মধুসূদন, মধুসূদন রচনাবলী, ইংরেজী সহ সমগ্র রচনা, ১ খন্ডে, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৪৭

৮৩। তদেব, পৃঃ ৫৫১

৮৪। বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, মুখবন্ধ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

৮৫। তদেব, মুখবন্ধ

৮৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১১

৮৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'এক বিশ্ববিদ্যালয়', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৪৮

৮৮। তদেব, পৃঃ ৫০

৮৯। তদেব, পৃঃ ৫১

৯০। বসু, বুদ্ধদেব, 'ঘরে-বাইরে', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ১৬১

৯১। তদেব, পৃঃ ১৬১

৯২। বসু, বুদ্ধদেব, 'পশ্চিম সমুদ্র ও হিমালয়', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ১৭৩

৯৩। তদেব, পৃঃ ১৮১, পাদটীকা, ১০৪ নং

৯৪। তদেব, পৃঃ ১৭৯

৯৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'পূর্বাভাস ও প্রতিরূপ', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ,

মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৫৯

৯৬। তদেব, পৃঃ ৫৯

৯৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'আগুন জলের গল্প', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৮৩

৯৮। তদেব, পৃঃ ৮৩

৯৯। তদেব, পৃঃ ৮৫

১০০। তদেব, পৃঃ ৮৭

১০১। তদেব, পৃঃ ৮৮

১০২। তদেব, পৃঃ ৮৯

১০৩। তদেব, পৃঃ ৮৯

১০৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জাভা যাত্রীর পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড ঃ প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃঃ ৬২০-৬২১

১০৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২১.

১০৬। তদেব, পৃঃ ২৪.

১০৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী, এয়োদশ খন্ড।

১০৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণ চরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড কলকাতা, পাত্রজ, ১৯৮৩, পৃঃ

১০৯। বসু, বুদ্ধদেব, মুখবন্ধ, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

রবীন্দ্র সমালোচনা

একজন কবি সমালোচক যে কবি দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ ভাবে যাঁর কাব্যের সঙ্গে তাঁর নিজের কবিতার গভীর সম্বন্ধ আছে, তাঁর কাব্য সমালোচনা সেই কবির সৃষ্টিকর্মের অংশ হয়ে উঠতে পারে। এলিয়ট তাঁর সমালোচনা বিষয়ে এধরনের কথাই বলেছিলেন -

> .... in so far as it is valid, it springs from experience
> of those authors who have profoundly influenced my
> own writings.[১]

শুধু নিজের জন্যই নয়, এজরা পাউণ্ডের সমালোচনা সম্বন্ধেও এলিয়ট এই কথাই বলেছেন। 'Influence' বা প্রভাব অর্থে এখানে অবশ্যই অনুকরণ নয়।বিশেষ করে সচেতন অনুকরণ কবির অক্ষমতাই প্রমান করে। প্রভাবকে আত্মস্থ করে কাব্যের নবীনতা দান করা যায়। রবীন্দ্রানুসারী অনেক কবি রবীন্দ্রানুসরণ করেছেন, রবীন্দ্রবলয়ে আবর্তিত হয়েছেন কিন্তু যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি।

> বোঝা যায়, রবীন্দ্রপ্রেমে আত্মহারা এইসব কবিদের রবীন্দ্রনাথকে
> যথার্থ আত্মসাৎ করার ক্ষমতাই ছিল না, এঁরা রবীন্দ্রনাথের
> অনুকরণ-ই করেছেন শুধু, উপলব্ধি করেননি।[২]

বুদ্ধদেবের ভাষায় বলা যায় —

> রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না।[৩]

সুতরাং বোঝা যায়, বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র সমালোচনা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠবে রবীন্দ্রধ্যান, রবীন্দ্র অনুকরণ মাত্র নয়। যে প্রভাব কবিকে নির্বীজ করে না বরং তাঁকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী করে, রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে সেই সৃজনশীলতার স্পর্শ পেয়ে সৃষ্টির উৎসার ঘটবে আলোচ্য কবি সমালোচকের লেখায় - একথা মনে করা যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের কাছে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বিস্ময় ও অনুরাগের প্রতীক। তাঁর জীবনব্যাপী রবীন্দ্রচর্চায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'বন্ধু', 'প্রিয়তম'। ১৯৪২ সালের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন -

> তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
> হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। ...[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গান ও কবিতায় এই সম্বোধনে ঈশ্বরকে সম্বোধিত করেছেন। বুদ্ধদেবের লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বার বার প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগ থাকলেও তাঁর জীবনবোধে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার স্থান তেমন নেই। তাঁর মানসিকতা সর্বঅর্থেই সংস্কারমুক্ত একজন আধুনিক মানুষের মানসিকতা। সেকারণে তাঁকে অনেকসময় রবীন্দ্রবিরোধী বলে মনে হয়। তবে তিনি "রবীন্দ্রবিরোধী নন্, রবীন্দ্রপূজার বিরোধী"।[৫] রবীন্দ্র প্রতিভাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেই

তিনি সচেষ্ট। আর তাই, সমালোচক হিসেবে

অতি অনুরাগ লিপ্ত বিচারভঙ্গি বাদ দিয়ে স্বাভাবিক বিচার
বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ করার পক্ষপাতী তিনি।[৬]

তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'কথা ও কাহিনী'র 'গানভঙ্গ' কবিতায় বলেছিলেন —

'একাকী গায়কের নহে তো গান'[৭]

তেমনি, শিল্পসাহিত্যের সফলতার মূল কথাটিও হ'ল সংবেদনশীল রসিক শ্রোতার মর্মগ্রাহিতা। সামালোচনার কাজই হ'ল শিল্পসাহিত্য ও পাঠক শ্রোতার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো। সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সমর্থক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আর, সেকারনেই, রবীন্দ্র মানসিকতার সঙ্গে পাঠক সমাজকে পরিচয় করিয়ে দিতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্তহীন।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে রবীন্দ্রসমালোচনার দুটি ধারা প্রবাহিত। একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, অন্যটি আধুনিক। রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় যে জীবনীমূলক ধারাটি চলে আসছে, এরই অনুসরণ করেছেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসময়েই বা তার সামান্য পরে, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী, নীহাররঞ্জন রায়, মোহিতলাল মজুমদার এসেছেন এঁদের পথ ধরেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবনের ঘটনাবলীকেই ফুটিয়ে তোলে। আর অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' উন্মোচিত করে এক আত্মনিমগ্ন কবির অন্তর্লোক।

এঁদের কিছু পরে এলেন বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে নিজস্ব বিশিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু অজিত কুমারের মধ্যেই নিজের পছন্দসই রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধরণটি খুঁজে পেয়েছেন। মানসিক প্রবণতা অনুসারে তাঁর রোম্যান্টিক মনটি এইখানেই আরাম পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আলোচনায় অজিত কুমার চক্রবর্তীর তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনায়-অজিতকুমার-ই বাংলায় প্রথম তুলনামূলক পদ্ধতি এনেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার সে ধারা বুদ্ধদেবের আগে থেকেই চলে আসছিল, তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বুদ্ধদেব। 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট-ই বলেছেন -

স্বর্গত অজিত কুমার চক্রবর্তী থেকে শ্রীযুক্ত প্রথম নাথ বিশী
পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থকর্তারা এইজন্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় যে,
তাঁদের পরিশ্রম তাঁদের রবিপ্রেমের-ই প্রতিমূর্তি।[৮]

সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-জীবনী, রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখার একটি বাধার কথা

উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য - সে বাধা অদ্ভুত, অসাধারন এবং পর্বতপ্রমান। কেননা, সে বাধা রবীন্দ্রনাথ নিজে। রবীন্দ্রনাথই কেন রবীন্দ্র সমালোচনার পক্ষে বাধা-এর উত্তরে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, আত্মজৈবনিক গ্রন্থে ও পত্রাবলীতে তিনি সাক্ষাৎ কল্পতরু। স্বেচ্ছায় কিংবা দায়ে পড়ে তিনি নিজেই নিজের মল্লিনাথের কাজ অসংখ্যবার করেছেন। একারণে, বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর জীবনীকার বা সমালোচকদের অনেকসময়েই সংগ্রাহকমাত্র মনে হয় - কি বড়জোর সম্পাদক। অর্থ্যাৎ,

> তাঁরই রচনা আর চিঠি পত্র থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি, এবং
> সেই উদ্ধতিরই রোমন্থন পেরিয়ে আমাদের রবিচর্চা আর
> বেশিদূর এগোয় না ।[৯]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর রচনা সম্বন্ধে বহুবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেই কারনে তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর রচনাকে জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই, রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে —

> অনেকেই আমরা আজ পর্যন্ত গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারি।[১০]

বুদ্ধদেব বসু এই সমস্যাগুলো সামনে রেখেই রবীন্দ্র সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের যোগ সুদূরবর্তী করে রাখতে চাননি তিনি। বরং

> রবীন্দ্র-কৃত সাহিত্যের কোন পথ দিয়ে পাঠক রবীন্দ্র সাহিত্যের
> হৃদয় সমীপবর্তী হতে পারেন[১১]

সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন।

কালানুক্রমিক ভাবে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি হলো —

১. রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্যে (১৯৫৫)

২. Tagore Portrait of a poet (1962)

৩. সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩)

৪. কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)

এছাড়া, ' সাহিত্য চর্চা ' (১৩৬১) গ্রন্থে ' রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক ' এবং ' রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি এবং এই গ্রন্থের 'বাংলা ছন্দ' নামক প্রবন্ধটিতে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অবদান ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। ' An Acre of Green Grass' (১৯৪৮) গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি অর্থাৎ 'Rabindranath' এবং 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, বিভিন্ন সময়ে বেতার কেন্দ্র প্রদত্ত তাঁর কিছু বক্তৃতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২র মার্চ মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের পাঁচটি বক্তৃতা পরে 'Tagore portrait of a poet ' (1962) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। এর দ্বিতিয় পরিচ্ছেদটি 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙ্গালি' নামে বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে 'সঙ্গ নিরসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) গ্রন্থে স্থান পায়। আর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম চার পরিচ্ছেদে ইংরেজী বইটির মূল উপাদানের অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র বক্তৃতামালারূপে (১৯৬৬-র জানুয়ারী নাগাদ) এগুলিই অনেকটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হয়। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Year book of Comparative

and General Literature'(1963) সংখ্যায় 'Tagore in Translation' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁরই ভাষায়, সেটিকে 'কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬) গ্রন্থের 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ' অংশের আকর বলা যায়।[১২] এখানেই তাঁর আর একটি বক্তব্য আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে —

> কিন্তু এই ইংরেজি লেখাগুলো 'কবি রবীন্দ্রদাথ'-এর যাত্রাস্থল মাত্র,
> বিকল্প নয়। বাংলা ভাষায় রচনাকালে আমার বক্তব্য প্রভূতভাবে
> প্রবৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে, বহু নতুন তথ্য, যুক্তি, উদাহরণ ও
> বক্তব্য যোগ করেছি। ইংরেজিতে যা ছিল ক্ষীণ ইঙ্গিতমাত্র
> এখানে তা পূর্ণ রূপ পেয়েছে, এবং এখানে এমন অনেক প্রসঙ্গ
> আলোচিত হলো যা ইংরেজীতে উল্লেখ পর্যন্ত করিনি।[১৩]

একারনেই ইংরেজীতে লেখা বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র সমালোচনা অপেক্ষা, বাংলায় প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির দিকে আমি নজর রেখেছি বেশী।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনার বুদ্ধদেব-কৃত সমালোচনা। অবশ্য, 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে ও অগ্রন্থিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। 'কবিতা'য় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের এই বিচ্ছিন্ন অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-দর্শন মূলতঃ দুটি ধারায় বিভিক্ত।
ক. কথাসাহিত্যিক ও গদ্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, এবং খ. কবি রবীন্দ্রনাথ।

। ক ।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সূত্রে এই সময় প্রায় ধারাবাহিক ভাবে বুদ্ধদেব রবীন্দ্র-রচনার সমালোচনাগুলি প্রকাশ করেছেন 'কবিতা'র পাতায়। বুদ্ধদেব-কৃত এই সব সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ২২/৩/৪০ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন —

> কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো , ভাষায়,ভাবে ও
> অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণতঃ বাংলা কাগজে
> সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয় - তোমার লেখার মধ্যে বস্তু
> খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না।[১৪]

অথচ, এই মহাকবির রচনা-সমালোচনায় বুদ্ধদেব কখনোই প্রশংসামাত্র করবার রীতি গ্রহণ করেননি। তিনি কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বিচার করেছেন মূলত: তাঁরই নিজস্ব দৃষ্টিতে। কথাসাহিত্য সমালোচনার সূত্র হিসাবে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সৃষ্টির চিরন্তনতার উপর এবং শিল্পীর দেশকালাতীত দূরস্পর্শী

বিশ্বানুগ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। এবং যেখানেই এর ব্যত্যয় দেখেছেন দ্বিধাহীনভাবে তিনি তাঁর সমালোচনা করেছেন। 'কবিতা' আষাঢ় ১৩৪৭ সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'চোখের বালি' উপন্যাসের সমালোচনা করেন। 'চোখের বালি'কে তিনি "রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস" বললেও অভিযোগ করেছেন —

ক. বইটির গঠন শিথিল, অনেক স্থলেই ঘটনাগুলিকে নাটকীয় রূপে দেখানো হয়নি, অতি সরলভাবে বলে দিয়েই লেখক খালাস হয়েছেন।[১৫]

খ. চরিত্রগুলি সর্বদাই সাধুভাষায় কথা বলে।[১৬]

গ. আজকাল 'চোখের বালি' পড়তে-পড়তে বার বার আমাদের মনে হবে যে, লেখক উপন্যাসের টেকনিক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিত ছিলেননা, একটি গল্প তাঁর মনে এসেছিল এবং সে গল্প তখনকার প্রচলিত প্রথায় আদ্যোপান্ত বলেই তিনি নিজের দায়িত্ব মোচন করেছেন।[১৭]

ঘ. 'চোখের বালি'তে আছে একধরনের সমতলতা।[১৮]

ঙ. 'চোখের বালি' সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সবচেয়ে বড় আপত্তি হলো - " বইটির সমাপ্তি দুর্বল।"[১৯] বুদ্ধদেব মনে করেছিলেন এ গল্পের দুটি মাত্র পরিণতি হতে পারে —

> এক সম্পূর্ণ সর্বনাশ, আর তা যদি না হয়, বিনোদিনীর
> সঙ্গে বিহারীর মিলন।[২০]

কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে এর কোনোটিই হলো না, বিনোদিনী তাঁর সমস্ত জীবন - যৌবন বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে কাশী চলে গেল। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> বস্তুতঃ, বিনোদিনীর এই তুচ্ছ পরিনাম আমাদের মন কিছুতেই
> গ্রহণ করতে পারেনা, শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের আভ্যন্তরীণ
> উপাদান থেকে অনিবার্য ভাবে গড়ে ওঠেনি, ...।[২১]

বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন যে, চোখের বালি উপন্যাসে সারল্যের কারণ হল লেখকের সাত্ত্বিক স্বভাব। 'হস্তলিপিপুস্তকের নীতিবচনে'র সঙ্গে যে একজন ঔপন্যাসিকের নীতিজ্ঞান মেলে না আধুনিক আত্মসচেতন সমালোচক বুদ্ধদেব এই জায়গাটির উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। বিধবা বিনোদিনীর বিবাহের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কি-না নীতিশাস্ত্রগত এই কূট তর্ককে প্রশ্রয় না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি অভ্যন্তরীণ উপাদান থেকে গড়ে-ওঠা বিনোদিনীর পরিণামকেই অনিবার্য করে তুলতেন, তাহলে উপন্যাসটির সমাপ্তি সম্পর্কে এত বড়ো আপত্তি বুদ্ধদেব তুলতেন না। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে বিধবা বিনোদিনীকে কাশীবাসী করার পিছনে উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; নীতিশাস্ত্রের বিধানের প্রতিই লক্ষ্য রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ঔপন্যাসিকের নীতিজ্ঞান এবং শিল্পীর বিবেককে বলি দেওয়া হয়েছে নীতিশাস্ত্রগত বিধানের কাছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ অভিযোগ মেনে নিয়ে ছিলেন। কালিমপঙ থেকে (২৪ শে জুন, ১৯৪০) বুদ্ধদেব কে একটি চিঠিতে লিখেছেন —

> তোমাদের 'কবিতা'য় 'চোখের বালি'র সমালোচনার শেষ অংশে

যে মন্তব্য দিয়েছো, তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। 'চোখের বালি'
বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই আমি মনে মনে অনুতাপ
করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিৎ।[২২]

অর্থ্যাৎ, 'চোখের বালি'র সমাপ্তি কবির নিজেরও অপছন্দ ছিলো। হয়তো এজন্যই 'চতুরঙ্গে' দামিনী অন্যরকম হয়ে ওঠে।

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮ এ রবীন্দ্র রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসেরও সমালোচনা করেছেন। 'নৌকাডুবি' যে রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারায় দুর্বল রচনা তা সকলেই বলে থাকেন, এর অসংগতি গুলো খুবই স্পষ্ট বলে তিনি এর বিস্তৃত আলোচনা করেননি। কিন্তু নানা জায়গায় এর কথা তিনি এনেছেন। যেমন - 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থের অবতরনিকা অংশে। একে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারায় প্রক্ষিপ্ত বলে মন্তব করেছেন।[২৩] আবার কখনো বলেছেন যে এটি একটি কৃত্রিম রচনা।[২৪]

'কবিতায় রবীন্দ্র রচনাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মনে হয়েছে 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন —

কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো
বাড়াবাড়ি কথাটি সত্য।[২৫]

'বিসর্জন' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য —

বিসর্জন অনেকটাই ব্রাউনিঙের নাটকের মতো, সেখানে চরিত্র
চিত্র কিংবা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা লেখকের কবিত্ব
শক্তি তেই আমরা মুগ্ধ।[২৬]

তৃতীয় খণ্ডে 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

চিত্রাঙ্গদার প্রায় প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে রয়েছে লিরিকের
সদ্যোজাত সৌরভ।[২৭]

'চিত্রাঙ্গদা'য় এক ধরনের নিটোল সংহতির কথাও তিনি উল্লেখ করছেন —

নাচের মতোই অবাধ লীলায়িত গতিতে সমস্ত কবিতাটি
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে, নাচের মতোই এর নিটোল
অথচ সংযত সম্পূর্ণতা ...।[২৮]

এই নিটোল সংহতি তাঁর নাটক বা নাটকীয় কবিতা 'মালিনী' এবং 'বিদায় অভিশাপে'ও দেখা গিয়েছে।

'বিদায় অভিশাপ' পরিমিতি ও সঙ্গতির অনবদ্য দৃষ্টান্ত আর

'মালিনী'র সংহত শক্তি ও স্বল্পভাষী কাঠিন্য তো বাংলা
সাহিত্যেই অতুলনীয়।[২৯]

'মালিনী'র ভাষা 'স্বচ্ছ অথচ গম্ভীর'।[৩০] রবীন্দ্রনাথের কোনো পদ্য নাটকের ভাষা প্রাকৃতজনের মৌখিক ভাষর এতটা কাছাকাছি আসতে পারেনি। তাই বলাযায় রবীন্দ্রনাথে আছে একদিকে তাঁর গীতিধর্মিতা, উচ্ছ্বসিত কবিত্বশক্তি, অন্য দিকে আছে ভাষার স্বচ্ছ, সংযত সংহতি। শুধু নাটকেই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও লিরিকের প্রতি তাঁর এই দুর্মর পক্ষপাত ধরা পড়ে। 'পঞ্চভূতে'র প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

কিছু বর্ণনা, কিছু জল্পনা, ও কিছু খেয়ালের সঙ্গে মিশে এই
প্রবন্ধগুলির চিন্তাশীলতা ও সারবত্তা, এমন একটি মনোহর
চেহারা নিয়েছে যা আজ পর্যন্ত একটুও ম্লান হয়নি।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কেও বুদ্ধদেব তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন —

গদ্য তাঁর সর্বদাই কবিত্বময়, সর্বদাই আবেগবাহী, উপমায় ও
রূপকে অলংকৃত, ধ্বনিবিন্যাসে ঝংকৃত।[৩২]

তবে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পরিণতি, পদ্যের তুলনায় অনেক মন্থর বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩৩] কাব্যেদ্রুতএ প্রগতিশীল হলেও গদ্যে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত, নাটক ও পত্রগুচ্ছ ছাড়া রক্ষণশীলতার পথ ধরেই এগিয়েছেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধগুলি যে 'চিত্রা', শুধু নয়, 'কথা', 'কাহিণী' এমনকি 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্যে'র ও পরবর্তী একথা ভেবে তিনি অবাক হয়েছেন, কেননা,

এই দুটি সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও রচনাভঙ্গির দিক দিয়েও
সমগোত্রীয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যেন বঙ্কিম অঙ্কিত পথ মাড়িয়েই
তৃপ্ত ছিলেন, শুধু ভাষর দিকে নয়, চিন্তার দিকেও।[৩৪]

'আত্মশক্তি'র প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এ প্রবন্ধগুলিতে ভারতের যে পরিকল্পনা ফুটেছে, তা সম্পূর্ণ হিন্দু,
এবং অনেকখানি ফিউডল ভারত, কোনো কোনো বিষয়ে তা
আধুনিক গান্ধীবাদের সঙ্গে হুবহু মেলে। আবার কোনো-কোনো
বিষয়ে আধুনিক রবীন্দ্রবাদের সঙ্গে মেলেনা।[৩৫]

মেলেনা যে, তার কারণ, যে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত শাস্ত্র, আচারও অনুষ্ঠানের ঊর্দ্ধে মনুষ্যধর্মের সাধক, যাঁর লক্ষ্য শুধু সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল, যিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য নানাদেশ ঘুরে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র রচনা করেছেন, 'ভারত বর্ষ' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে —

এই রবীন্দ্রনাথকে স্বধর্মচ্যুত মনে হয়। কেননা, ভারতবর্ষের
যে ধারনা তিনি আমাদের মনে বদ্ধমূল করতে চান তা
ব্রাহ্মণশাসিত 'আর্য' ভারত ...। তিনি এটা ধরেই নিয়েছেন যে

প্রাচ্যভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে ... ।[৩৬]

বুদ্ধদেবের মতে, ভারত বর্ষের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে যত ধিক্কার দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটিই সঙ্গত; কিন্তু এই সভ্যতার যা প্রধান দান, আর্থ্যাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিরাট উৎপাদনী শক্তি, তা যে মনুষ্যজাতি কিছুতেই পরিহার করতে পারে না, প্রাচীন ভারতের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেছেন।[৩৭] এই জন্যই তাঁর মতে, 'ভারত বর্ষের' প্রবন্ধগুলি পড়ে

প্রত্যেক আধুনিক পাঠকের পক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন না করা অসম্ভব।[৩৮]

তিনি এই প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথের ঠিক স্বাভাবিক রচনা বলে মনে করেননি। একদিকে তখন কার নব্য বঙ্গযুবক, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি অংশের গোঁড়ামি, - এ দুয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় "এই অরৈবিক প্রবন্ধগুলির জন্ম দিয়েছিলো।"[৩৯] এই রচনাগুলিকে তিনি প্রতিক্রিয়াপ্রসূত রচনা বলে মনে করেন। স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এই বলে —

এই প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্র রচনাবলীর অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক একটি
অংশই জুড়ে রয়েছে।[৪০]

মানুষের মর্যাদা, মানুষের মুক্তির দাবিই রবীন্দ্র রচনায় ধ্রুবপদের মতো ঘুরে ফিরে এসেছে।

আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, তাঁর জ্বলন্ত বাণীই বঙ্গ ভাষীর
পক্ষে মনুষ্য ধর্মে প্রথম দীক্ষা।[৪১]

'কবিতা আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় 'নতুনবই' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'ছেলেবেলা'তে ও প্রাচীন বা সেকালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা টান স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

আধুনিক এই যুগ রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসেন না, চিরকালের
মতো হারিয়ে যাওয়া সেকালেই তাঁর মান প্রাণ বাঁধা। সেকেলে
সবই ভালো, একেলে সবই খারাপ, তাঁর এই মনের কথাটি
'ছেলেবেলা'য় লুকানো থাকেনি ... 'ছেলেবেলা'য় সেই সেকালেই
তিনি ফিরেছেন।[৪২]

'ছেলেবেলায়' রবীন্দ্রনাথ সেকালের গৌরব করেছেন। এই সেকালের গৌরব রোমান্টিক কবির অতীত চারিতার একটি লক্ষণ। তবু,এর একটি বিশেষ স্থান আছে বাংলা সাহিত্যে। কারণ —

১) এতে আছে গল্পের রস, রূপকথার জাদু, আছে তথ্য তারিখের ভারমুক্ত ইতিহাসের আত্মা।[৪৩]

২) বইটি কোনো প্ল্যানে বাঁধা নয়, এলোমেলো চলন, যখন যেখানে খুসি দেরি করা, পরের কথা আগে এসে গেলো তো গেলোই, অবারিত ছুটির হাওয়া আগাগোড়া বইছে।[৪৪]

৩) বইটির তৃতীয় বিশেষত্ব হল এর ভাষা। 'ছেলেবেলা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বইটি বালভাষিত গদ্যে লেখা। বুদ্ধদেবরে মতে,

এমন অদ্ভুত সহজ গদ্য বাংলা সাহিত্যে বোধহয় এর আগে
আর দেখাই যায় নি, কিন্তু এ গদ্য ঠিক 'বাংলাভাষিত' নয়,

বরং বলা যেতে আরে যে এখানে রবীন্দ্রনাথ basic বাংলার
প্রবর্তন করেছেন।[৪৫]

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৯ - আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায় 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেতিনি বলেন —

রচনাটি সাহিত্যিকের ও সাহিত্য সমালোচকের বার বার পাঠ।[৪৬]

আর, 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি সম্পর্কে লিখেছেন,

বিভিন্ন উপলক্ষে সাহিত্যের মূল সূত্রের আলোচনাই তিনি করেছেন।[৪৭]

অতএব এগুলিও সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকের পাঠ্য। 'চিঠিপত্র' সমালোচনা প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেব বক্তব্য হলো কবির জীবদ্দশায় তাঁর যত চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তা সবই সাহিত্যিক কারণেই মূল্যবান,[৪৮] চিঠিপত্রগুলি টীকা সম্বলিত হলে আরো মূল্যবান হতো। কারন,

উল্লেখের অভাবে অনেক ঠাট্টা মাঠে মারা গেছে।[৪৯]

'চিঠিপত্র' খণ্ড প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এটি পড়ে ওঠার প্রথম লাভ রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
নিবিড়তর পরিচয়, আর দ্বিতীয় - হয়তো মহত্তর লাভ এই যে
মাঝে মাঝে তাঁর গদ্যের লীলায় নতুন করে আমরা মন্দ্রিত হই।[৫০]

অবশ্য,

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে হালকা চাল যা, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'
থেকে ভানুসিংহের পত্রাবলী পর্যন্ত সম্মোহিত করে রাখে আমাদের -
সেই কৌতুকে কটাক্ষে ভাবুকতায় মেশা সাবলীলতার
চিহ্ন নেই এখানে,।[৫১]

তবুও বাংলা ভাষা ও বাংলা গদ্যের পরিণতির সূত্রে এগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং এগুলির সাহিত্যরসত্ত আস্বাদনযোগ্য।

সবশেষে একথা বলা যায় যে 'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় বুদ্ধদেবের মূল প্রসঙ্গ গুলির সংকলন করলে পাওয়া যায় -

১) রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা
২) উপন্যাসের মধ্যে নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন
৩) সাহিত্যের স্থায়িত্ব

বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চেয়েছেন, এগুলি মূলতঃ রবীন্দ্র উপন্যাসের, বা কথা সাহিত্যের স্থায়িত্বের কারন। এক হিসেবে, রবীন্দ্র কথা সাহিত্যের আনন্দ উৎস। তাঁর প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র গুলিও সাহিত্যিক করনেই যথেষ্ট মূল্যবান।

গ্রন্থভুক্ত রবীন্দ্র-সমালোচনা হিসেবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য' গ্রন্থটি। গ্রন্থের আলোচনা কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' এবং বিশেষ কয়েকটি উপন্যাসকে। যে উপন্যাসগুলি তাঁর মতে, কথাসাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করবে।

'অবতরণিকা' অংশটিকে বাদ দিলে, 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থের অধ্যায় আটটি। এই আটটি অধ্যায় হলো যথাক্রমে - 'কাহিনী ও রচনা', 'গল্পগুচ্ছ', 'গল্পগুচ্ছের রচনারীতি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', ও 'ঘরেবাইরে', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়'। এছাড়া, বইটির 'পরিশিষ্ট' অংশে সংযোজিত হয়েছে 'চোখের বালি', 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ', অমিয় চক্রবর্তীর লেখা 'শেষের কবিতা ও লাবণ্য' এবং বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'শেষের কবিতা ও অমিত রায়'।

'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'অবতরনিকা' অংশে কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার শুধুনয়, তাঁর উপন্যাস রচনারীতি, প্লট গঠন ইত্যাদি নিয়ে ও সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচক বুদ্ধদেব। গ্রন্থের 'অবতরণিকা' অংশটি এই জন্যই মূল্যবান যে এই অংশে প্রায় সমগ্র গ্রন্থটির একটি সূত্র রচনা করেছেন তিনি। আলোচনা করেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গল্প - উপন্যাসের শিল্প সফলতার দিকই নয়, ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিবর্তন বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এখানে পাই। চলিত ভাষার প্রবর্তনের প্রসঙ্গটি তো আছেই, এছাড়াও বুদ্ধদেবের বক্তব্য এইরকম —

> গদ্যে এতদিন সতর্কভাবে চলেছিলেন, যেন তারই ক্ষতিপূরণ
> স্বরূপ একেবারে নির্ভয় হলেন এবার। ... আরম্ভ করলেন
> ভাষা নিয়ে পরীক্ষা; ভাঙলেন, গড়লেন, ছেঁটে দিলেন,
> জুড়ে দিলেন।[৫২]

রবীন্দ্রনাথের ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের এই বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য লেখায় হাত দেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যজগতের একচ্ছত্র অধিপতি। যে কোনো সাহিত্যব্রতীর পক্ষে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথও পারেন নি। এ অধ্যায়ের শেষে বুদ্ধদেব এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পকার হিসেবে যতটা সফল ঔপন্যাসিক হিসেবে ততটা নন। বহুদিন পর্যন্ত বঙ্কিম প্রবর্তিত রক্ষণশীল পথ ধরেই তিনি চলেছেন। উপন্যাসের প্লট গঠনেও রবীন্দ্রনাথ তেমন কুশলী নন, বরং দুর্বল - একথাও তিনি বলেছেন।

> উপন্যাসের রূপের দিকেও বদল হলো।[৫৩]

বুদ্ধদেবের এ মন্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) প্রকাশিত হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকী প্লটপ্রধান উপন্যাসের মোহ কাটিয়ে উঠলেন। তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠলো বক্তব্যপ্রধান ও ভাবনির্ভর। সেই সঙ্গে শুরু করলেন কথাশিল্পের কলাকৌশল নিয়ে বিচিত্র করমের পরীক্ষা। পত্রাকারে গল্প, ডায়েরিধর্মী উপন্যাস, 'চতুরঙ্গে'র মতো অভিনব আঙ্গিকের উপন্যাস এবং 'শেষের কবিতা'র মতন বিশুদ্ধ গীতিময়তার সৌন্দর্যে পূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে এই যে নতুন নতুন নিরীক্ষা, এর মাধ্যমে তিনি খুঁজেছিলেন —

> উপন্যাসের এমন একটি রূপ, যা কবির স্বভাবের পক্ষে অনুকূল।
> তাঁর ভিতরকার কবিটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয়
> কথাশিল্পে, এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সচেতন না হোক
> অচেতন মনের লক্ষ্য।[৫৪]

তাই উপন্যাসের প্রথাবদ্ধ, গতানুগতিক ধরণাগুলি তাঁর পছন্দ হ'লো না - 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি মুক্তির পথ খুঁজলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি যেমন 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) কে আলোচনার অযোগ্য বলে মনে করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'চোখের বালি'র (১৯০৩) মতো পরিণত, মনস্তত্বমূলক উপন্যাসের পর রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি'র মতো কৃত্রিম প্লটনির্ভর উপন্যাস কিভাবে লিখলেন এ ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়েছে সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর কাছে। তাঁর মতে, 'নৌকাডুবি' হল "ঘটনাজটিল অসংগতি বহুল উপন্যাস।"[৫৫] রবীন্দ্রনাথ কখনো যে এ রকম বই লিখতে রাজি হয়েছিলেন, এ কথাটি ও তাঁর কাছে দুঃখজনক মনে হয়েছে।

কিন্তু, 'চোখের বালি' সম্বন্ধে তাঁর মত এই যে, অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিকতার দিকে পা বাড়ালেন। 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস। এখানে বাইরের দিক থেকে কৃত্রিমভাবে ঘটনা সাজানো হয়নি, মানুষের অর্ন্তলোকের গভীরে ডুব দেওয়াই এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পেরেছিলেন —

> মানুষের গহন মনে আলো ফেলতে।[৫৬]

মনের কারখানা ঘরে প্রবেশ করে, মানুষের আঁতের কথা কে বিশ্লেষণ করতে 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নিশ্চিত সফলতার আভাস। বঙ্কিম-শরতের সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল থাকলে ও, নরনারীর জীবনে ত্রিভূজ প্রেমের প্রস্ফুটন ও পরিণাম প্রদর্শনে এ উপন্যাসে বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবকে ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি সফল হন নি। তাঁর -

> স্বভাবে আর উত্তরাধিকারে যে - বিরোধ ছিলো, তার দুষ্ক্রিয়তার
> সবচেয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত 'চোখের বালি'র উপসংহার।[৫৭]

বিনোদিনী বিধবা। তাই তার সমাজনীতি-সঙ্গত শাস্তিপ্রদান করেছিলেন তাকে কাশী পাঠিয়ে। যেটা তখনকার দিনের বিধবাদের জীবনে ছিল প্রায় অবধারিত পরিণাম। বিধবার জীবনে প্রেমকে স্বীকৃতি দেবার সাহস ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাই,

তৎকালীন কানুনমতো কাহিনীটিকে সুগোলভাবে শেষ করতে[৫৮]
চেয়েছিলেন তিনি। বিধবার শাস্তিবিধান এবং কাহিনীর সমাজ অনুমোদিত উপসংহার - এই দুই -এর টানাপোড়েন 'চোখের বালি'র শিল্পগত সৌন্দর্যের ও সফলতার হানি ঘটিয়েছে। বুদ্ধদেব এক বলেছেন - "অপঘাত"।[৫৯]

আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাসে প্লটের ধারনা বদলালেও রবীন্দ্রনাথের সামনে আদর্শ হিসেবে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই 'বউঠাকুরাণীর হাট' বা 'নৌকাডুবি'তে আমরা পাই সেই ক্রমাগত কৃত্রিম উপায়ে প্লট বয়ন, অনাবশ্যক পাঠক-ভোলানোর জটিলতা। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব মনে করেছেন যে, এই যান্ত্রিক প্লট রচনায় খুব বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না রবীন্দ্রনাথ। যে উপন্যাসে তিনি প্লটের দাবি সবটুকু মিটিয়েও নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে বলতে পেরেছেন সে উপন্যাসটি হলো 'গোরা' (১৯১০)। যদিও এই উপন্যাসের গল্পাংশের সূচনাই একটি গাড়ির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তবু, বক্তব্যের দৃঢ়তায়, আন্তরিক অনুভবের গভীরতায় - প্লট এখানে তুচ্ছ হয়ে যায়, যা পাওয়া যায় তা নিছক প্লটের চেয়ে অনেক বেশী। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবি ও কথা সাহিত্যিক এই দুই সত্তার সমন্বয় ঘটেছে। এদিক থেকে 'গোরা' উপন্যাসটি একটি উজ্জ্বল আসন অধিকার করে আছে। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আলোচনায় কাব্যধর্মিতা আর প্লটমুখ্যতার এক দ্বিধান্বিত বিন্যাসের মডেল গড়েছেন। 'গোরা' তাঁর মতে, সেই দ্বিকোটির মধ্যবর্তী ভারসমতায় পৌঁছেছে। বিশেষ একটি দেশের বিশেষ একটি যুগের সম্পূর্ণ মর্মকথা এই গ্রন্থে প্রকাশিত। বুদ্ধদেব পরবর্তী কালে 'গোরা' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। এটি উল্লেখযোগ্য —

> কাল অসুখে শুয়ে বহুকাল পর 'গোরা' পড়ছিলাম - উপন্যাস
> হিসেবে খুব যে ভালো লাগছিলো তা নয়। কিন্তু দেখছিলাম
> যে ভারতবর্ষ বিষয়ে এমন কোনো চিন্তা নেই যা রবীন্দ্রনাথ
> ভাবেননি- আধুনিক ভারতের এমন কোনো সমস্যা নেই যা
> তাঁর চিত্তে প্রতিভাত না হয়েছিলো।[৬০]

'গোরা' উপন্যাসের গল্পাংশ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক চিন্তাধারার বাহন মাত্র নয়। তা হলে, এই উপন্যাসের মূল্য আজকের দিনে প্রয়ে কিছুই থাকতো না। কেননা,

> হিন্দু - ব্রাহ্মের বিরোধ আজকের দিনে অস্তিত্বহীন।[৬১]

'গোরা'র কোনো চরিত্রকে অস্পষ্ট বলে মনে করেন নি বুদ্ধদেব, হারাণবাবু, বরদা সুন্দরী, কৈলাস, হরিমোহিনী - এই গৌণ চরিত্রগুলিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রো উদ্ভাসিত। তাছাড়া, আনন্দময়ীর মতো প্রাণবন্ত চরিত্রও রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকটা দুর্বল ও নিষ্ক্রিয়। বঙ্কিমসাহিত্য নারীচরিত্র যতটা সক্রিয়, পুরুষ চরিত্রগুলি তুলনায় অনেকটা কর্মবিমুখ, তাদের কর্মজীবনের কোনো খবর আমরা জানতে পারি না। তাই, বুদ্ধদেব বসুর কথার সঙ্গে একমত হয়ে

বলা যায় যে গোরার মতো এরকম প্রবল পুরুষ চরিত্রও রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্লভ। সেকারনেই হয়তো

রবীন্দ্রনাথ গোরাকে শ্বেতাঙ্গতণয় করেছেন।[৬২]

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) ও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস দুটিও বুদ্ধদেব একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি এই দুটো উপন্যাসে অনেক সামান্য লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। উপন্যাস দুটি সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্যগুলির অধিকাংশই ভাষা এবং কারুকৌশল সম্পর্কিত। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' প্রথম বই

যেখানে উপন্যাসের পুরনো পদ্ধতি আর তাঁর যথেষ্ট বা
উপযোগী বলে মনে হলো না, নতুন পথ নিতে হলো।[৬৩]

সাধুভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' এবং চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস 'ঘরেবাইরে',। এই অমিলের মধ্যেও বুদ্ধদেব বসু একটি মিল দেখতে পেয়েছেন তা হল -

'চতুরঙ্গে'র সাধুভাষায় চলিত ভাষার অনেক গুণ বর্তমান, আর
'ঘরে বাইরে'র চলিত ভাষা অনেকাংশে সাধুভাষা।[৬৪]

'চতুরঙ্গে'র ভাষাকে নানাভাবে খেলাতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে শ্রান্ত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই এখানে ভাষা হয়েছে —

এমন স্বল্প ও চাপা যেন আগাগোড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলা,
কোথাও দম ফেলার জায়গা নেই।[৬৫]

আর 'ঘরে বাইরে'র ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —

অলংকারের এমন প্রাচুর্য যে কথাগুলি প্রায়ই বক্তৃতাঢঙের হায় পড়ে।[৬৬]

চতুরঙ্গের ভাষাকে তিনি বলেছেন 'ভূষণবিরল'[৬৭] আর 'ঘরেবাইরে'র ভাষাকে বলেছেন —

চলতে ফিরতে পায়ে মুক্তো ঠেকে।[৬৮]

নানা ত্রুটি সত্ত্বেও " 'ঘরে বাইরে' কে আধুনিক বাংলা গদ্যের একটি উৎস"[৬৯] হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইতোপূর্বে চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও 'ঘরেবাইরে' চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস তাই এতে কিছুটা আত্মসচেতনতা অনিবার্য ছিল। কিন্তু

একে তিনি নিয়ে গেলেন একেবারে সমারোহের উচ্চশিখরে।[৭০]

ভাষার ক্ষেত্রে এই আত্মহারা অবস্থা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কাটিয়ে উঠেছিলেন। তবুও একথা ঠিক যে ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে 'চতুরঙ্গ'ও 'ঘরেবাইরে'।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে বুদ্ধদেব দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি এক আধুনিক মূর্ত্তি। লিখেছেন -

আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়,
কিন্তু তারই কোনো সার্থক রূপান্তর যেন আমাদের কল্পিত
রবীন্দ্রযুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো, ...।[৭১]

উপন্যাসটির ভাষাই সবচেয়ে বেশী চমক সৃষ্টি করেছিলো

এর ভাষা গতিশীল, দ্যুতিময় বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে
এভাষা চোখে পড়েনি।[৭২]

তাঁর মতে বাংলাগদ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির মূলে অনেকখানি রয়েছে এই গ্রন্থের প্রভাব। 'ঘরেবাইরে'তে চলতি ভাষায় উপন্যাস রচনার যাত্রা শুরু। 'শেষের কবিতা'র পর থেকেই চলতি ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠলো সাহিত্যে। এই কারনে এই গ্রন্থকে "বাংলা গদ্যের মুক্তিদাতা"[৭৩] বলে উল্লেখ করছেন তিনি।

উপন্যাস হিসেবে দেখতে গিয়ে শেষের কবিতা সম্বন্ধে অনেকগুলি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বুদ্ধদেব —

ক) এখানে কবিত্বশক্তির আপপ্ররোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাসটির অনেক অংশ উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ সেখানে অকারণে কবিত্ব করেছেন। সংলাপকে করে তুলেছেন "পীড়াদায়ক"[৭৪] এতে আছে দশটি রীতিমতো কবিতা, গ্রন্থের পক্ষে এগুলির যাথার্থ্য স্বীকার করলেও "ভাষার মায়াজাল"[৭৫] সৃষ্টি করে কবিত্বশক্তির অপব্যবহার করা হয়েছে।

খ) রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে সংলাপের বিষয়ে যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাও উঠতে পারে শুধু শেষের কবিতা আর পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কে —

অমিত রায়ের বাক্যবন্ধে, রাবীন্দ্রিক দীপ্তিপাত শুধু স্বাভাবিক
নয় অনিবার্য বলে ধরে নেয়া যায় - নেয়া যেতো যদি না সে
মাঝে মাঝে তুচ্ছ কথাও জাঁকালো করে বলতে গিয়ে
অনুপাতবোধে ব্যাঘাত ঘটাতো।[৭৬]

গ) এই উপন্যাসের জন্য ভুল নায়ক নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৭৭]

অমিত রায় কথার কারিগর। কিন্তু ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে তার অন্তঃ সারশূন্যতা, তার বাগ্মিতার ফাঁপা আওয়াজ। তার নাবালক চরিত্র। উপন্যাসে এহেন অমিতের প্রভাব যথেষ্ট। বুদ্ধদেব তা মেনে নিতে পারেননি।

তাছাড়া, 'শেষের কবিতা'য় যে প্রেম-বেদনার সুর ছড়িয়ে আছে তা ও অমিত-লাবণ্যর কথাবার্তার মধ্যে লাগেনি। বলে তিনি মনে করেছেন। বরং এই সুর একটু খুঁজে পাওয়া যায় কেটির রঙ করা গালের উপর দেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলে। আর তাই তিনি বলেন যে

লাবণ্যের চেয়ে কেটি অনেক জীবন্ত, শোভন পালের চেয়ে
অনেক বেশি উজ্জ্বল নরেন মিটার, ...।[৭৮]

সমালোচক বুদ্ধদেবের এই সমালোচনাটিকে আমরা খুব একটা মেনে নিতে পারিনা। কেননা, প্রেম-বেদনার সুর যে শুধুমাত্র চোখের জলে মাপা যায় না তা আমরা সবাই জানি। আসলে, 'শেষের কবিতায় বুদ্ধদেব মূলতঃ গুরুত্ব দিয়েছেন এর ভাষা এবং শৈলীগত আলোচনার উপর। এদিক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভের অধিকারী। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এটি

সার্থক নয় বলে তিনি মনে করেছেন।

'দুইবোন' (১৯৩৩) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাস দুটি বুদ্ধদেব একই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। 'চতুরঙ্গ' ও ঘরেবাইরে'র প্রকরণগত মিলের কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চে'র সাদৃশ্যকে তিনি আরো ''দূরস্পর্শী''[৭৯] বলেছেন। দুটি উপন্যাসেই

প্রণয় ব্যাপারে অনেক বেশী সাবালক ভাব পাওয়া যায়।[৮০]

এর আগে 'চোখের বালি' ও 'ঘরেবাইরে'তে সামাজিক বিধি বিধানের কাছে সত্য বিসর্জিত হয়েছিলো। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী সর্বগুণে গুণান্বিতা হয়েও তার প্রেম শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি খোঁজে। আর 'ঘরে বাইরে'র বিমলা বাইরে বেরিয়েছিল বলেই তার যা পোড়ার পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বুদ্ধদেব বলেন যে 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভেবেই নিয়েছিলেন

হৃদয়ের উপর শাস্ত্রনীতিকে জয়ী হতে দেবেন না।[৮১]

আর তাই সামাজিক বেড়ি ভেঙ্গে বেড়িয়ে এলো নায়ক পুরুষ। অর্থ্যাৎ বুদ্ধদেবের সমালোচনায় আত্মভাবনার দর্পন একটা থাকছেই। প্রথম পর্বে তাঁর রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রনীতিকে হৃদয় বোধের উপর জয়ী করবেন স্থির করে উপন্যাস লিখেছিলেন। আর শেষ পর্বে এর উল্টোটা স্থির করে লিখেছেন। দুইক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে লিখেছেন। কোনো খানেই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নন। এই pre conceived idea নিয়ে লেখাকে সমালোচক তাঁর পছন্দমতো ভালোমন্দ বলতে পারেন।

দুটি উপন্যাসেই অনেক অসংগতির কথাবলেছেন বুদ্ধদেব। কামনার স্বার্থপরতাকে দৃঢ়চিত্তে অনুসরণ করতে গিয়ে -

'মালঞ্চ'কে তিনি করে তুলেছেন একটি নিষ্ঠুর কাহিনী।[৮২]

নীরজা চরিত্রটিও তাঁর কাছে

উৎকট অবিচারের দৃষ্টান্তস্থল।[৮৩]

যে কঠিন শাস্তির মধ্য দিয়ে নীরজার মৃত্য হলো, এজন্য কাহিনীর মধ্যে যে বাতাবরণ সৃষ্টি করা দরকার রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। নীরজার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কত সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে, সরলাকে পেয়ে সেই স্বামীই নীরজার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এরমধ্যে সামান্যতম দ্বিধাদ্বন্দ্বও স্থান পায়নি। আর তাই সমালোচক শ্রীবসুর মতে —

এখানে দ্বন্দ্বের অভাবে যথার্থ্যের ক্ষতি হয়েছে।[৮৪]

কিন্তু, 'মালঞ্চে'র বিষয় সমগ্র রবীন্দ্র জীবনে এবং রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাহিত্যে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে, আমরা জানি। 'জীবনস্মৃতি'তে পেনেটির বাগানে বাড়ির কথা আছে, এছাড়া, চন্দননগরের বাগান বাড়ির কথা আছে 'জীবনস্মৃতি, ও 'আত্মপরিচয়ে'। সাহিত্যে বাগান বাড়ি কখনো মানুষের মন কখনো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীকায়িত রূপকে বোঝায়। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'মনের বাগানবাড়ি' নামক প্রবন্ধে আমাদের প্রত্যেকের মনের এই বাগান বাড়ির কথা বলা হয়েছে। সে বাগান বাড়ি সকলের

জন্যে নয়, সে যাকে ভালোবাসে তাকেই ডেকে নেয়। বাগান হল নিজের হাতে তৈরী প্রকৃতি - সেখানে কোনো কদর্যতা নেই, সমস্ত তুচ্ছতা, দৈন্যকে আমরা অতিক্রম করতে পারি। 'বেশী দেখা ও কম দেখা' প্রবন্ধেও এই বাগানের কথা আছে। 'চোখের বালি'তে ও আছে এই বাগানবাড়ির প্রসঙ্গ যা বিনোদিনী ও বিহারীর সম্পর্কের দ্যোতক হয়ে যায়। বাগান নিয়েই গল্প গড়ে উঠেছে 'ব্যবধান', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি। এরই একটি পূর্ণ রূপ, আমরা দেখতে পাই 'মালঞ্চেও'। এখানে দুটি বাগান যেন এক হয়ে গেছে। একটি নীরজা ও আদিত্যের দাম্পত্য সম্পর্কের নন্দন কানন ছিল। নীরজার বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাগানকেও সে স্বামীর মতোই পরম মমতায় গ্রহণ করে। অধিক বয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাগানকেই সে সন্তানরূপে প্রতিপালন করে। কিন্তু সরলার সঙ্গে আদিত্যের সম্পর্কের সূত্র ধরে সেই বাগানকেও সে হারাতে বসে। তাই তার মনটি আগাছায় ভরে যায়। ক্ষুদ্র ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির জন্মনেয়, অন্যদিকে আর একটি বাগান হল সরলা ও আদিত্যের সম্পর্কের বাগান। যার জন্ম নীরজার অসুস্থতা থেকে তো নয়ই বরং আরো অনেক আগে থেকেই। সরলার সঙ্গে শৈশব থেকেই আদিত্যের পরিচয়, বাগানের পরিচর্যার সূত্রে তাদের মনের বাগান কখন গড়ে উঠেছিল তা তারা জানত না। নীরজার অসুস্থতার সূত্র ধরে - নীরজারই সন্দেহের কারণে এর মূলে টান পাড়ে। তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় অন্য চেতনা। খোঁজ পায় হারিয়ে যাওয়া বাগোনের গভীর জলের ঝাঁপসা গান্ধ। তারা দুজনেই অনুভব করে যে এই বাগানের গাছের শিকড় কত গভীর যা তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার ব্যর্থতা বিড়ম্বনায় কখনো হারাবার নয়। আর তাই একথা বলা যায় যে শুধুমাত্র নীরজার স্বাস্থ্যহীনতাই তাদের সম্পর্কের ভাঙন ঘটায় না, বরং সবশেষে নীরজার মৃত্যু ও এর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন চিন্ত াভাবনাই অনেক পরিমানে কাজ করেছে।

'দুই বোনে'র অসংগতি হিসেবে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, শ্যালিকা উর্মিলার সঙ্গে শশাঙ্কের প্রণয় মসৃণভাবে এগিয়েছে। যেন, তাদের কোনো পিছুটান নেই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। অথচ এতেও দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিলো। বুদ্ধদেবের মতে 'দুইবোন' 'মালঞ্চে'র তুলনায় বিশ্বাসযোগ্য। শশাঙ্ক উর্মিলার প্রেমপর্বের জন্য রবীন্দ্রনাথ খানিকটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন যে শর্মিলা মায়ের জাতের মেয়ে, আর উর্মিলা প্রিয়ার জাতের। তাই উর্মিলার জন্যে শশাঙ্কের মনে চাহিদা সৃষ্টি স্বাভাবিক ছিলো। আর উর্মিলাও শশাঙ্ককে মনে মনে পছন্দই করতো।

শশাঙ্ক-উর্মির প্রণয়বন্ধনে, তাই যথার্থ অনিবার্যতা আছে।[৮৫]

শশাঙ্ক একদিকে শ্যালিকার সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত, অন্যদিকে, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করতে সে আপিসঘরে স্ত্রীর ছবি টানিয়ে ফুল সাজিয়ে রাখে। স্ত্রী ও প্রেমিকার দ্বৈত টানাপোড়েনে শশাঙ্কের এই হাস্যকর উপস্থাপনার জন্যই 'দুইবোন' প্রানবন্ত হয়েছে। 'মালঞ্চে'র তুলনায় 'দুই বোনের বিশ্বাসযোগ্যতার কথা বলেও বুদ্ধদেব এখানে একটি ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 'দুই বোনে' শশাঙ্ক তার স্ত্রী শর্মিলাকে দেবীর আসনে বসিয়ে শ্যালিকার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে। শশাঙ্কের এই অবস্থাকে, বুদ্ধদেব 'ভাবালুতা'[৮৬] বলেছেন। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ও দুদিক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোনে'

এই ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে শর্মিলাকে দেবী বানিয়ে তুললেন।[৮৭]

এমনও হতে পারে যে, আধুনিক পাঠকের মানসিকতার কথা বিবেচনা করেই রবীন্দ্রনাথ শর্মিলার স্বামীকে প্রেমিকার হাতে তুলে দিলেন।

'চার আধ্যায়ে'র (১৯৩৪) সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু কারুকৌশল এবং বিষয়বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দুটি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাশাপাশি এমন জড়িয়ে আছে যে সেগুলিকে পৃথক করা দুরূহ। 'চার অধ্যায়' কে তিনি বলেছেন আগাগোড়া নাটকের চালে লেখা। চারটি অধ্যায়কে নাটকের চারটি অঙ্ক হিসেবেই দেখা যায়। এটি রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস হলে ও এর মধ্যে আখ্যান অংশ খুবই কম।[৮৮] এর বিষয় বস্তুতে যে উপাদান আছে তা নিয়ে নাটক বা উপন্যাস রচনা করা গেলেও রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য - এলা-অতীনের মরণান্ত ভালোবাসা দেখানো যা কিনা 'কচ-ও দেবযানী'র মতো কাব্যালাপে কিংবা 'ক্যামেলিয়া'র মতো গদ্য কবিতাতেই সম্ভব। তাই বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

> 'চারঅধ্যায়' বিষয়ে সত্য কথাটা এই যে, জিনিশটা কাব্য,
> 'শেষের কবিতা'র চেয়ে ও নিবিড় অর্থে তা-ই; কাব্য হিশেবে
> দেখলেই এর প্রতি বিচার হ'তে, পারে।[৮৯]

অন্য একটি কারণেও 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্র সাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তা হল - 'ল্যাবরেটরী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন "তার আর একটি উদাহরণ চারঅধ্যায়।"[৯০] 'চার অধ্যায়ে'র পাঠযোগ্যতার কারণ সন্ধান করে বুদ্ধদেব বসু এর কবিত্ব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ঘরেবাইরে'র সময় থেকেই এই কবিত্ব শক্তির জাগরণ ঘটে।

বুদ্ধদেব বসু নিজে কথাসাহিত্যের তুলনায় কবিতার স্থায়িত্বের কথা বলেছেন।[৯১] গদ্যও পদ্যের মধ্যে তাঁর পক্ষপাত পদ্য অর্থ্যাৎ কবিতায়। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ গুলির প্রাণশক্তি অফুরন্ত। এই প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ছন্দের অদম্য গতি থেকে। কবিতা তাঁর ছন্দের পাখায় ভর করে ইঙ্গিতময় ভাবমণ্ডলে ভ্রমন করে চিরকালটাকে জয় করে নেয়।[৯২]অন্যদিকে, ঔপন্যাসিক, কথাসাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সংগ্রহ করেন। সমাজব্যবস্থা যেহেতু অবিরতই পরিবর্তিত হচ্ছে তাই আজকের দিনে যাকে অভিনব ও কৌতূহলের বিষয় মনে করা হয়, কিছুদিন পর তাতে আর আগ্রহ বজায় থাকে না। অর্থ্যাৎ, বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য আলোচনায় চিরন্তনতার উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কোনো রচনা স্থায়িত্বের মর্যাদা পেতে পারে যদি লেখক তার দেশকাল থেকে উপাদান আহরণ করেও সেই দেশকালকে অতিক্রম করতে পারেন। অর্থ্যাৎ, রচনা যেখানে নিজের কালকে আশ্রয় করে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখানেই তার শিল্পগুণ।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের গল্প আলোচনা করতে গিয়ে কবিতা আর গল্পের পার্থক্য দেখিয়েছেন। সেখানে, একদিকে দেখা যায় ভাবের প্রাধান্য, সেটা কবিতার রাজ্য। আর যেখানে যাকে চলতি কালের জীবনের বৈচিত্র্য সেটা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্র। এই চলতিকালের জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি খুঁজেছেন চিরকালের সম্পদ। এই ভাবে সমালোচনায় গল্প, উপন্যাসকে কবিতা থেকে আলাদা করেও

তাকে কবিত্বের ধর্ম থেকে, বাইরে রাখেন নি। গল্প উপন্যাসে চাই চিরকালের বাণী। আর সেই চিরকালের বাণীর সম্পদ কবিতার ভাবের জগতের সম্পদ। কবিতার সঙ্গে গল্পকে এইভাবে পৃথকীকৃত করে তিনি গল্পের স্থায়িত্বের নতুন বৈশিষ্ট্য সন্ধান করেছেন। তার প্রথম বৈশিষ্ট্য সে সমকালের জীবনের উপরে স্থায়ীকালের ভাবধর্মকে ফুটিয়ে তুলেছে। আর তার দ্বিতীয় গুণগত বৈশিষ্ট হল সে প্রকৃতির পটে মানব জীবনের চিরন্তনতাকে উত্থাপন করেছে।

কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে ও তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরেবাইরে' - প্রভৃতি কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ এই চিরকালীন আবেদনের খদ্ধ, বিশ্বমানবিক পটভূমিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর যেখানে এই চিরকালীন আবেদনকে তিনি মূল্য দেননি, কথাসাহিত্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ও সেগুলি সার্থক হতে পারেনি। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্প গুলি

> বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণপূর্ণ অম্লানতার স্পর্শ পেয়েছে।[৯৩]

প্রকৃতির মধ্যে যে "অজেয়জৈব শক্তি"[৯৪] আছে গল্পগুলিও যেন সেই শক্তি থেকেই উৎসারিত। প্রকৃতি যেমন পুরনো হয় না, এই গল্পগুলোও তেমনি। 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্প থেকে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন যে প্রকৃতি সেখানে কিরকম সচল, সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। যেমন - 'মেঘও রৌদ্র' গল্প। এখানে বারে বারেই এসেছে —

> বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানব জীবনের
> ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক ঘটনা বিক্ষোভের প্রতিতুলনা।[৯৫]

ব্যাপ্ত বিশ্বের পটভূমিতেই গল্পগুচ্ছের প্রকৃতি ও মানব চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিক অনুভূতি হয়েছে বিশ্বজাত। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পেও

> ব্যক্তিগত শোক বিশ্বশোকে রূপান্তরিত হয়েছে।[৯৬]

রতনের শোককে মাটির পাত্রে জল পড়ার মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছেন লেখক। এখানে রতনের বেদনার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বচরাচরের বেদনা যেন এক হয়ে গেছে। প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি এখানে অভিন্ন। প্রকৃতিই যেন আবহমান মানব প্রকৃতি। 'গল্প গুচ্ছে'র আরো অনেক গল্প ও গল্পাংশ উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন প্রকৃতি সেখানে জীবনের অংশ, গল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রকৃতিকে অবস্থান করেই 'গল্প গুচ্ছ' বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির বাণীরূপ তুলে ধরতে পেরেছে।

> সমগ্র 'গল্পগুচ্ছে'র ভিতরে এই বিশ্বজীবনের আভাস ব্যাপ্ত
> হয়ে ছড়িয়ে আছে, কখনো প্রছন্ন কখনো প্রকাশিত,
> কখনো তার ঈষৎ ছোওয়া লাগে।[৯৭]

বুদ্ধদেব বসু 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলিতে প্রধনাতঃ যা লক্ষ্য করেছেন তা হল এর বাস্তবগ্রাহ্যতা। নদীস্রোত থেকে আরম্ভ করে বাঁশবন, চণ্ডীমণ্ডপ, ভয়, লজ্জা, হাসি, কান্না সমস্তই যেন গ্রামবাংলা থেকে উঠে এসেছে। আর তাই, গল্পগুলি আজও প্রাণের বেগে স্পন্দমান, যেন

আমাদেরই জীবন প্রবাহ তাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।[৯৮]

অথচ রবীন্দ্রগল্পের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে এযুগের গল্পের নায়ক-নায়িকাদের বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রগল্পের নায়ক-নায়িকারা

এক দেশকালাতীত ভাবলোকের অধিবাসী[৯৯]

তা সত্ত্বেও তার গল্পকে অবান্তর বলে মনে হয় না। বরং জীবনঘনিষ্ঠ ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। 'গল্প গুচ্ছে'র আট অথবা তেরো বছর বয়সের নায়িকার কার্যকলাপ অস্বাভাবিক নয়, তুলনায় শেক্সপীয়রের নায়ক নায়িকারা অনেক সময়েই স্বাভাবিকতার বাইরে গিয়ে আচরণ করে। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন —

'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' পড়বার সময় তাকে আমরা নিতান্ত বালিকা বলে সবসময় অনুভব করি না।[১০০]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ী —

... প্রকৃতই বালিকা, সে ব্যবহার জানে না, কথা বলতে জানে না,
মনের ভাব সে লুকোতেও জানে না। ... অথচ প্রেম এসে নিজের
অজান্তেই তাকে যখন ধীরে ধীরে যুবতী করে তুললো,
তার সেই রূপান্তরিত মূর্তিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রেমিকাকেই
আমরা দেখতে পেলাম।[১০১]

ফলে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির চিরকালীনত্ব স্বীকার করতেই হয়। বর্তমান যুগও জীবনের আচার, আচরণ, ব্যবহার প্রভৃতি নানাদিক থেকে তাদের কিছুটা বিসদৃশ মনে হলেও মোটের উপর তারা মানব প্রকৃতির আন্তর্নিহিত সত্যকেই উদ্ঘাটিত করে। তাই আপাত বৈষম্যকে ছাড়িয়ে তাদের যাবতীয় জীবনানুভূতিকেই যথাযথ মনে হয়। আর তাই বুদ্ধদেবের বক্তব্য —

এই যাথার্থ্যের অনুভূতিটাই আসল জিনিশ। এটা যখন আমাদের
মনে সংক্রামিত হয়, তখন গল্পে বর্ণিত জীবনের সঙ্গে আমাদের
জীবনের আচার ব্যবহারের বৈষম্যে কিছু এসে যায় না।[১০২]

'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতিতে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। যেখানে বিশেষত্ব ফুটেছে, বুদ্ধদেব সেগুলির উল্লেখ করেছেন পৃথকভাবে —

ক) 'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি সরল ও সুমিত, কোথাও জমকালো নয়
... সব মিলিয়ে গল্পগুলি 'শাস্তি' গল্পের ছিদামের দেহের মতো,
একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায় ;
এই গুণটির আমরা নাম দিতে পারি সাত্ত্বিকতা।[১০৩]

উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন 'নষ্টনীড়', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'শাস্তি' গল্পের বিশেষ অংশ। যেখানে কত সুমিত বাকবিন্যাসে গল্পের চূড়ান্ত কথাটি বলে দিতে পেরেছেন তিনি অনায়াসে।

খ) এতে গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিও লক্ষ্য করা যায়।

সাধু থেকে চলিত ভাষায়, ঋজু থেকে বঙ্কিম ভঙ্গিতে, সরলতা
থেকে সমৃদ্ধ কারুকলায়-বিবর্তনের সবগুলো ধাপই
... চিহ্নিত হয়ে আছে।[১০৪]

গ) গল্পগুলোর ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —

উপমার যথার্থ্যে, বর্ণনার বাস্তব ঘনতায়, এখানে একটি সুন্দর
সৌষম্য অনুভব করি — উঁচু নীচু নেই, ... শুধু কাহিনীকে
এগিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।[১০৫]

ঘ) 'গল্পগুচ্ছে'র বিশেষণ ও উপমা ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

গল্পগুচ্ছে বিশেষণ ও উপমা সুপ্রচুর, কিন্তু তাদের একটিও অনর্থক নয় ;
বিশেষণগুলি অর্জুনের তীরের মতো লক্ষ্যভেদী ...।[১০৬]

যেমন 'ছুটি' গল্পে ফটিকের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি বিশেষণ পর-পর ব্যবহার করেছেন,

কিন্তু একটিও বেশী হয় নি, কিংবা কোনোটিই অন্য
কোনো একটির আংশিক পুণরুক্তি নয়, প্রত্যেকটি
স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয়।[১০৭]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস শিল্পগতভাবে দুর্বল। প্রথম থেকেই বঙ্কিমের অনুগামী। কিন্তু ছোটগল্পে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন, নিজের স্বাধীন পথ খুঁজে পেলেন। সমস্ত 'গল্পগুচ্ছে'র উপাদানে একমাত্র 'মহামায়া' গল্প ছাড়া আর কোথাও বঙ্কিমের অনুগামিতা নেই।

'পোষ্টমাষ্টার', 'একরাত্রি'র মতো গীতিধর্মী গল্প তো তিনি লিখলেনই - 'দুরাশা', 'দৃষ্টিদান', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি সাহিত্যগুণান্বিত নিটোল ছোটগল্পে অবশ্য

প্লটের উগ্রতাকে তিনি ক্রমশ ঃ আপন মানসরসায়নে
নমনীয় করে আনলেন, তার সঙ্গে মেশালেন মনস্তত্ত্ব,
কবিত্ব, জীবনদর্শন।[১০৮]

প্লটের যান্ত্রিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবিক মানসিক প্রবণতার একটা বিরোধ ছিল বলে মনে করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর এওমনে হয়েছে যে, 'গোরা' উপন্যাসে এই বিরোধের শুভ পরিণয় ঘটেছে। কিন্তু গল্প রচনার ক্ষেত্রে এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর প্রতিভাকে পীড়ণ করেছে, কোনো কোনো গল্পকে অখণ্ডভাবে রূপায়িত হতে দেয়নি। 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'সমাপ্তি'র মতো গল্পকে তাই অনেক সমালোচকের মতো বুদ্ধদেব বসুর মনে হয় নড়বড়ে, যেন গাঁটে গাঁটে ভাগ করা যায়। বেশ কিছু গল্পের উদাহরণ দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'শুভদৃষ্টি'কে তাঁর মনে হয় নিছক প্লটের গল্প। আবার 'সদর ও অন্দরের' মতো বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বের গল্পকেও তাঁর মনে হয়েছে গল্পের খসড়া মাত্র। কিন্তু, প্লটের উচ্চতম লক্ষ্য যে রহস্যঘনতা, তাকেও রবীন্দ্রনাথ অবহেলা করেন নি। তাঁর 'মাষ্টারমশাই' আর 'মণিহারা' গল্পে

ঘটনার উত্তেজনা আর জীবনের ব্যঞ্জনা মিলেমিশে এক হয়েছে।[১০৯]

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্লটের উপর তর্কাতীত কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু, সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, এর পরেও রবীন্দ্রনাথের আরও একটি ধাপের প্রয়োজন ছিল। যা না হলে রবীন্দ্র প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হতে পারতো না। বুদ্ধদেবের মতে, 'কাবুলিওয়ালা' ও 'নষ্টনীড়' এরকম সুসম্পূর্ণ রচনার নিদর্শন।

বুদ্ধদেব বসু 'গল্প গুচ্ছে'র গল্পগুলি পড়ে তাঁর মনের ভালোলাগার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার, এর পাশাপাশি ভালোলাগার কারণগুলিও খুঁজেছেন। তাঁর মতে, 'গল্পগুচ্ছে'র আবেদন কোনোদিন শেষ হবে না, কারণ - গল্পযোগ্য অন্যান্য গুণের সঙ্গে এখানে মিশে আছে আরও কতগুলি বিশেষত। যেমন - ১) চিরন্তনতা, ২) বাস্তবতা, ৩) প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্তি এবং ৪) কাব্য ধর্মিতা।
এই বৈশিষ্ট্যগুলিই 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলিকে চিরনূতন করে রেখেছে।

শুদ্ধশিল্পবাদী বুদ্ধদেব রবীন্দ্র রচনার ক্ষেত্রে যা কিছু বিশুদ্ধ লিরিক্যাল, গীতিময়, ব্যক্তিগত ভাবনার ছন্দে স্পন্দিত দেখেছেন তাতেই আকৃষ্ট হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। প্রায় ঐন্দ্রজালিক ভাষাশিল্পে তিনি এর বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সঙ্গে মিশেছে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ঝক ঝকে গদ্যশৈলী। তাঁর লেখার সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে বিশ্বসাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন এক উজ্জ্বল মনস্বিতা। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' নিবন্ধটিতে তাঁর এই মনোলোকের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা। নিবন্ধটি সুরু হয়েছে এই ভাবে -

> রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো ; তাঁর গদ্যের গুণ
> কবিতারই গুণ ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই
> গদ্যের উপঢৌকন।[১১০]

এখানেই প্রবন্ধের সমালোচনা কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়েও তিনি বলেছেন —

> সাহিত্য ব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা
> তার অনুগামী মাত্র;[১১১]

এই নিবন্ধটিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রায় সব কটি মূল সূত্রই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। যাকে আমরা কবির হাতের প্রবন্ধ বলে থাকি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যেন তাই।

> যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে
> ওঠে তার স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ এক কথায় তাঁর
> ব্যক্তিস্বরূপ। অর্থ্যাৎ প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় বলে
> আমরা জানি - অন্তত পক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হয়ে থাকে -
> তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তা-ই।[১১২]

প্রবন্ধ রচনায় যা দোষ বলে গণ্য হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সেগুলি গুণ।

যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প; যেখানে
পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায় সেখানে
তিনি তীক্ষ্ণ করে তোলেন তাঁর ইন্দ্রিয় গুলিকে। যেখানে বুদ্ধির
কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি আইনিভাবে আমাদের
হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন।[১১৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব এরকম মূল্যায়ণ-ই করেছেন।

। খ ।

কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের চিন্তা বহুদিনের। নানা সূত্রে সেগুলি গ্রথিত হয়ে 'কবিতা'র বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। তবু সেই রচনাগুলির মধ্যেও যেন তাঁর মতাদর্শের সম্পূর্ণ সুগ্রথিত রূপ ফুটে ওঠেনি। তবে কবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র অন্বেষণ তাঁর রবীন্দ্র কবিতা বিচারের মূল জিজ্ঞাসা। একটি সূত্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যমহত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান এর মূল কথা। আর, এখানে তিনি বিচ্ছিন্ন কাব্য বিশ্লেষণ করে তাঁর মতাদর্শ ব্যাখ্যা করেন নি। বরং, পৃথক পৃথক ভাবে কবিতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ণ করে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র কবিতা বিচারের একটি অংশ পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। যার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে তাঁর নিজেরই সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় (১৯৩৫) প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর ধারাবাহিক আলোচনা। এছাড়া, 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধ গুলিতেও রবীন্দ্র সাহিত্যের নানাদিকের পর্যালোচনা করেছেন তিনি। বিরুদ্ধবাদীদের রবীন্দ্র সমালোচনার উত্তরও দিয়েছেন বুদ্ধদেব। যে সব সাময়িক পত্র রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতো যেমন সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' - তাদের যথোচিত প্রতিবাদও করেছেন ঐ 'কবিতার'ই পাতায়।

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে গজেন্দ্র কুমার মিত্র সম্পাদিত 'সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এই বইতেই আছে বুদ্ধদেব বসুর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা'। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' ছাড়া ও আছে 'খেয়া', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা', 'শিশু' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা।

'কবিতা পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকলে তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে শুরু করে একের পর এক রবীন্দ্র-কবিতার সমালোচনা লিখেছেন। এইসব সমালোচনাতে তিনি মূলতঃ গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্র-কবিতার আঙ্গিকের উপর। আঙ্গিকের অভিনবত্বের-কথাই ঘুরে-ফিরে এসেছে বুদ্ধদেবের সমালোচনায়। বুদ্ধদেবের বক্তব্য —

তাঁর হাতে রীতি কখনো মুদ্রাদোষে অধঃপতিত হয় না, কেননা একটি
রীতি একবারের বেশি তিনি ব্যবহার করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি

কাব্য গ্রন্থ রীতিতে ও বিষয় বস্তুতে স্বতন্ত্র। ... রবীন্দ্রনাথকে
কখনো আত্ম - অনুকরণের দোষ স্পর্শ করেনি।[১১৪]

তাঁর আর একটি বক্তব্য —

সাহিত্যের অজস্র রূপ ও রীতি, ভঙ্গিও সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন,
উদ্ভাবন করেছেন আঙ্গিকের অফুরন্ত কলাকৌশল, যা অবলম্বন
করে বাংলাসহিত্য আজ ভারতের সীমান্ত - পেরিয়ে বিশ্বের সাহিত্য
অলকায় নিজস্ব মর্যাদার দাবি রাখে।[১১৫]

রবীন্দ্র রচনাবলী সমালোচনার সূত্রে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'মানসী', 'সৌনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা', প্রভৃতি কাব্য একক ভাবেও আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। এবং তখনও তিনি কারুকৃতির উপর-ই জোর দিয়েছেন বেশি। 'মানসী'র কবিতাগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন —

তিন মাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরের যথার্থ ও বিচিত্র ব্যবহারের উদাহরণ
তিনি দেখালেন - উন্মুক্ত করলেন বাংলা কবিতার একটি বিরাট
সম্ভাবনার দরজা।[১১৬]

বুদ্ধদেবের মতে,

সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যের মূল বিষয়গুলি 'মানসী' তে লভ্য[১১৭]

এবং, তাঁর হাতে যেসব ছন্দ কখনো বীণা, কখনো শঙ্খ হয়ে মধুর
কি গম্ভীর সুরে বেজেছে।[১১৮]

'সোনারতরী' সম্পর্কে লিখেছেন —

এ কবিতাগুলির আলোচনায় কবিত্বশক্তির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও
নিছক ছন্দের নৈপুণ্য, কবির virtuosity -ই পদে পদে আমাদের
মুগ্ধ করে।[১১৯]

'সোনারতরী' তে উল্লেখযোগ্য হ'লো,

বিজোড় - মাত্রার ছন্দে কবির আধিপত্য বিস্তার।[১২০]

বুদ্ধদেব মনে করেন,

'সোনার তরী'র পরে রবীন্দ্রনাথ নতুন ছন্দ আর উদ্‌ভাবন করেননি।[১২১]

"চিত্রা" কাব্যসমালোচনায় বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা - সম্পর্কিত তর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। রচনাবলীতে (৪র্থ খণ্ডে) 'চিত্রা' কাব্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এসম্পর্কে উল্লেখ করেছেন -

বস্তুত 'চিত্রা'য় জীবনরঙ্গ ভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ
হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই
এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।[১২২]

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় বুদ্ধদেব রবীন্দ্র নাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, শুধু কি কবিতা লেখায় একজন কর্তা কবিকে আতিক্রম করে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন ? এমন নয়া। বরং যে জীবন গঠিত হচ্ছে, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ নিয়ে যিনি জীবনকে রচনা করে চলেছেন, তাঁকেই কবি তাঁর কাব্যে জীবনদেবতা নাম দিতে চেয়েছেন।[১২৩] বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> জীবন দেবতার এর চেয়ে প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা অসম্ভব।[১২৪]

তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন আরো কয়েকটি কথা - রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার অন্তর্গত "দ্বিত্বের অনুভূতির"[১২৫] সঙ্গে তিনি ইউরোপের কবি ডি. এইচ. লরেন্স ও ইয়েটসের কবিসত্তার তুলনা করে বলেন -

> ইয়েটস্ যাকে বলেছেন Mask বা Anti-self, লরেন্স যাকে
> বলেছেন ghost বা Demon, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী কি
> জীবনদেবতাও তা-ই।[১২৬]

আবার, 'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ডের সমালোচনা - সূত্রে "চৈতালি", "কল্পনা" এবং "কাহিনী"র নাটকীয় কবিতাগুলি নিয়ে বুদ্ধদেব আলোচনা করেছেন পৃথকভাবে। এখানেও আলোচনা মুখ্যতঃ আঙ্গিকের উপর। "কাহিনী"র অন্তর্গত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> পদ্যে চলতি ভাষায় ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের হাতে এই প্রথম -
> ... বাংলা কথোপকথনের বিশুদ্ধতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বজায়
> রেখেও যে নিখুঁত পদ্যের ছাঁচে ঢালা যায়, তা রবীন্দ্রনাথ
> এখানেই প্রথম দেখালেন।[১২৭]

'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'কবিতা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আলোচ্য কাব্যগুলি হলো - ক) 'বীথিকা', খ) 'পত্রপুট', গ) 'শ্যামলী', ঘ) 'খাপাছাড়া', ঙ) 'নবজাতক', চ) 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' ছ) 'জন্মদিনে' জ) 'ছড়া', ঝ) 'শেষ লেখা'। 'কবিতা' ঃ প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪২, 'নতুন কবিতা' শিরোনামে পুস্তক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা' কাব্যের সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'বীথিকা'র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

> রবীন্দ্রনাথ যেন রূপকথার কবি, তার চিরন্তন যৌবন।[১২৮]

'কবিতা' দ্বিতীয়বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৩-এ নতুন কবিতা, শিরোনামে 'পত্রপুট' এর সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মনে হয়েছে, 'শেষ সপ্তকে'র রচনাগুলি তত্ত্বমুখী, কবির গভীর ও জটিল চিন্তাপ্রসূত।

কবিতাঃ দ্বিতীয়বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৩-এ 'শ্যামলী' কাব্যের আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে 'শ্যমলী'র কোনো কোনো কবিতা নাটকীয় কবিতা যেখানে আছে আমাদের পরিচিত জীবনের

ছোট ছোট ছবি আর

গদ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটা খুব বেশি করেই এইদিকে।[১২৯]

'শ্যামলী' কাব্যটিকে বুদ্ধদেব একটি আধুনিক কাব্য হিসেবেও দেখেছেন। এর সমস্যাকে তিনি - 'আধুনিক' বলেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছে 'শ্যামলী' কাব্যে।

'কবিতা' ঃ তৃতীয়বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৫-এ 'নতুন কবিতা' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' ও 'সে' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'খাপছাড়া' কে তিনি বলেছেন -

মহাকবির অবসরের ফুলকি।[১৩০]

তাঁর মতে এটি গদ্যে-পদ্যে মেশানো 'গল্পসল্পে'র পূর্বসূরী। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোলে'র সঙ্গেও 'খাপছাড়া'র তুলনা করেছেন তিনি।

'কবিতা' - আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭ -এ 'নবজাতক'-এর পুস্তকসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের অস্বাক্ষরিত সমালোচনা এটি। 'নবজাতকে'র কবিতাগুলির দুটি বিশেষত্বের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। প্রথমতঃ কবিতাগুলিকে তিনি 'স্বল্পভাষী' বলেছেন।[১৩১] অলংকার বর্জন করে, কোনো আপাত চমৎকারিত্বের আশ্রয় না-নিয়ে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব - তাদের বিষয় বস্তুতে। কতগুলি আধুনিক বিষয় কবিতাগুলিতে স্থান পেয়েছে।

কবিতাগুলি সবই বিশ শতকের যন্ত্র সভ্যতাপীড়িত মানুষের
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা।[১৩২]

আধুনিক জীবনের বাস্তবদিক সম্বন্ধে এখানে কবি সচেতন।[১৩৩]

'কবিতা', রবীন্দ্র সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮ এ (৮ই মে, ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের 'নতুন কবিতা' শিরোনামে বুদ্ধদেব 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, -

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই বই দুটির বিশিষ্ট স্থান
আছে। তাঁর কারন প্রধানত আঙ্গিকের। কবিতাগুলি ক্ষুদ্র ও
সংহত এবং এহিসেবে রবীন্দ্রনাথের মূল কাব্যশরীর থেকে
একটু স্বতন্ত্র।[১৩৪]

'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্যে'র কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করে বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চেয়েছেন —

তাঁর মতো সুক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন দুর্লভ, অতএব তাঁর মতো
সমাজসচেতন, সময় সচেতন কবিও দুর্লভ। ... আজ এই
বয়সেও তাঁর বৈরাগ্য আসেনি, এখনো বিশ্বের সমস্যা নিয়ে
মানুষের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে তিনি ব্যাকুল।[১৩৫]

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায় 'মৃত্যুর কবিতা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে' কাব্য গ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনা পাওনা যায় সম্পাদকীয় অংশে। পৌষ ১৩৪৮ সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র সমালোচনা। 'কবিতা' ৭ম বর্ষ ; আশ্বিন ১৩৪৮ - আষাঢ় ১৩৪৯-এ রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র সমালোচনা করে বুদ্ধদেব লেখেন —

> সাহিত্যের যে-সব তত্ত্বের সাহায্যে আমরা কাব্যবিচার করি,
> তার কোনোটিই যেন এখানে খাঁটে না। কাব্যকলার সকল
> বিশ্লেষণ এ ছড়িয়ে যায়।[১৩৬]

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যে বইটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা পাই, সেটি হ'লো 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩)। বইটিতে দুটি ভাগ আছে। সঙ্গ নিঃসঙ্গতা এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিভাগে "বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গঃ মানসী" নিবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-কবিতা মূল্যায়ণের সূত্রপাত। সে হিসেবে এ বইটির আলাদা গুরুত্ব আছে। এছাড়াও এ গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের উপমা' নামক নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপমার ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'Tagore : portrait of a poet' বইটির প্রথম সংস্করণ ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে ভারবি প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেন 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের প্রথম পূর্নাবয়ব আলোচনাগ্রন্থ এটি। গ্রন্থটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলি হ'লো যথাক্রমে - 'কবিতার সাতসিঁড়ি', 'কান্তা ও কবিতা', 'দেবতা ও বধূ', 'এপার-ওপার' এবং 'ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ' শেষের প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে পৃথক ভাবে। অর্থাৎ, একে বইয়ের অন্তর্গত আরেকটি বিভাগও বলা যায়।

'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য, (১৯৫৫) গ্রন্থের শুরুতে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন - রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমালোচনার মতো

> বিরাট বিষয়ের সমকক্ষ হ'তে আমার দেরি আছে।[১৩৭]

১৯৬৫ সালে 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সেই সমকক্ষতা তিনি হয়তো অর্জন করেছেন। কারন , 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি শুধুমাত্র রবীন্দ্রকবিতার -ই বিশ্লেষণ। এই একটি বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে তাঁর সমগ্র বক্তব্যকে সংহতকরবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে মৌলিক চিন্তার প্রকাশে 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'An Acre of Green Grass' এর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক নিবন্ধটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। 'সঙ্গ নিঃ সঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ', গ্রন্থটির অন্তর্গত 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ ঃ মানসী প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি লিখেছেন—

> কলাকৌশলে, এবং ভাব বস্তুতেও 'মানসী'কে রবীন্দ্র কাব্যের
> অনুবিশ্ব বলা যায়।[১৩৮]

মূলত ঃ 'কবিতা', পত্রিকার রবীন্দ্রসমালোচনার বাইরে এসে যখন বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন, তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' বইটি। শ্রী শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন

'মানসী'র উপর এতটা ভর করবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নির্দিষ্ট
হয়ে গেল তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনার পথ। এরপর এটা যেন
প্রত্যাশিতই ছিল যে, 'কবি রবীন্দ্রনাথ' এর আলোচনায় তাঁর গণ্ডী
তৈরী হবে 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত।[১৩৯]

'মানসী'তে ছন্দ ব্যবহার সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় "বাংলা কবিতার স্বপ্ন ভঙ্গ ঃ মানসী" প্রবন্ধটিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, ছন্দের যুক্তবর্ণের যথার্থ ও বিচিত্র ব্যবহারের উদাহরণ দেখালেন তিনি। তাঁর নিজের ও সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেন তিনি। 'রবীন্দ্রনাথের উপমা' নামক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপমার ব্যবহার বিষয়ে বুদ্ধদেবের মূল্যবান মতামত ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে 'উপমাশিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন —

রবীন্দ্রনাথ উক্তি প্রধান কবি উপমা-প্রধান নন।[১৪০]

অথচ, উপমা ও কবিত্ব যে সহবাসী বুদ্ধদেব সেকথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন। জীবনানন্দ তো উপমাকেই কবিত্ব বলেছেন। ফলে, বুদ্ধদেবের এই মন্তব্য অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি উক্তিপ্রধান কবি বললেন, তা ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। তাছাড়া, বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে 'উক্তি প্রধান কবি' বললেও পরে যখন তিনিই বলেন, তাঁর কবিতায় উপমার রহস্য অফুরাণ এবং সেজন্য অনেক কবিতাই খাঁটি কবিতা হতে পেরেছে, - এ ধরনের বক্তব্যও স্ববিরোধী বলে মনে হয়।

'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রকাব্যের বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্রের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রকাব্যের মূল সূত্রগুলির অন্যতম হ'লো প্রেম। 'মানসী' প্রধানতঃ প্রেমের কাব্য। তবে, 'মানসী'তে কবি যার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করেছেন তিনি

এক অনির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল সত্তা।[১৪১]

এখানে কবি নায়ক রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর প্রেমময়ী কল্পনাকে, যিনি কাব্যলক্ষ্মী প্রেয়সী থেকে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। 'সোনার তরী'তে এসে এর মধ্যেই যুক্ত হ'লো নতুন মাত্রা -

মরণ ঃ একটি নতুন তন্ত্রীতে আঘাত লাগলো, একটি নতুন
চরিত্রের আবির্ভাব হ'লো রঙ্গমঞ্চে।[১৪২]

এই রহস্যময়ী প্রেমমীয় নায়িকা কবির চালিকাশক্তি। বুদ্ধদেবের মতে, এরপরে এই নায়ক নায়িকা বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করবে। মোহিনী নারীকে আর দেখা যাবেনা। কবি নিজের উপর -ই আরোপ করবেন নারীত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর নাম-ই 'জীবন দেবতা'।[১৪৩]

'চিত্রা', পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে - 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' পেরিয়ে এমনকি, 'বলাকা' পর্যন্ত এই দেবতাই রইলেন কবির সহযাত্রী। তবে তিনি আর জীবন দেবতা নন্, বন্ধু, গুরু, পান্থ, প্রিয়তম ইত্যাদি।[১৪৪] বুদ্ধদেব মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের এই জীবন দেবতাই গীতাঞ্জলি পর্বে বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।[১৪৫]

রবীন্দ্র-কবিতা বিচারে বুদ্ধদেবের মূল জিজ্ঞাসাগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে নিলে দেখি 'কান্তা ও কবিতা' শিরোনামের অধ্যায়ে বুদ্ধদেব প্রস্তুত করেছেন রবীন্দ্রকাব্য সৃষ্টিতে 'নেই' - এর তালিকা। বুদ্ধদেবের ভাষায় -

> তাঁর কবিতায় চলতিকালের জীবন অথবা কথ্য ভাষার আস্বাদন নেই। তাঁর কাব্যের সমগ্র পটভূমি মধ্যযুগ ও পুরাকাল থেকে সংগৃহিতঃ বাঁশি, ধান, পদ্মফুল ... এ ধরনের সামগ্রী তাঁর রচনায় এমন আজগ্র ও পুনরাবৃত্ত যে, একহাজার পংক্তি পড়ে উঠেও এই তথ্যটা 'বোধগম্য' নাও হতে পারে যে, কবির অর্দ্ধেক জীবন বিশ শতকে অতিবাহিত হয়েছিলো, ...।[১৪৬]

বুদ্ধদেব মনে করেন, কিছু গদ্য রচনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচনায় -

> তাঁর জন্মস্থান ও পৈতৃক বাসভূমি কলকাতা স্থান পায়নি।[১৪৭]

অর্থ্যাৎ, যা কিছু নাগরিক নয়, এমন সব সামগ্রী কবিতায় ব্যবহৃত হ'লেই যদি সেই কবির সমগ্র 'কাব্য-প্রেক্ষাপটকে মধ্যযুগীয় যা পুরাকালের মনে হয়, কবিকেও বলতে হয় আধুনিক নাগরিক নন তিনি। তাহলে অনেক আধুনিক কবি বিশেষতঃ জীবনানন্দের অনেক কাব্য পটই মধ্যযুগীয় আখ্যা পাবে। এবং, জীবনা নন্দকেও আধুনিক নাগরিক কবি বলা যাবে না। কিন্তু, 'রূপসী বাংলা' যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরিবেশকে তিনি মধ্যযুগীয় বলেন নি কখনো।

'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ন অধ্যায় - 'দেবতা ও বধূ'। সেখানে তিনি উন্মোচন করেন রবীন্দ্রকাব্য ধারায় আন্তর্লীন এক নাটককে। এই নাট্যসূত্র আবিষ্কারেও বুদ্ধদেব কিন্তু সীমানা করে নেন 'গীতাঞ্জলি' পর্ব পর্যন্ত। তিনি জানিয়েছেন, নাটকীয় দ্বন্দ্বের সমাধান 'গীতাঞ্জলি'তে যাকে বড় জোর 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায় । কারণ, তার মতে, এই তিনটি আসলে একই কাব্য। কিন্তু এর পরেও যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট কাব্যজগৎ - 'বলাকা' বা 'পূরবী' থেকে শুরু করে একেবারে শেষপর্যায়ের কাব্য ধারা পর্যন্ত ; রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নাট্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব এখানে একেবারে নীরব।

'গীতাঞ্জলি'র সবগুলি রচনাকে বুদ্ধদেব পরস্পরের সম্পৃক্ত ও একই প্রেরণাও মনোভাব সঞ্জাত মনে করেন।[১৪৮] একই প্রেরণা ও মনোভাব থেকে লেখা বলেই 'গীতাঞ্জলি'র রচনা গুলিকে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করাকে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে করেন বুদ্ধদেব।[১৪৯] অর্থ্যাৎ, রবীন্দ্র সৃষ্টিকে তিনি টুকরো করে দেখতে চান না, দেখতে চান সমগ্ররূপে। আর এই সমগ্ররূপে দেখতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্র সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্কার করেন এক অন্তর্গূঢ় যোগসূত্র, এক অন্তর্লীন নাটক। 'কান্তা ও কবিতা', 'দেবতা ও বধূ', 'এপার ওপার' ইত্যাদি শিরোনামের অধ্যায়গুলিতে তিনি এই নাট্যরূপ উদঘাটন করতে চেয়েছেন। কবি নায়করূপে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে নানারূপে পর্যবেক্ষণ করার পর দেখা যাবে

> এই বণিতা ও কবিতা, এই মানস সুন্দরী ওবিদেশিনী - সব এক পুরুষ দেবতার মধ্যে লীন হয়ে যাবে।[১৫০]

এখানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে অজিত চক্রবর্ত্তীর বক্তব্যের প্রভেদ সামান্য।[১৫১] বুদ্ধদেব নিজেও জানিয়েছেন যে, পূর্বসূরী সমালোচকের পথ ধরেই তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে চেয়েছেন মাত্র। আর, জীবনদেবতার এই পুরুষমূর্ত্তি আবিস্কার বুদ্ধদেবের একান্ত নিজস্ব। বুদ্ধদেব জীবন দেবতার এই অন্তর্নাট্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ভাবে উপস্থাপিত করলেও প্রশ্ন দেখা দেয় তাঁর এই সমগ্র দর্শনে। কবি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের সূচনায় তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রসৃষ্টির এই আলোচনায় তাঁর কোনো একটি বিশেষ পর্যায়ে নিজেকে তিনি আবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অন্তর্গত যোগ সূত্রটিকে। তাঁর মনে হয়েছে, প্রেম, বিরহ, পুনর্মিলনের নাট্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে রবীন্দ্র-কাব্য গুচ্ছ। যার নান্দীপাঠ 'সন্ধ্যাসঙ্গী'তে, যবানিকা উত্তোলন 'মানসী'তে, দ্বন্দ্বের সমাধান 'গীতাঞ্জলি'তে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'গীতাঞ্জলি' - কবি রবীন্দ্রনাথের এই মধ্যজীবন পর্যন্ত যদি বুদ্ধদেবের আলোচনার পরিধি হয়, তাহলে, এই প্রশ্ন সংগত হয়ে পড়ে যে,

> সত্যি সত্যি কি বুদ্ধদেব সমগ্ররূপে দেখতে চান রবীন্দ্রনাথ কে ?[১৫২]

কবি রবীন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্র-বিষয়ক তাঁর অন্যান্য আলোচনা থেকে এই রকম একটা জিজ্ঞাসাই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কবিতার সাতসিঁড়ি' অধ্যায়ের আলোচনা থেকেও একথাই মনে হয় যে বুদ্ধদেব কেবলই টুকরো করে দেখতে চাইছেন রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিসত্তাকে এমনকি শব্দে শব্দে যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি, তাকেও কখনো অতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করে সুন্দর ছবিটিকেই ছিন্ন-ভিন্ন করেছেন। 'কবিতার সাত সিঁড়ি' অধ্যায়ে 'সোনারতরী' কবিতার দুটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' - এখানে শুধু মিলের জন্যেই
> ভরসাহীন হতে হ'লো ; আর তৃতীয় স্তবকে 'ঢেউগুলি' যে
> 'নিরুপায়' তারও অন্য কোনো কারন নেই।[১৫৩]

শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন —

> ঢেউগুলি নিরুপায় / ভাঙে দুধারে - এই সহজ এবং সুন্দর ছবিটিতে
> তত্ত্ব খুঁজতে না গেলে অসম্ভাব্যতা কিছু চোখে পড়ে না, বোঝা যায়
> না কেন একজন সমালোচক ভাববেন কেবল মিলের কারনেই
> 'নিরুপায়' শব্দটির ব্যবহার।[১৫৪]

আবার তিনি লিখেছেন

> প্রথম স্তবকের 'নাহি ভরসা' এবং অন্তিম স্তবকের 'শূন্য নদীর
> তীরে রহিনু পড়ি' উচ্চারণের সঙ্গে ... তৈরি হয় আদ্যন্ত এক
> সংগতি। কবিতাটিকে এই সমগ্ররূপে কি দেখতে চাননি
> বুদ্ধদেব ?[১৫৫]

তাছাড়া, 'কবিতার সাতসিড়ি' তে রবীন্দ্র কবিতার নানাস্তর আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের

উৎকৃষ্ট কবিতা নির্দেশ করে দেন, তার মধ্যেও কবির সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্গত কোনো সুস্পষ্ট পরিণতির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবি রবীন্দ্রনাথকে সমগ্ররূপে দেখার আর একটি অন্তরায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে যখন বুদ্ধদেব তাঁকে বিশ্বের পটে উপস্থাপিত করেন। তখনও দেখা যায় সমালোচক তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র সৃষ্টিকে যে ভাবে দেখাতে চান, তাতে অনেক সময়-ই রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্ররূপের বদলে বিচ্ছিন্ন কিছু অংশকে তিনি তুলে ধরেন। শঙ্খঘোষও তাঁর 'ছন্দোময় জীবন' -এ এই বিষয়টির উল্লেখ করেই জানিয়েছেন —

> রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের এবং জটিল জীবনের পুরো চেহারার
> পট তিনি ব্যবহার করছেন না, নির্বাচন করে নিচ্ছেন মানসকতার
> কয়েকটি আপাত - বিযুক্ত অংশ।[১৫৬]

'কান্তা ও কবিতা' নামক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কাব্যের পটভূমিকে যে পুরাকালের ও মধ্যযুগীয় বলে উল্লেখ করেছেন - তাও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যপটে নেই, তা তাঁর শেষ পর্বের কবিতা-গ্রন্থের প্রতি মনোযোগী হলেই চোখে পড়বে। মনে হয়, বুদ্দদেব যেন তাঁর আলোচনার সীমা করে নিয়েছেন রবীন্দ্র কাব্যের একটা পর্ব পর্যন্তই, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য ধারা তাঁর বিবেচ্য নয়।

বুদ্ধদেবের 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ শেষ হয়েছিল 'গীতাঞ্জলি' পর্বে এসে। সেই পর্যন্ত রচনাগুলিতে তিনি দেখেছিলেন এক সংহত সম্পৃক্তি। কিন্তু তাঁর এই রবীন্দ্র-দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিলো পাঠক মহলে। পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্য সেই সংহতিসূত্রে গ্রাহ্য হয়েছে কি-না ? 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, প্রায় ধারাবাহিক ভাবে তার আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে

> শুধু আলোচনাই নয়, বাংলা কবিতার আধুনিকতা কোথায় রবীন্দ্রিকতা
> থেকে অপসৃত হচ্ছে, কোথায় বা তা ঋদ্ধ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথেরই
> উত্তরসাধনায় - সে কথাও ধরা পড়েছে বুদ্ধদেবের এই আলোচনার
> সূত্রে।[১৫৭]

শেষ পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনার বুদ্ধদেব মূলতঃ গুরূত্ব দিয়েছেন কবিতা গুলির আধুনিকতার উপর। অন্যদিকে, গুরুত্ব পেয়েছে আঙ্গিকের আলোচনা। একহিসেবে দেখতে গেলে তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনায় আঙ্গিকগত আলোচনাই প্রধান।

'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> যে লেখা রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেবে, তাঁর বই পড়ে যা পাওয়া
> যায়, তার উপরেও আরো কিছু যোগ করবে, সেরকম সমালোচনায়
> সিদ্ধি বড় দুরূহ।[১৫৮]

রবীন্দ্রসমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব নিজে সেই চেষ্টাই করেছেন । কবি, কথাশিল্পী, গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে

চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন, তাঁর কাব্যশিল্পের মধ্যে এক অন্তনাট্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন যা সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য ধারার বৈচিত্র্যের মধ্যে, যোগসূত্র স্বরূপ। এসব ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধি প্রশ্নাতীত নয়। কবি ও কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি আধুনিকতার যে তত্ত্ব, সূত্র গুলি খুঁজে নিতে চেয়েছেন, সেক্ষেত্রেও ততটা সার্থক তিনি হতে পারেননি, যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্যভাবে নাট্যসূত্র আবিষ্কার করলেও তাঁর এই রবীন্দ্রদর্শন সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যকে চিনিয়ে দিতেও সাহায্য করেনা। তাছাড়া, 'ছিন্নপত্রে' বা 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, বুদ্ধদেবের মতে, রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি জানবার জন্য সমালোচকের দ্বারস্থ না হয়ে বরং বেশি করে রবীন্দ্রনাথ পড়াই প্রকৃষ্ট উপায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, চেতনা ও রচনার সঙ্গে আমাদের উপলব্ধির সেতু রচনাও করে তাঁর নিজেরই রচনা। তাই বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> তাঁর আপন ভাষ্যের সীমানার বাইরে তাঁকে দেখতে পাওয়া
> আজ পর্যন্ত সহজ হয়নি।[১৫৯]

এটিও রবীন্দ্রসমালোচনা লেখার অন্তরায় বলে তিনি মনে করেন। এভাবে দেখলে অবশ্য, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় থেকে অজিত চক্রবর্তী, প্রমাথ নাথ বিশীর রবীন্দ্র-দর্শন সম্পর্কেও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। বুদ্ধদেব মনে করেন, তাঁদের রবীন্দ্র-প্রীতি তাঁদের পরিশ্রমকে সার্থক করেছেন। তাহলেও,

> আদর্শের যে পূর্বপ্রস্তুত স্বকীয়তায় সমালোচনা মেরুদণ্ড পায়, যার
> জোরে নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে পারে, তারই অভাব আমাদের
> রবিচর্চার প্রায় সামান্য লক্ষণ।[১৬০]

বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে, সমালোচনার যে আদর্শ সামনে রেখে সমালোচক সমালোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটি নির্ণয় করাও কঠিন। কেননা,

> সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে আধুনিক মনের থই মেলেনা, স্বদেশী
> ঐতিহ্যে তুল্য কোনো কবি নেই, আবার, পশ্চিমী আদর্শ প্রয়োগ
> করতে গেলেও ভুল হবে। যদিও এই বিশ্ব মানবের আলোচনায়
> বিশ্ববোধ অপরিহার্য প্রয়োজন।[১৬১]

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে চেয়েছেন মূলতঃ আধুনিক কবি হিসেবেই। 'কবিতা' পত্রিকায়

> ব্যাপক রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে হয়তো আধুনিকতারই পথ খুঁজে
> নিতে চাইছিলেন বুদ্ধদেব।[১৬২]

রবীন্দ্র বিরোধিতায় তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন বার বার। কিন্তু, তাঁর মতো আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে আর কেউ এভাবে রবীন্দ্ররচনার অবিরল সমালোচনা লেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

> রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়, তাঁকে সামনে রেখেই
> সে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এ মূল সত্যটি
> বুদ্ধদেবই প্রথম বুঝেছিলেন।[১৬৩]

তাই, কথাসাহিত্যিক ও কবি রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা সমালোচনা করে তিনি আধুনিকতার দর্শন ও সূত্রগুলিই খুঁজে নিতে চেয়েছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা কোথায় রাবীন্দ্রিকতা থেকে দূরে সরে আত্ম আবিস্কারে সচেষ্ট হয়েছে - এই সবই বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র দর্শনে প্রতিপাদ্য হয়েছে। 'গোরা', 'চার অধ্যায়', 'ঘরে-বাইরে' আর 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা তাঁর আগ্রহের বিষয়। কিন্তু, 'চোখের বালি'তে শাস্ত্রগত নীতিবচনের কাছে আত্মসমর্পনকারী রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে পারেননি বুদ্ধদেব আর, কবিতায়, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে তিনি দেখেছেন আধুনিকতারই বিচিত্র রূপায়ণ।

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, তাঁর রবীন্দ্র-দর্শণ কোনো প্রথাগত নীতি মেনে চলে না। তিনি কখনোই রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর কোনো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, বা দার্শনিক তত্ত্ব আরোপ করেন নি। একজন আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানার ও রবীন্দ্র সাহিত্যকে বোঝার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তাঁর রবীন্দ্র-দর্শণ তাই পাঠ্য বইয়ের বাঁধাগুলি নয়, সমালোচকের অ্যাকাডেমিক তত্ত্বকথাও নয়। তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ একান্তই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে, নিজের ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে নিয়ে। তাই, শিল্প-বিচারে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী বুদ্ধদেবের পছন্দ রবীন্দ্র সাহিত্যজগতের সেই অংশগুলি, যেখানে রবীন্দ্র গীতিকবিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। আত্মভাব প্রধান রোমান্টিক কবিমনটি সেখানে তাঁর সবটুকু রঙ, সবটুকু উত্তাপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

নির্দেশিকা

১। Eliot, T. S. To criticize the critic Faber & Faber, London, Boston, 1965, Page- 26

২। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃঃ ৩

৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্য চর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১১৮

৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', ২২শে শ্রাবণ, কলকাতা, কবিতা ভবন, আগষ্ট ১৯৪২, পৃঃ ৪

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর রবীন্দ্র দৃষ্টি', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল - জুন, ১৯৭৭, পৃঃ ১৫০

৬। তদেব, পৃঃ ১৫০

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গান ভঙ্গ', কথা ও কাহিনী

৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা', সাহিত্য চর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৩২

৯। তদেব, পৃঃ ১৩২

১০। তদেব, পৃঃ ১৩২

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর রবীন্দ্র দৃষ্টি', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল - জুন, ১৯৭৭, পৃঃ ১৫০

১২। বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬

১৩। তদেব, ভূমিকা

১৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংকরণ, ১৩৮৪

১৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র - রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, সমালোচনা, 'কবিতা',আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬২

১৬। তদেব, পৃঃ ৬২

১৭। তদেব, পৃঃ ৬৩

১৮। তদেব, পৃঃ ৬২

১৯। তদেব, পৃঃ ৬৩

২০। তদেব, পৃঃ ৬৩

২১। তদেব, পৃঃ ৬৪

২২। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৯৯

২৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, সমালোচনা, 'কবিতা' (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু, আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৫০

২৪। তদেব, পৃঃ ৫১

২৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২-য় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৯

২৬। তদেব, পৃঃ ৫৯

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডসমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬০

২৮। তদেব, পৃঃ ৬০

২৯। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪-র্থ খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ২৭

৩০। তদেব, পৃঃ ২৭

৩১। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদনা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬১

৩২। তদেব, পৃঃ ৬১

৩৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪-র্থ খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ২৯

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৯-৩০

৩৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬৬

৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪-র্থ খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৩১

৩৭। তদেব, পৃঃ ৩৩

৩৮। তদেব, পৃঃ ৩৩

৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৫

৪০। তদেব, পৃঃ ৩৫

৪১। তদেব, পৃঃ ৩৫

৪২। বসু, বুদ্ধদেব, 'নতুন বই' শিরোনামে রবীন্দ্র নাথের 'ছেলেবেলা'র সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৫৭

৪৩। তদেব, পৃঃ ৫৫

৪৪। তদেব, পৃঃ ৫৫

৪৫। তদেব, পৃঃ ৫৫

৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৯ - আষাঢ় ১৩৫০, পৃঃ ২৩৮

৪৭। তদেব, পৃঃ ২৩৮

৪৮। তদেব, পৃঃ ২৩৯

৪৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'চিঠিপত্র' ৫ম খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৯ - আষাঢ় ১৩৫০, পৃঃ ২৫৯

৫০। বসু, বুদ্ধদেব, চিঠিপত্র ৬ষ্ঠখন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), বর্ষ-২২, সংখ্যা-১, পৃঃ ৬৬

৫১। তদেব, পৃঃ ৬৭

৫২। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১৫

৫৩। তদেব, পৃঃ ১৬

৫৪। তদেব, পৃঃ ১৬

৫৫। তদেব, পৃঃ ১৩

৫৬। তদেব, পৃঃ ১৬

৫৭। তদেব, পৃঃ ১৪

৫৮। তদেব, পৃঃ ১৪

৫৯। তদেব, পৃঃ ১৪

৬০। বসু, বুদ্ধদেব, ১৮.০৩.৭২, কনিষ্ঠ কন্যাকে পত্র, দেশ, ২৯শে জুলাই, ১৯৮৯

৬১। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৬৬

৬২। তদেব, পৃঃ ৭৪

৬৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৮০

৬৪। তদেব, পৃঃ ৮০

৬৫। তদেব, পৃঃ ৮৪

৬৬। তদেব, পৃঃ ৮৫

৬৭। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৮৬

৬৮। তদেব, পৃঃ ৮৬

৬৯। তদেব, পৃঃ ৮৬

৭০। তদেব, পৃঃ ৮৭

৭১। বসু, বুদ্ধদেব, 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৮৮

৭২। তদেব, পৃঃ ৮৯

৭৩। তদেব, পৃঃ ৯০

৭৪। তদেব, পৃঃ ৯০

৭৫। তদেব, পৃঃ ৯১

৭৬। তদেব, পৃঃ ৯৫

৭৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৯৫

৭৮। তদেব, পৃঃ ৯৮

৭৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'দুইবোন ও মালঞ্চ', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১০১

৮০। তদেব, পৃঃ ১০৩

৮১। তদেব, পৃঃ ১০৩

৮২। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮৩। তদেব, পৃঃ ১০৩

৮৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১০৭

৮৫। তদেব, পৃঃ ১১১

৮৬। তদেব, পৃঃ ১১০

৮৭। তদেব, পৃঃ ১১০

৮৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'চার অধ্যায়', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১১৪

৮৯। তদেব, পৃঃ ১১৮

৯০। তদেব, পৃঃ ১২০

৯১। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছ', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ২৬

৯২। তদেব, পৃঃ ২৮

৯৩। তদেব, পৃঃ ৩৬

৯৪। তদেব, পৃঃ ৩৬

৯৫। তদেব, পৃঃ ৩৮

৯৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছে চিরন্তনের পটভুমি', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৪০

৯৭। তদেব, পৃঃ ৪২

৯৮। তদেব, পৃঃ ৪৪

৯৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছ কি গীত ধর্মী?', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, পৃঃ ৪৫

১০০। তদেব, পৃঃ ৪৫

১০১। তদেব, পৃঃ ৪৫

১০২। তদেব, পৃঃ ৪৬

১০৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছের রচনারীতি ', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৪৭

১০৪। তদেব, পৃঃ ৫১

১০৫। তদেব, পৃঃ ৫১

১০৬। তদেব, পৃঃ ৫৮

১০৭। তদেব, পৃঃ ৫৯

১০৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'কাহিনী ও রচনা', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ২৩

১০৯। তদেব, পৃঃ ২৩

১১০। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্য শিল্প', সঙ্গ ঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ১০৫

১১১। তদেব, পৃঃ ১০৬

১১২। তদেব, পৃঃ ১০৫

১১৩। তদেব, পৃঃ ১০৫-১০৬

১১৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৪

১১৫। তদেব, পৃঃ ৫৫

১১৬। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২-য় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৬-৫৭

১১৭। তদেব, পৃঃ ৫৭

১১৮। তদেব, পৃঃ ৫৭

১১৯। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৭

১২০। তদেব, পৃঃ ৫৫

১২১। তদেব, পৃঃ ৫৮

১২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভুমিকা, 'চিত্রা'

১২৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন

১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ২১

১২৪। তদেব, পৃঃ ২১

১২৫। তদেব, পৃঃ ২১

১২৬। তদেব, পৃঃ ২২

১২৭। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৫০

১২৮। ভট্টাচার্য, গৌতম, 'কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৩৯২, পৃঃ ৩০

১২৯। তদেব, পৃঃ ৪০

১৩০। তদেব, পৃঃ ৪২

১৩১। বসু, বুদ্ধদেব, 'নবজাতক পুস্তক সমালোচনা', 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৪৪

১৩২। তদেব, পৃঃ ৪৪

১৩৩। তদেব, পৃঃ ৪৫

১৩৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের 'নতুন কবিতা', 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), রবীন্দ্র সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৮, পৃঃ ১০৪

১৩৫। তদেব, পৃঃ ১০৭

১৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৮ - আষাঢ় ১৩৪৯, পৃঃ ৩৭

১৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫

১৩৮। ১৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গঃ মানসী, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলকতা, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ১৭৮

১৩৯। ঘোষ, , শঙ্খ 'বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ' বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (স ম্পা), কলিকাতা বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৬৩

১৪০। বসু, বদ্ধদেব, সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ১৯৭

১৪১। বসু, বুদ্ধদেব, ' কান্তা ও কবিতা ', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ৩৩

১৪২। তদেব, পৃঃ ৪১.

১৪৩। তদেব, পৃঃ ৫২

১৪৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'দেবতা ও বধূ', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ৬২

১৪৫। তদেব, পৃঃ ৭০

১৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'কান্তা ও কবিতা', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ২৯

১৪৭। তদেব, পৃঃ ২৯

১৪৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'এপার - ওপার', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ৭১

১৪৯। তদেব, পৃঃ ৭৯

১৫০। বসু ,বুদ্ধদেব,'কান্তা ও কবিতা', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬ পৃঃ ৫২

১৫১। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ ৮১

১৫২। ঘোষ, শঙ্খ, 'টুকরো থেকে সমগ্রে', ছন্দোময় জীবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা বৈশাখ, ১৪০০ পৃঃ ১০৮

১৫৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'কবিতার সাত সিঁড়ি' কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬ পৃঃ ১৮

১৫৪। ঘোষ, শঙ্খ, ছন্দোময় জীবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা বৈশাখ, ১৪০০, পৃঃ ১০৯

১৫৫। তদেব পৃঃ ১০৯

১৫৬। তদেব পৃঃ ১০৮

১৫৭। ভট্টাচার্য, গৌতম ' কবিতা' য় রবীন্দ্রনাথ, প্যাপিরাস-১ম সংস্করণ ১৩৯২ পৃঃ ২৯

১৫৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫৪

১৫৯। তদেব, পৃঃ ১৩১

১৬০। তদেব, পৃঃ ১৩২

১৬১। তদেব, পৃঃ১৩৩

১৬২। ভট্টাচার্য, গৌতম, 'রবীন্দ্র কাব্যপ্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও আধুনিকতার সূত্র' ,'কবিতা'য় রবীন্দ্র নাথ, প্যাপিরাস, ১ম সংস্করণ ১৩৯২, পৃঃ ১

১৬৩। তদেব, পৃঃ১

ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব-ই প্রথম আন্তর্জাতিক কাব্য-কবিতার দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মোহনীয় রোমান্টিক কাব্য-সম্ভার আধুনিকদের সামনে থাকার ফলে তাঁদের নিজেদের কাব্যপ্রবাহ অন্য খাতে বইয়ে দেবার প্রয়োজন প্রথম থেকেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কাব্যদর্শের বাইরে গিয়ে আধুনিকরা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। যে প্রাত্যাহিক জীবনের গ্লানি, সময়ের নিয়ত অবক্ষয় বাস্তব ও আদর্শের যে আবহমান দ্বন্দ্ব আধুনিক মানুষকে বিহ্বল করছিলো, সেই মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের খোরাক রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাননি। অথচ রবীন্দ্রনাথেই তাঁরা খোঁজেন কল্পলোকের মুক্তি। বুদ্ধদেবের নিজের সাক্ষ - সারাদিন নানা তর্কে-বিতর্কে বরীন্দ্র-কবিতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন ও নস্যাৎ করেছেন তাঁর কাব্য ও কাব্যাদর্শকে। অন্যদিক, রাত্রে বাড়িতে ফিরে সারাদিনের চিত্ত-মালিন্য যাতে ধুয়ে-মুছে যায়, সেজন্য মুগ্ধবৎ তিনি আবৃত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা। এই যে ভিতর ও বাইরের দ্বন্দ্ব, এই যে প্রবহমাণ পৃথিবী ও রবীন্দ্রকাব্যের স্থির সৌন্দর্যের দ্বিরালোক - এরই মধ্যে হয়তো নিহিত আছে বুদ্ধদেবের কাব্য-সমালোচনার একটি সূত্র। বুদ্ধদেব আজীবন সন্দেহাতীতভাবে রবীন্দ্রকাব্যে নিমগ্ন। আবার, এই মগ্নতার বাইরে তিনি সন্ধান করেন নবীন কাব্যাদর্শ, নিজের স্বাতন্ত্র্য ধর্ম বজায় রাখবার নতুন সূত্র।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নতুনদের বিদ্রোহ কাব্য-সাহিত্যে অভিনব নয়। প্রবীণদের বিরুদ্ধে এরকম বিদ্রোহ করেই নতুনদের আসতে হয়। এই সূত্রে মোহিতলালকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন 'আধুনিকোত্তম'। কেননা, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মায়া থেকে মোহিতলালের দেহাত্মবাদের সিঁড়ি দিয়েই তাঁদের আধুনিকতাবাদে উত্তীর্ণ হতে হচ্ছিল। অথচ, মোহিতলাল, নজরুল কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - এঁদের রচনায়ও সেই উন্মুক্ত অবসর খুঁজে পাওয়া গেল না যেখানে আধুনিক কবিরা কবিতার বিশুদ্ধ ভুবন রচনা করতে পারেন। মোহিতলালের দেহচেতনা ও ইন্দ্রিয়ঘনত্ব, নজরুলের রোমান্টিক ভাব-বিদ্রোহ ও উচ্চরোল, যতীন্দ্রনাথের ভাব-নৈরাশ্য - এ সমস্তই আধুনিকতার ইন্ধন হিসেবে কাজ করেছে নিশ্চয়। কিন্তু, এসবের মধ্যে কোনো একটি সমগ্র কাব্য - বিশ্ব রচনার যাবতীয় উপাদান যেন ছিলোইনা। এজন্যই অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) কাব্যের ভাবপরিমন্ডল বিস্তারের প্রয়োজনে কাব্যের বিশ্বলোক অনুসন্ধান করে ঘুরতে হ'লো বুদ্ধদেবকে।

এমন নয় যে, তাঁর আগে এসব কাজ হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছিলেন ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যে যথেষ্ট আগ্রহী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বহু পাশ্চত্ত্য কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। মোহিতলাল বহু পাশ্চত্ত্য কাব্য-তাত্ত্বিকের সাহিত্যতত্ত্ব বাংলায় এনেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে যাকে বলেছিলেন 'পাশ্চত্ত্য চিত্তের অভিঘাতে প্রাচ্য চিত্তের জাগরণ' তা কিন্তু এসব কবিতায় হয়নি। আজীবন য়ুরোপীয় কাব্য-কবিতার প্রতি অনুরক্ত থেকেও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি মোহিতলালের অত্যানুরাগ শেষ জীবনে প্রায় একটা passion -এর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর, ক্রমাগত সবকিছুর উপর সমালোচনার প্রবল

আক্রমণের ফলে তিনি নিজেও যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। মোহিতলালের উপরে আধুনিকরাও আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষতঃ আধুনিকতার প্রতি তাঁর কটু সমালোচনায়। আর, লক্ষ্যকরলে দেখা যায়, তখন রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ প্রায় উপচ্ছায়ার মতো ছিলেন। তাঁদের নিজেদের অবস্থান রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিলো। তাঁরা নিজেরা কোনো কাব্যবংশ সৃষ্টি করতে পারেননি। এমনকি, নজরুল বা মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথও নয়। অন্যপক্ষে, 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, 'পরিচয়' এর সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে - এঁরা সকলেই বাংলা কবিতায় আধুনিক ধারার প্রবর্তক। সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে — এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার পোষক। বুদ্ধদেব ছিলেন এই আধুনিকতা আন্দোলনের পুরোধা। এবং এই আধুনিক কবিতা-প্রবাহই পরবর্তীকালে বলবত্তর হয়েছে।

বুদ্ধদেব কোথা থেকে এই নতুন কবিতার আদর্শ পেয়েছিলেন? হয়তো এজন্যই তাঁকে চোখ ফেরাতে হচ্ছে পশ্চিমের নতুন কাব্যতত্ত্বের দিকে। এমন নয় যে, বোদলেয়ার ছিলেন বুদ্ধদেবের পক্ষে সাম্প্রতিক বা সমসাময়িক। তাঁর অনুবাদের প্রায় একশ বছর আগে বোদলেয়ার-এর মৃত্যু (১৮৬৭) হয়েছে। কিন্তু বাংলা কবিতার রোমান্টিক আবহ থেকে সরে গিয়ে অথচ সম্পূর্ণতঃ রোমান্টিকতা বর্জন না করেও বোদলেয়ারের কবিতায় পাওয়া যায় নতুন একটি কাব্যাদর্শ। কেননা, বুদ্ধদেব নিজেই বলেন রোমান্টিক আর ক্লাসিক দুয়ের মধ্যে প্রকৃতই যে কোনো অমিল নেই, বোদলেয়ারের কাব্যপাঠেই তা বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের মনের ভিতরে যে একজন বিশুদ্ধ শিল্পপ্রাণ রোমান্টিক কবিসত্তা ছিলো তার-ই একরকম প্রকাশ দেখি হোল্ডার্লিন, রিল্‌কের মতো কবির অনুবাদ ও প্রচারে। আসলে, বাংলা কবিতায় যে শুদ্ধ কাব্যতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে বুদ্ধদেব আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই কাব্যাদর্শ রিল্কে বা হোল্ডার্লিনের আত্মমগ্ন কবিতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন। সুতরাং রিল্কে, হোল্ডার্লিন বা বোদলেয়ার অনুবাদে তিনি যেন খুঁজে পাচ্ছেন তার অন্তর্মনের আততিকে। তা দিয়ে তদানীন্তন বহির্বিশ্বকেও প্রকটিত করা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে 'কবিতা' পত্রিকায় ইউরোপীয় কবি ও কবিতা বিষয়ক কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধদেবের। 'কবিতা' র পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন-পৌষ, ১৩৫৬, ক্রমিক সংখ্যা -৬৩) সম্পাদকীয় বক্তব্যে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> 'কবিতা' র সংখ্যা আরম্ভ হলো সেই মহাকবির, মহামানবের
> আলোচনায়, যাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী ১৯৪১-এ বিশ্বসাহিত্যের
> বড়ো ঘটনা। এ উপলক্ষে ইংলন্ডে আমেরিকায় এত নতুন আলোচনা
> হয়েছে, নতুন অনুবাদও এত বেরিয়েছে, বেরোচ্ছে, যে গ্যাটে
> আধুনিক মানুষের মনে নতুন করে জন্মালেন বলা যায়। যুদ্ধের পরে
> এমন শুভ ঘটনা আর ঘটেনি। .... অবসাদপ্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যে
> তাঁর ভাস্বর কবিসত্তাকে আমরা আহ্বান করি।[১]

হোল্ডার্লিনের কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন —

'গত চল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য
পাশ্চত্ত্য সাহিত্যের চর্চা যদিও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সুধীন্দ্রনাথ
তাঁর সংবর্তের একটি পংক্তিতে 'গ্যাটে, হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে, টমাস
মান্'কে বাঙালির পক্ষে স্মরণীয় করেছেন, তবু, আমার ধারনা,
আমাদের এই সাংস্কৃতিক দৈণ্যময় মফস্বলে হোল্ডর্লিন এখনো
শিক্ষিত বা সাহিত্যিক মহলেও প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত।[২]

এই গ্রন্থেই 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন বইখানাকে
'হ্যেল্ডার্লিন প্রবেশিকা' হিশেবে গ্রহন করেন, ... অর্থাৎ আমাদের
দেশে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কবির সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের প্রাথমিক
পরিচয় ঘটানোই এর উদ্দেশ্য।[৩]

'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা' অনুবাদের ভূমিকায়ও বুদ্ধদেব লিখেছেন —

আমি চেষ্টা করেছি স্বল্প পরিসরের মধ্যে রিলকের বিবর্তনের
রেখাচিত্র আঁকতে .... যাতে মহত্তম রিলকের সঙ্গে পাঠকের
পরিচয় কিছুটা নিবিড় হ'তে পারে।[৪]

বুদ্ধদেব এভাবেই ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। নিজে পাশ্চত্ত্য কবি ও কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। ইংরেজি, ফরাশি, জার্মান ভাষা তিনি শিখে নিয়েছিলেন। ফলে, বিদেশি সাহিত্যের মূলগ্রন্থ তিনি পাঠ করতে পারতেন। আর, সেই সাহিত্যরস থেকে সাধারণ পাঠকও যাতে বঞ্চিত না হয়, এজন্যে তিনি এসব কবিতার অনুবাদ করেছেন, ইউরোপীয় কবি ও কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে সে সম্পর্কে একটা ধারনা প্রচার করতে চেয়েছেন। 'কবিতা'য় ইউরোপীয় কবির কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর সেই অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'কবিতা'র বিভিন্ন সংখ্যায় এসময় বাঙালি বুদ্ধিজীবী অনেকেরই এই ইউরোপীয় সাহিত্য-প্রীতি লক্ষ্য করা গেছে। ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সমালোচনা করে বুদ্ধদেব আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন বাংলা কবিতাকে দেখতে চেয়েছেন। এক হিসেবে, আধুনিক কবিতার নানা সূত্র তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন গোটা ইউরোপের কবিতা থেকে। এগুলি এমনভাবে সমন্বিত করতে চেয়েছেন, যাতে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একটা সমগ্র ধারনা গড়ে তোলা যায়। ইউরোপীয় কবিতার দর্শন তুলে ধরে বাংলা কবিতার মোড় ফেরাকে তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধ -পরবর্তী বাংলা কবিতার ধারা বদলকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপট থেকে।

বুদ্ধদেব-কৃত ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হলো —

(ক) 'শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা (প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৬১)

(খ) 'রাইনের মারিয়া রিল্কের কবিতা' - অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা (প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৭০)

(গ) 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা' - অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা (প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৬৭)

'হাউই' নামে অসকার ওয়াইল্ডের গল্প অনুবাদের ভূমিকা (১৩৫১ সালে লেখা), বরিস পাস্তেরনাকের অনুবাদ গ্রন্থ 'ড. জিভাগো'র ভূমিকাটিও ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ থেকেই বুদ্ধদেব লিখেছেন। ১৯৫৮ সালে পাস্তেরনাক ড. জিভাগো উপন্যাসের জন্য সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওই উপন্যাসে গ্রথিত জিভাগো কবিতাগুচ্ছ অনুবাদ করলেন বুদ্ধদেব বসু। ড. জিভাগো উপন্যাসের একটি বাংলা অনুবাদে তারা স্থান পেল। অনুবাদটি অবশ্য বুদ্ধদেবের নয়

> বস্তুত পাস্তেরনাকের প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতায় অগভীর,
> ... বুদ্ধদেবের মধ্যে তাঁর প্রভাব ১৯৫৮ পরবর্তী কবিতায়
> কিছু পড়েছিল।[৫]

। ক ।

কবি ও কবিতা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারনা যে বদলে যাচ্ছে, বুদ্ধদেব এর সূত্র সন্ধান করেছেন বোদলেয়ার-এর কবিতায়। তিনি উদ্ধৃত করেছেন বোদলেয়ার বিষয়ে তরুণ র‍্যাঁবোর উক্তি - 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'[৬]। নিজেই প্রশ্ন করেছেন - প্রথম কেন? 'দ্রষ্টা' - সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা, আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হতে পারেন? তাঁর মনে হয়েছিলো, কল্পনার স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও কবিতা ঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলোনা। রোমান্টিকেরা মন্ময় ভঙ্গিতে উপদেশ দেন, তাঁদের কবিতা রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি।[৭] এরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধানকর্তা', আর, কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই যা কবিতা নয়, এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হতে পারেনি।[৮] এই শুদ্ধতা ভের্লেন প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন বোদলেয়ারের রচনায়। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' এর রচনারীতিকে তিনি বলেছেন 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন।'[৯] র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভের্লেন ছাড়াও অন্য অনেক আধুনিক কবি বোদলেয়ারপন্থী হয়ে উঠেছিলেন এইসময়। বোদলেয়ার-এর কাছ থেকেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত ও বিনীতভাবে - আত্মসমর্পণ করাই কবির স্বধর্ম। বুঝতে পেরেছিলেন - আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা। বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, ভের্লেন ও মালার্মের পক্ষে এরকম কথা বলা সম্ভব হতোনা, যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন। বোঝা যায়, বোদলেয়ারের পর থেকে কবিতা সম্পর্কে ধারনাই বদলে গেলো। বদলে গেলো, চিরাচরিত কবিতার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেনী বিভাজন। রোমান্টিকতা সম্পর্কে ধারনা পাল্টে গেলো। ক্লাসিক ও রোমান্টিকের মধ্যে বিরাট ব্যবধান গেলো ঘুচে। বোদলেয়ার-পূববর্তী অনেক কবির রচনায় আধুনিকতার পূর্বাভাস ছিলো। যেমন, ইংলন্ডের ব্লেক, কীটস, কোলরিজ, জার্মানিতে হ্যেল্ডার্লিন, ফ্রান্সে, গ্যয়টে, আমেরিকার এডগার অ্যালানপো, হুইটম্যান ইত্যাদি। এঁদের আদর্শ বা পরামর্শকে, কোনো-না-কোনো দিকে থেকে, আধুনিক কবিতার প্রকরণে অথবা মর্মস্থলে ফলপ্রসূ হতে দেখেছি আমরা।[১০] কিন্তু, কবিতা বিষয়ে এঁদের চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষীণ অথবা খন্ডিত, কিন্তু বোদলেয়ারের চৈতন্য নিজের বিষয়ে ও কবিতার

বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর। বোদলেয়ারের মধ্যেই বুদ্ধদেব দেখেছেন আধুনিক কবিতার সূত্রপাত। এমনকি, যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে কবিতা-মুক্তির প্রথম দলিল বলেছেন 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' -এর কবিতাগুচ্ছকে।

কাব্যকলায় বোদলেয়ারের কীর্তির উল্লেখ করে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

১) ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত করে দিয়েছেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে পড়ে উপলব্ধি করি যে, ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারনা দুটি অমোঘভাবে পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতায় তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও তিনি পরম রোমান্টিক।

২) তাঁর রচনায় রোমান্টিকের লাগাম-ছাড়া উচ্ছ্বাস নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা। তাঁর রচনা প্রাঞ্জল, ঘন-গভীর, আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ইঙ্গিতে দূর প্রসারী। তিনি কবিতাকে করে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভর ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় ও সুপ্রবেশ্য।

৩) রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমন্ডিত রচনা, যার কোনো কোনো পংক্তি বা অংশ কবিতা হলেও অনেক অংশই কবিতা নয়। কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পংক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ক ফলটির মতো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত।

৪) রোমান্টিকদের বিষাদে বিলাসের একটি অংশ আছে, শেলি, বায়রণ, ওঅর্ডস্বার্থ- এঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন অন্য মানুষকে এবং অন্য মানুষের দুঃখের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজকে। কিন্তু, বোদলেয়ার সেই রোমান্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে, তাঁর যন্ত্রনার কারণ তিনি নিজেই। দুঃখকে যিনি মানুষের একটি প্রয়োজন বলে অনুভব করেন। আর এটাই রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য যে মানব-স্বভাব রোমান্টিক মতে সহজাতভাবে শুদ্ধ, তাকে বোদলেয়ার দেখেছিলেন দুর্বারভাবে পাপোন্মুখ বলে।

৫) রোমান্টিকেরা আত্মকরুনা করেন, বোদলেয়ার আত্মপরীক্ষা, তাঁরা দোষ দেন অন্যদের তিনি নিজেকে, তাঁরা চান আদর্শ রাষ্ট্র। আর তিনি চান প্রার্থনার দ্বারা আত্মশোধন।

৬) আদি পাপে বিশ্বাসী বলে তিনি কদর্যতা বা মহিমায় ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন, বুঝেছেন - যে শুধু তাই সর্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি হ'তে পারে যা, সুরা, স্বপ্ন বা ঈশ্বরের মতো, মানুষকে তার দৈহিক অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়।

৭) এবং এই কারণে তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায় - শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি, এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ - যা ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।

৮) রোমান্টিক বিষাদে আশা ছিলো, ছিলো কৃতী, যন্ত্র ও উত্তম আইনের দ্বারা প্রনীত স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনা, কবিরা নিজেদের ভাবতে পারতেন - নিষ্পাপ হরিণ ও পৃথিবীকে শ্বাপদ ব'লে। কিন্তু, বোদলেয়ার

যেহেতু নিজেকেই যাবতীয় কার্য ও কারণের উৎস বলে জেনেছেন, তাই তাঁর দুঃখ অনেক বেশী সত্যবাদী এবং দুশ্চিকিৎস্য।

৯) তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর বলে চিনেছিলেন ঃ ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃনা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পন - এই বিরোধী ভাবগুলি তাঁর ধারনায় পরস্পর সংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। এই বৈপরীত্যবোধ বা বিপরীতের সংযুক্তি বোদলেয়ায়ের কাব্যে অবিরল। বুদ্ধদেব লিখেছেন -স্বর্গে সব বৈপরীত্য অবসিত হয় ব'লে বোদলেয়ারের কাব্যে স্বর্গের উপস্থিতি নেই, নেই, 'গীতাঞ্জলি'র মতো ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের উন্মাদনা। কিন্তু, বোদলেয়ারের কাব্যেই তিনি দেখেছেন - মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই অমৃতলোকে সে পৌঁছুতে পারেনা। সকল দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান, সকল বিরোধের যেখানে শান্তি, তা মানুষের অধিগম্য নয়। তাই, বোদলেয়ারে আমরা পাই অলব্ধের জন্য অসহ্য বেদনাবোধ। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' - এর যে কোনো কবিতা পড়লেই দেখা যাবে এই উচ্চারণ —

আমি বেরিয়েছি অসীমের সন্ধানে - একা আমি গুরু নেই,
নেই কান্ডারী বা উপদেষ্টা, পাল পর্যন্ত নেই আমার তরীতে।[১১]

- এই অসহায় কাতরতা, এই অজ্ঞাতপূর্ব রোমাঞ্চকর যাত্রাপথ এবং তার জন্য আপনমনে যন্ত্রনার উপলব্ধি রোমান্টিকতার মর্মকথা। বুদ্ধদেবের মতে, এর উচ্চারণ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' এ যেমন শুদ্ধ, সংহত ও নির্ভীক, পূর্ববর্তী চিহ্নিত রোমান্টিকদের কারো কাব্যেই সে-রকম নয়।

১০) রোমান্টিক কবি দূর-প্রেমিক। অজানা, অসীম অপ্রাপনীয়ের আকাঙ্ক্ষায় তারা নিরন্তর ধাবিত হয় সীমাহীন, গন্তব্যহীন পথে। রোমান্টিকের এই গন্তব্যহীন গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব বোদলেয়ারে অনেক বেশি প্রখর। কেননা, রবীন্দ্রনাথে দুই বিপরীত ভাবের কবিতাগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে ভাগ করে নিতে পারি, দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে না, তাঁর মন যখন যেদিকে উন্মুখ হয়, তখনকার মতো সেখানেই আত্মসমর্পন করে। কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর সমগ্র রচনায়, আর কখনো বা একই কবিতার মধ্যে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর পক্ষে গতি যেমন নিরন্তর মোহময়, স্থিতিও তেমনি ক্ষমাহীনরূপে আহ্বানকারী, এবং উভয় আকর্ষন তাঁর মনে যুগপৎ বিরাজমান।

১১) রোমান্টিকের মনোগত দ্বন্দ্ব, দুরন্ত বাসনা, বাসনার অতৃপ্তি, দুরপনেয় আকাঙ্ক্ষার বোধ জেগে ওঠে চৈতন্যের গভীরতম পীড়ণ ও বিবেকের দংশন থেকে।

বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই, ... যে চৈতণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ও
পীড়িত নয়, ভাবনা যার অন্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি,
কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ কবি বহন করছেন না।[১২]

চৈতন্য ও বিবেক-পীড়িত মানুষের বিষন্নবোধের কথা আছে বোদলেয়ারের কাব্যে। বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে যা নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে, তা হ'লো —

'মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী, মানুষ পাপী, কিন্তু সে

জানুক সে পাপী, ... মানুষ অমৃতাকাঙক্ষী, কিন্তু সে জানুক
সে অমৃতাকাঙক্ষী।[১৩]

আধুনিক মানব-চৈতণ্যের এই আত্মগত জ্ঞানকে বোদলেয়ার তাঁর নিজস্ব রোমান্টিকতার ধারণা নিয়ে কাব্যময় রূপ দিয়েছেন। বিবেক ও চৈতণ্যের অসম্ভব আন্দোলন-জাত এই আত্মগত জ্ঞানকে বুদ্ধদেব আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান বলেছেন। এবং এদিক থেকে তাঁর মনে হয়েছে, সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক। বোদলেয়ার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন - সমগ্র রোমান্টিকতাকেই তিনি আত্মসাৎ করে নেন - তার মধ্যে যা দাগি, ময়লা বা রং-চটা, সব শুদ্ধ, সেই বহু ব্যবহৃত স্তূপ থেকেই ছেঁকে তোলেন যে কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত এবং ভবিষ্যতের। রোমান্টিকতার প্রচলিত ধারনার সঙ্গে দুস্তর তার ব্যবধান। মানব প্রকৃতির কামনা-বাসনা-ক্লেদ-পঙিকলতা-আবেগ-হতাশা-নৈরাশ্য - যাবতীয় চিত্তবৃত্তি রোমান্টিক কবিতায় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হ'লো। বোদলেয়ারীয় এই সমগ্র রোমান্টিকতা'র মুখোমুখি হয়েই বুদ্ধদেব হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন,

তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তিমানুষকে মুক্তিদান করে,
... শুধু ইস্ত্রি করা, এটিকেট মানা সামাজিক জীবনটিকে নয়,
নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে, তার মধ্যে
যা-কিছু অযৌক্তিক, যা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও
রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু
গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় - সেই বিশাল স্বতোবিরোধময়
বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির
নাম-ই রোমান্টিকতা।[১৪]

কবিতা বিষয়ে বোদলেয়ারের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে এভাবেই বুদ্ধদের নিজের ধারণাকে মিলিয়ে নিয়েছেন।

। খ ।

পশ্চিমী কাব্য-কবিতায় বুদ্ধদেবের আগ্রহ ও উৎসাহের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন বোদলেয়ার। এর পরেই, যদি কোনো একজন য়োরোপীয় কবির প্রতি বুদ্ধদেবের আগ্রহের কথা বলতে হয়, তিনি অবশ্যই জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬)। রিলকে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এমন এক কবি, যিনি সর্বতোভাবে কবি হ'ত চেয়েছিলেন।
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কবি। দৈনন্দিনতম জীবনের অর্থহীনতম
মুহূর্তেও। ভ্রমনে ও মননে, বাক্যে, ব্যবহারে, পত্র রচনায়।
... যখন তিনি অসুস্থ বা হতাশ বা মনঃক্ষুন্ন, তখনও।[১৫]

অবিরত কবিতার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন রিলকে। জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা কবিতার ইন্ধন রূপে ব্যবহার করেছেন। রিলকে যেমন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে কবি হতে চেয়েছিলেন, দৈনন্দিনতম অভিজ্ঞতাও কবিতার

জন্য উৎসর্গ করেছেন, নিজেকেই কবিতার বাহন করে তুলতে চেয়েছেন, এক হিসেবে বুদ্ধদেব নিজেও ছিলেন কবিতার জন্য নিরন্তর সমর্পিত-প্রাণ। বিশেষতঃ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন ক্লান্তিবিহীন কবি ও কর্মী। তবে, রিলকে তাঁর সমকালীন স্টেফান গেয়র্গের মতো কোনো গোষ্ঠীর নেতা বা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, কোনো আন্দোলনে যোগ দেননি কখনো, এলিয়টের মতো সমালোচনা লিখে আধুনিকতার এবং পরোক্ষে নিজের রচনার স্বপক্ষে পাঠকের রুচি গঠন করতে চাননি তিনি। বুদ্ধদেব কবিতার জন্য এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার মোড়-ফেরা ও আন্দোলনে প্রতিনিধি স্থানীয় এক কবি। নিজেই বাংলা ও ইউরোপীয় কাব্য কবিতার সমালোচনা লিখে পাঠকের রুচি গঠন করতে চেয়েছিলেন। কাব্য-কবিতার আদর্শ বদলের সঙ্গে সাধারন পাঠকের যোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কবিতার ধারা-বদলকে স্থায়ী ভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। কবিতার প্রতি নিরন্তর উন্মুখতা থেকেই রিলকের প্রতিও উৎসাহবোধ করেছেন বুদ্ধদেব।

রিলকের কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় (১ম প্রকাশ, ১৯৭০) বুদ্ধদেব দেখাতে চেয়েছেন, রিলকে কোন্ ধরনের কবি ছিলেন, তার অনন্যতা কোথায় এবং বিশশতকী বিশ্ব-কবিতায় তাঁর বিশেষ অবদানই বা কী। ইউরোপের এই মহত্তর খ্যাতিমান কবির সঙ্গে সাধারন বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। তিনি মনে করেন,

> যাঁরা কবি বা হতে চান, ... নিজেদের কবি বলে
> কল্পনা করেন, তাঁদের পক্ষে রিল্‌কের উদাহরণ শিক্ষাপ্রদ
> ও মনোমুগ্ধকর।[১৬]

কবি-জীবনের সকল দ্বন্দ্ব ও সমস্যা তিনি নিজে জেনে ছিলেন এবং তার বিস্তীর্ণ দলিল রেখে গেছেন তাঁর পত্রাবলীতে ও 'মান্টে লাউরিড্‌জ ব্রিগগে' নামক গদ্য গ্রন্থে। রিলকের কল্পনার স্বাভাবিক বাহন ছিলো এমন ভাষা, যা ছন্দোবদ্ধ, মিলে ও অনুপ্রাসে ধ্বনিময়। 'প্রহর পুঁথি'র লেখক রিলকে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন - আমাদের মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে 'গীতাঞ্জলি' পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে। দুটি সামান্য লক্ষণ দৃষ্টিপাতমাত্র ধরা পড়ে। 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথের মতোই 'প্রহরপুঁথি'র রিলকে রূপমুগ্ধ ও পার্থিবের প্রেমিক। তাঁর ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই সহস্ররূপে আবির্ভূত। প্রথম পর্বের রূপমুগ্ধ রিলকের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে উত্তর সময়ে। বুদ্ধদেব এর ঐতিহাসিক কারণ সন্ধান করেছেন। বিশ শতকের সূচনায় ইউরোপে রোমান্টিক যুগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়েছে, বোদলেয়ার এবং পরবর্তী ফরাসী প্রতীকী কবিদের প্রভাবে কবিতার ধারনায়ও একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, ফ্র্যান্সের কয়েকজন চিত্রশিল্পীর কাছে জগৎ নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে এই সময়। প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী রঁদার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে রিলকের। এবং রঁদার সঙ্গে সঙ্গে সেজান, ভ্যান গ, বোদলেয়ার - এঁদের অসামান্য শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধেও উৎসাহবোধ করেছেন তিনি। এই ঐতিহাসিক কারণে এবং তিনি নিজে যেহেতু পরিণতি-প্রবণ, রিলকের মন বিমুখ হ'লো সেই হার্দ্য কবিতার প্রতি, যা এযাবৎ তাঁর অবলম্বন ছিলো।[১৭] তিনি সেজানের আঁকা

ছবিতে, বোদলেয়ারের কবিতায় দেখলেন শিল্পীর নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টি। বোদলেয়ারের মতো, আপাত বীভৎসকে নিরীক্ষণ করার দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি নিজেও স্বীকার করে নিলেন। রিলকের মনে হ'লো, শিল্পীর পক্ষে এটাই সাধু আচরণ ঃ এই বিষয়নিরপেক্ষ তন্ময় দৃষ্টি, বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রতি এই শ্রদ্ধা। মনে হ'লো, 'প্রহর পুঁথি' বা কর্নেটের মতো আবেগধর্মী কাব্যরচনা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় - সম্ভব হলেও সমীচীন নয়। উচ্ছ্বলতা নয়, সংহতি, আকৃতি নয়, দৃষ্ট বস্তু, বর্ননা নয় সাক্ষাৎ উপস্থাপনা, উক্তি নয়, চিত্রকল্প ঃ এই হ'লো এখন থেকে তাঁর অন্বিষ্ট।[১৮] তাঁর কবিতাকে নতুন করে তুললেন তিনি। দুইখন্ডে প্রকাশিত 'নতুন কবিতা'য়

> কবি নিজে আর সেখানে নেই, আছে শুধু কবিতা,
> তাঁর সব পুরোনো অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছেন তিনি, বর্জন
> করেছেন পক্ষপাতী ভক্তি ও ভালোবাসা, এখন তিনি
> চক্ষুস্মান, বিশুদ্ধ অস্তিত্বের আবিষ্কারক।[১৯]

নতুন কবিতা'য় দেখা দিল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। কবিতার সামান্য লক্ষণ হিসেবে দেখা দিল বিশুদ্ধ তন্ময়তা, এক নিবিড়, অনাসক্ত দৃষ্টি, যা সম্পূর্ণ তদ্গত, যার সামনে প্রতিটি বস্তু নিজেকে নিজের পরম মহিমায় উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্ছে। রিলকের এই বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল অখন্ড চিত্রকল্প রচনারও দক্ষতা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চিত্রকল্প দিয়েই তিনি প্রকাশ করলেন কবিতার সাঙ্কেতিক বাচন। এই রূপান্তরিত রিলকে কে বুদ্ধদেব বলেছেন - রূপকল্পের উপাসক।[২০] তাঁকে তিনি বলেছেন - 'অনিন্দ্যভাবে গঠনদক্ষ'।[২১] যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রিলকের মধ্যে আরেক ধরনের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব। লিখেছেন - রিলকের যুদ্ধকালীন চিঠিপত্রে আমরা পাই এক বিবর্ধমান মনোবেদনা, বিশ্বব্যাপী আর্তি ও চিত্তভ্রংশের সামনে অসহায় অক্ষমতাবোধ। .... রিলকে যেন এই প্রথম বুঝলেন যে জগৎকে বদলে দেবার, জনতাকে অনুপ্রানিত করার কোনো ক্ষমতাই শিল্পকলার নেই।[২২] ১৯১৫ - জুন মাসে লেখা রিলকের চিঠি উদ্ধৃত করেছেন বুদ্ধদেব —

> আশ্চর্য নয় কি - এই যে বিশাল দুঃখ স্বীকৃত হচ্ছে সকলের
> দ্বারা সর্বত্র ... এই নীরন্ধ্র সর্বনাশের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে এত
> সাহস ও আত্মত্যাগ ? এদিকে আমরা - সব শিল্পকলা,
> নাট্যশালা আমরা এই একই জনতার মধ্যে কিছুই জাগাতে পারিনি
> ... কাউকেই বদলাতে পারিনি।[২৩]

১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৮-র বছরগুলিতে রিলকে সৃষ্টি করেছেন সামান্য। যুদ্ধজনিত যন্ত্রনা আর অবরোধের অবসানের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। ১৯২০ সালে আকস্মিক একটি ঘটনায় রিলকে ফিরে পেলেন তাঁর পুরোনো বিশ্বাস ও আস্থা। রিলকের জীবনের ব্যক্তিগত অশান্তি, যুদ্ধজনিত হতাশা - ও আত্মসন্ধান তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অংশ। অনুল্লিখিত কিন্তু সংহতভাবে সেখানে সবকিছু স্বীকৃত ও সার্থকীকৃত। বুদ্ধদেব মনে করেন, রিলকের এলিজি ও সনেটগুচ্ছ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, রিলকের

যা কিছু অভিজ্ঞতা, সব এখানে নির্যাসরূপে সংকলিত হয়েছে - অবশেষে উত্তীর্ণ ও রূপান্তরিত। কিছুই বিস্মৃত বা বর্জিত হয় নি, না 'প্রহর পুঁথির ভক্তি, না 'নতুন কবিতা'র বস্তুনিষ্ঠা, না মান্টের চৈতণ্যপীড়া, বা 'রেকুইয়েম্' এর দ্বন্দ্ববোধ - কিন্তু কিছুই অপরিবর্তিত নেই। এই পর্যায়গুলি - যার ভেদরেখা এযাবৎ স্পষ্ট ছিলো আমাদের মনে - সেগুলো আর আলাদা হয়ে রইলো না এখানে, গৃহীত হ'লো এক বৃহত্তর সংশ্লেষে, এক নতুন যোগসূত্রে গ্রথিত হ'লো। নূতন, কিন্তু অভিনব নয়, পূর্বার্জিত সব শিক্ষার দ্বারা লাভবান, অথচ পদে পদে তার সীমাতিক্রান্ত, কবি যেন যুগপৎ তাঁর অতীতের বিরুদ্ধাচারী ও সহকর্মী।

শুধু কবিতার বিষয়বস্তুতে নয়, এরকম একটা নির্বাচন ও সংশ্লেষ রিলকের কবিতার গঠনশৈলীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব। এলিজি ও সনেটগুচ্ছ রিলকের রূপকরণের দক্ষতার কথা বলেছেন তিনি। এলিজিগুচ্ছের দ্রুত ধাবমান বিসর্পিত অমিত্রাক্ষর, অনির্বচনীয়কে ভাষায় ধরার চেষ্টায় রুদ্ধশ্বাস বাক্যের ব্যবহার - কাব্যকলায় তাঁর কৃতিত্বের অভিজ্ঞান। ভাষার 'ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য ও ঘনত্ব'[২৪] ছিলো নতুন কবিতার রীতিলক্ষণ। কিন্তু, 'ডুয়িনো এলিজি'তে ভাষা বেগান্বিত ও প্রবহমান। বুদ্ধদেব মনে করেন, উক্তি ও চিত্রকল্পের একান্তর বিন্যাসের জন্যই 'ডুয়িনো এলিজি' এমন একাধারে প্রগাঢ় ও গতিশীল, তর্কপরায়ণ ও আবেগস্পন্দিত। আবার, 'নতুন কবিতা'র ভাস্কর্যোপম শৈলীর তুলনায় বা প্রতিতুলনায় 'অর্ফিয়ুস' এর চিত্রকল্পগুলি গতিশীল ও রূপান্তরপ্রবণ। তাদের আবেদন আমাদের চক্ষুতে আবদ্ধ নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ে সঞ্চরমান।

রিলকের জীবন ও কবিতা বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব রিলকের কবিতার একটা বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথমদিকে রিলকের রচনায় যথেষ্ট বহিরাশ্রয় ছিলোনা। চেতনা ও জড়বিশ্বের দ্বন্দ্ব স্পর্শ করেনি তাঁকে। আবেগ-সঞ্জাত একটি বক্তব্যকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। ভাষা তখন ছন্দোবদ্ধ, মিল ও অনুপ্রাসে ধ্বনিময়। কিন্তু, রিলকের সঙ্গে যখন ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী রঁদার পরিচয় হলো এবং সেইসূত্রে বোদলেয়ার, ভ্যান গঁগ ও সেজানের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হলো তার, রূপমুগ্ধ রিলকের শিল্প-প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। শিল্পীর নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আকৃষ্ট করলো রিলকে কে। তাঁর ঈশ্বরানুভূতি, কল্পনা ও আবেগের আতিশয্য, রূপান্তরিত হ'লো বিষয়নিরপেক্ষ সংহত তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর কবিতার ভাষা হয়ে উঠলো ইঙ্গিতধর্মী। আর, মহাযুদ্ধ শুরু হ'লে রিলকের শিল্পভাবনাতে শুরু হ'লো আন্দোলন। তাঁর কেবল-ই মনে হ'লো - এই শিল্প-নাটক-কবিতা যন্ত্রনাজর্জর জীবনকে কিছু দিতে পারছে না, কিছুই বদলাতে পারছে না। তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মসন্ধান কবিতায় ব্যবহৃত ও রূপান্তরিত হ'লো। এক রূপমুগ্ধ ঈশ্বরবোধে মগ্ন কবি ক্রমে বিবর্তিত হয়েছেন। সংশয়-দ্বন্দ্ব-পীড়িত মানব-চৈতন্যের বানীবাহক হয়েছেন। বিষয়গত রূপ দিয়েছে তার পরিবর্তিত ভাষা। কল্পনার স্বাভাবিক বাহন হিসেবে যে ছন্দোময় ধ্বনিময় আবেগপ্রবণ ভাষা রিলকের কবিতায় প্রথম দিকে দেখা দিয়েছে, সেই ভাষাকেই ক্রমে দক্ষ শিল্পীর মতো ব্যবহার করেছেন তিনি। কখনো তাঁর ভাষা লাভ করেছে ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য ও ঘনত্ব, কখনো সেই ভাষা হয়েছে বেগান্বিত ও প্রবহমান। তাঁর এলিজিগুচ্ছের ভাষা নিয়ে এলো 'বচনাতীতের বার্তা'।[২৫] বুদ্ধদেব লিখেছেন

যে, কবিতার ভাষা কতদূর পর্যন্ত অর্থবহ ও ইঙ্গিতময় হ'তে পারে, বিশ শতকী বিশ্ব-কবিতায় তার একটি চরম সীমা এই এলিজিগুচ্ছ।

রিলকের প্রথমদিকে কবিতাগুলি বাদ দিলে কবি হিসেবে রিলকে পুরোপুরি বোদলেয়ারপন্থী। বোদলেয়ার -এর কবিতা দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রানিত। বোদলেয়ার এর 'এক শব' কবিতা দ্বারা তিনি এতদূর পর্যন্ত অনুপ্রানিত যে, ১৯০৭ সালে স্ত্রী ক্লারাকে এ বিষয়ে চিঠি লিখেছেন।[২৬] সেজানের আঁকা একটি আপেলের ছবি দেখে তাঁর মনে হলো, যে নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ধারা সেজানে দেখা যাচ্ছে, এই কবিতাটি না থাকলে তা সম্ভব হ'তো না। আপাত বীভৎসকে নির্মোহ, নিরাসক্ত ভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তিনি নিজেও সেখান থেকেই অর্জন করে নিলেন। তাঁর নতুন নৈর্ব্যক্তিক রীতির উদাহরণ হ'য়ে রইলো 'চিতাবাঘ' কবিতা, যার সঙ্গে আমাদের হৃদয়বৃত্তির কোনো সম্বন্ধ নেই। কবির উপরে জয় হ'লো কবিতার। কবিতা বিষয়ে রিলকে কোনো অভিনব ধারনার প্রবক্তা নন। কোনো নব্য রীতি-প্রকরণের স্রষ্টা নন তিনি। কিন্তু, কবিতা বিষয়ে তিনি ক্রমাগত সচেষ্ট, সচেতন ও বিবর্তনপন্থী। তাই ঐতিহাসিক কারণে কবিতার নতুন মোড়-ফেরাকে তিনি সহজেই আত্মসাৎ করেছেন। ক্রমাগত নতুন করে তুলেছেন নিজের কবিতা। বোদলেয়ার-পরবর্তী এই কবিতাগুলিকে বুদ্ধদেব ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার ধারায় বিশিষ্ট স্থানলাভের অধিকারী ব'লে মনে করেন। বিশ শতকী আধুনিক কবিতার জগতেও এগুলিকে মূল্যবান মনে করেন।

। গ ।

দীর্ঘ ভূমিকাসহ 'হ্যেল্ডার্লিন-এর কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থ বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন ১৯৬৭ সালে। এই গ্রন্থ রচনার অনেক আগে কবিতা পত্রিকাতে হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব। হ্যেল্ডার্লিন সম্বন্ধে তার প্রবন্ধ মূলতঃ হ্যেল্ডার্লিন সমালোচনার জন্য নয়। বরং জার্মান কবি হ্যেল্ডার্লিনকে বাঙালি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি লিখেছেন - আমাদের দেশে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কবির সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোই এর উদ্দেশ্য।[২৭]

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সাংস্কৃতিক দৈন্যময় মফস্বলী পাঠকের মনোজগতের কিঞ্চিৎ বিস্তারের জন্যই একাজ করেছেন তিনি। আধুনিক কবিরা চেতনার বিশ্বরূপকে বিস্তৃত করেছেন বহু পঠনশীলতায়। সুতরাং, যাকে বলা যায় সমালোচনা - এসব ক্ষেত্রে ঠিক তা হয়নি। বুদ্ধদেব মূলতঃ তাঁর কাব্যধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন।

হ্যেল্ডার্লিনকে তিনি গ্যেটের বিপরীত মেরুতে স্থান দিয়েছেন। একজন বহুমুখী, বহুপ্রসূ, বিস্তীর্ণ, রাজকীয়, বিজয়ী, যুগস্রষ্টা বা যুগপ্রতিভূ, আর অন্যজন একতন্ত্রী, নিবিষ্ট, সীমিত, প্রগাঢ় এবং অবহেলিত, তীব্র ও ঐকান্তিক। হ্যেল্ডার্লিনকে তিনি একতন্ত্রী, নিবিষ্ট' কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্লেকের সঙ্গে তুলনায় হ্যেল্ডার্লিনকে তাঁর মনে হয়েছে, ব্লেকের মতই ধর্মকেন্দ্রিক, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে খ্রীষ্টান নন, একই ধরনের চার্চের বিরোধী। কিন্তু ব্লেকের প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াকর্মে একটা অস্থিরতা ছিলো,

তুলনায় হ্যেল্ডার্লিনের কবিচরিত্রে আমরা লক্ষ্য করি এক আশ্চর্য শান্তি ও স্থিরতা, সমাহিত তিনি, নিজের ভাবনায় আবৃত ও সংবৃত, সব বিতর্কের বাইরে, সমাজ-সংসার থেকে পলাতক নন কিন্তু তার দ্বারা অস্পৃষ্ট যেন। 'ধ্যানী কবি'র উদাহরণ হিসেবে হ্যেল্ডার্লিন-এর নাম করেছেন বুদ্ধদেব।

হ্যেল্ডার্লিন-এর কাব্যকলা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য নিম্নরূপ —

১) হ্যেল্ডার্লিনের অধিকাংশ কবিতা সরল অথচ ধ্যানগম্ভীর, প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। এবং তাঁর রচনায় নেই তির্যক ভঙ্গিও সেই উভমুখিতা, যা বিশশতকী আধুনিকতার একটি লক্ষণ। বরং ওঅর্ডস্বার্থ, কিংবা শেলির মতোই তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঋজু উক্তির আকারে, প্রাবন্ধিক ধরনে, বক্তব্যকে উপস্থিত করেন।

২) আদিযুগের প্রায় প্রত্যেক রোমান্টিকের মতো, তাঁরও আস্থা ছিলো জগতের ও মানব-জাতির মঙ্গলপ্রবনতায়, আনন্দিত হওয়াকেই মানুষের 'স্বাভাবিক' অবস্থা বলে মেনেছিলেন।

৩) হ্যেল্ডার্লিন ছিলেন গ্রীসের যোগ্যতর শিষ্য, গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন কঠিন রূপকল্পের বন্ধন, শিখেছিলেন ধ্রপদী সংযম, মিতভাষণের কারুশিল্প।

৪) তাঁর চিত্রকল্পগুলি যথাসম্ভব স্পষ্ট ও সর্বজনীন যা সকলেরই অভিজ্ঞতায় অর্ন্তভুক্ত, তার বাইরে তিনি সাধারনতঃ দৃষ্টিপাত করেন না।

৫) তাঁর বিষয়বস্তুতেও শেষ পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা ছাড়া, কোনো অভিনবত্ব নেই, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখও বিরল, যা আছে তা সর্বজনজ্ঞাত। সংকীর্ন তাঁর জগৎ, বৈচিত্রহীন, একাভিমুখী।

৬) অথচ তাঁর প্রতিটি উক্তি যেন সদ্যোজাত, অম্লেয়রূপে তরুণ, অবিরলভাবে প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ। বুদ্ধদেব মনে করেন এর মূলে আছে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপেরই বৈশিষ্ট্য, যাকে তাঁরা সরলতা ও আস্থা বলে তা-ই। নিরাভরণ ও বিশুদ্ধ উক্তির আকারে মর্মকথা প্রকাশ করার একটি অসামান্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর।

৭) শেষ পর্যায়ে তাঁর কবিতায় দেখা দিলো পরিবর্তন। পূর্ব রচনার তুলনায় আকার বাক্য-বিন্যাসে ও ভাষা ব্যবহারও জটিল হয়ে উঠলো। এসব রচনা স্থাপত্যধর্মী নেই আর, ভাষা তার স্বচ্ছতা হারিয়েছে, কবিতার গঠন হয়েছে নম্য, স্থিতিস্থাপক, পংক্তিগুলি পরস্পর জড়িয়ে যাচ্ছে। মেঘচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মতো শব্দগুলি যেন বহুবর্ণ ও রহস্যময় - যেন, তিনি যা বলতে চাচ্ছেন তার সবটুকু নির্বাচিত আধারে ধরানো যাচ্ছে না, বক্তব্য ছাপিয়ে যাচ্ছে রূপকল্পের অবয়ব, অংশত হয়তো হারিয়েও যাবে, যদি না পাঠকের থাকে পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা।[২৮] কবির বক্তব্য ও চিন্তা রচনার সীমা ছাড়িয়ে যায়। পাঠকের মনে যা-কিছু পৌঁছয় তার তুলনায় অপ্রতুল মনে হয় 'বিষয় বা উপলক্ষটিকে, অর্থাৎ এদের অভিঘাতের একটা অংশ হলো উদ্ধৃত্ত বা অতিরিক্ত, পাঠক যাতে অধিকতর লাভবান হচ্ছেন।

বোদলেয়ার ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই হ্যেল্ডার্লিন-এর কবি-জীবন সমাপ্ত হয়েছে। ফলে, বোদলেয়ার-পরবর্তী ইউরোপীয় কবিতার নবজন্ম তাঁকে স্পর্শ করেনি। বিশশতকী আধুনিকতার বিভিন্ন লক্ষণও দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। পুরোনো রোমান্টিক কবিদের মতো

তিনি আস্থাশীল ছিলেন জগৎ ও জীবনের মঙ্গলবোধে। কিন্তু, তাঁর বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যে অনুরঞ্জিত। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে —

> হ্যেল্ডার্লিনের স্বতঃস্ফূর্ত পুণ্যচেতনার সঙ্গে তুলনা করলে,
> ধরা যাক, এলিয়টের 'ককটেল পার্টি'র ধর্মবোধকে মনে হবে
> একটি চেষ্টাকৃত বানিয়ে তোলা পদার্থ হৃদয় প্রনোদিত ভক্তি নয়,
> সাহিত্যরচনার একটি উপাদান বা অবলম্বন।[২৯]

আবার, হ্যেল্ডার্লিনের শেষ পর্যায়ের সব কবিতার মতো জটিল ও দুর্বোধ্য হ'লেও 'পাৎমস' সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> গীতিকবিতা নয়, মিস্টিকদের আত্মহারা উচ্চারণ নয়,
> একটি সুদীর্ঘ, শিল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত, বহুলাঙ্গ ঈশ্বর বিষয়ক
> কবিতা - তাতে এতদূর পর্যন্ত অনাস্থার অপনোদন সাহিত্যের
> একটি অসামান্য ঘটনা বলে চিহ্নিত হতে পারে।[৩০]

হ্যেল্ডার্লিনের বিশিষ্টতা বিশ শতকের আধুনিক কবিদের তুলনায় ভিন্নতর। ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য এক কবি। 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> তাঁর কবিতা যতবার পড়ি বা স্মরণে আনি, আমার মনে হয়
> তিনি যেন সত্যি দেবতাদের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন ...
> তাঁর ছন্দোবদ্ধ অমল পংক্তিগুলি যেন কোনো অলোকদ্রষ্টা
> ভক্ত হৃদয়ের স্তবগান। সেই আনন্দের অংশ দেবার আগ্রহ
> থেকেই এই অনুবাদগুচ্ছের জন্ম।[৩১]

ইউরোপীয় কবি ও কাব্যের কাছে আধুনিক বাংলা কবিতার ঋণ এখন সর্বজনবিদিত। ওইসব কবিতা থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতা নতুন সৃষ্টিপথের সন্ধান পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাবনার সঙ্গে এজরা পাউন্ড, ডি.এইচ.লরেন্স, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবোঁ, হ্যেল্ডার্লিন, রাইনের মারিয়া রিলকে প্রভৃতি ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের কাব্যচর্চার সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।[৩২] তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক সংকলনে পাউন্ড, পাস্তেরনাক, বোদলেয়ার, হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে ব্যতীত কামিংস, ওয়ালেস স্টীভেন্স প্রভৃতি আমেরিকান কবিদের অনুবাদও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, গদ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে অসকার ওয়াইল্ড, জিভাগো উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের প্রতি বাঙালি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করেছিলো।

ইউরোপীয় কবি ও কবিতার যে আলোচনা বুদ্ধদেব করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিন কবি হলেন, বোদলেয়ার, হ্যেল্ডার্লিন ও রিলকে। এঁদের মধ্যে বোদলেয়ারের প্রতি তাঁর সীমাহীন উৎসাহ ও একাত্মতা। হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে, জিভাগো - প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থগুলির ভূমিকায় ইউরোপীয় কবি ও

কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'হাউই' নামে অসকারওয়াইল্ডের গল্প অনুবাদের ভূমিকা ও ডঃ 'জিভাগো'র ভূমিকাটি নাতিদীর্ঘ। এঁদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও স্বল্প।

এইসব অনুবাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ - এতটাই একাত্মতা বোধ করেছিলেন তিনি বোদলেয়ারের সঙ্গে। যেন বোদলেয়ারের মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।[৩৩] বোদলেয়ার সম্বন্ধে এলিয়ট বলেছিলেন তিনি ফ্রান্সে আধুনিকতার প্রথম উন্মোচক, আধুনিকতার rebivation হয়েছিল তাঁর লেখায়। আর বুদ্ধদেবের লেখায় দেখা গিয়েছিলো, আপাদমস্তক আধুনিক হওয়ার আগ্রহ, আধুনিকতার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম। তাঁর-ই মতো বুদ্ধদেবেরও লেখায় দেখা দিয়েছিলো 'renovation of an attitude towards life' এবং এলিয়টের সমালোচনা থেকে তুলে এনে আমরা বলতে পারি তা 'no less radical and no less important'[৩৪]

বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারা ও প্রকরণে স্বস্তি পাননি বুদ্ধদেব। চিরাচরিত মঙ্গলবোধ ও কল্যাণবোধের যে ধারণা বাংলা কবিতায় বহু-প্রচারিত, সেই পুরানো ব্যবহৃত ধারণা নিয়ে কবিতা রচনা আর সম্ভব নয়, এমন-ই মনে হ'লো তাঁর। জীবনের নির্বাচিত খন্ড - বিচ্ছিন্ন অনুভূতি নয়, বাসনা-কামনা-লোভ-লালসা-যাবতীয় পাশবিক বৃত্তিগুলি মিলিয়ে যে মানুষ, তার সমগ্র অনুভুতি ও চৈতন্যকেই সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছেন। এই অভিনব পথে আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টায় বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমূখ পথ খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবোধ ও মঙ্গলবোধের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে তাঁরা ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার দিকে ফিরে তাকালেন। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলাসাহিত্য অবশ্য সব সময়ই প্রেরণা পেয়ে আসছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করতেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনার সময় প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপের প্রেরনা কাজ করেছে। আর, মহাযুদ্ধ যখন এক বিরাট নেতিবোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল বিশ্বজোড়া মানুষকে, ভারতবর্ষীয় ঔপনিষদিক অস্তি বাচকতায় আর আস্থা খুঁজে পেলোনা বাঙালি কবি। পর-পর দুটি যুদ্ধ তাঁদের জীবনবোধকেই পাল্টে দিল। রবীন্দ্র পরবর্তী অনেক কবিই ইউরোপীয়-দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। জীবনের ভয়াবহ শূন্যতা, বিরাট 'নাস্তি'র শেকড় তারা প্রোথিত দেখলেন ইউরোপের দর্শনে। জীবনের-ই রূপায়ণের জন্য তাঁরা ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার দিকে মুখ ফেরালেন। তাছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশের জন্যও এই সময় রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের ফিরে তাকাতে হয়েছিলো ইউরোপের দিকে। এঁদের মনে হয়েছে, দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ ভারতবর্ষীয় কাব্য উপাদান নিঃশেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রবলয় প্রতিধ্বনি করে নাম-মাত্র কবি হ'তে তাঁরা চাননি। রবীন্দ্রলয় অতিক্রম করে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাইলেন। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার দর্শনে বাংলা কবিতা রচনার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলো। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতা ও শিল্প সমালোচনার মাধ্যমে কবিতার নতুন সূত্র সন্ধান করেছেন বুদ্ধদেব। প্রথম থেকেই বাংলা আধুনিক কবিতা সমালোচিত হতে শুরু করেছিলো। সমালোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও মূলতঃ পাশ্চত্ত্য আদর্শে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব-পূর্ববর্তী মোহিতলালের আদর্শগত ধারনার ভিত্তি ছিলো ম্যাথুআর্নল্ড, ওয়ালটার পেটার, সোপেন হাওয়ার, অসকার ওয়াইল্ড। মোহিতলালের তুলনায় বুদ্ধদেব গ্রহন করলেন একটু পরবর্তী ইউরোপীয় কাব্য-

কবিতার ধারনাকে। বোদলেয়ার-হ্যেল্ডার্লিন-রিলকের সমালোচনা অনেকটা এই আগ্রহেরই ফল। ইউরোপীয় কবিতার ইতিহাসে এঁরা প্রত্যেকে বিশিষ্ট কবি। কিন্তু, এঁদের প্রতিষ্ঠা ভূমি মূলতঃ বোদলেয়ার। বোদলেয়ারে অনুপ্রাণিত হয়েই কবিতায় ক্রমাগত বিবর্তিত হয়েছেন রিলকে। বোদলেয়ারের হাতেই ইউরোপীয় কবিতার জন্মান্তর ঘটলো।

> তিনিই রোপণ করে দিয়ে যান সাহিত্যে সাঙ্কেতিক আন্দোলনের
> বীজ, এই বীজ-ই মহীরূহের আকার ধারন করে র‍্যাঁবো
> ও মালার্মের কবিতায়। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই ফরাসী
> symbolist / সাঙ্কেতিক / প্রতীকী আন্দোলন গভীর প্রভাব
> বিস্তার করেছিলো।[৩৫]

নতুন কবিতার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট বুদ্ধদেব বোদলেয়ারে খুঁজে পেলেন কবিতার এক নতুন উপনিবেশ। কবিতাকে যাতে নতুন করে তোলা যায়, পেলেন সেই পথ-প্রকরণ ও প্রেরণা। বোদলেয়ারকে তাঁর মনে হ'লো - 'কবিতার বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর'।[৩৬] জন্ম-রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেব বোদলেয়ার-এ দেখলেন রোমান্টিকতার এক নতুন জগৎ। রোমান্টিকদের মন্ময় আত্মহারা অনুভূতির বদলে জায়গা পেয়েছে বিবেক ও চৈতন্যপীড়িত মানুষের অসহায় আত্মগত বোধ। বোদলেয়ারের মধ্যে দেখতে পেলেন রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন।[৩৭] যাবতীয় রোমান্টিক বিলাসিতা ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন এমন এক তুরীয় অবস্থায়, যেখানে বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়, এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ। যার প্রভাবে সময়ের মন্থরতা অসহ্য হয়ে ওঠে, নিজেকে মনে হয় - 'নামহীন ত্রাসে পরিবৃত এক শিলাখন্ড মাত্র'।[৩৮] সময়ের এই ভয়ঙ্কর ভার থেকে মুক্তি অনায়ত্ত বলেই বোদলেয়ারে ব্যপ্ত হয়ে আছে এক বিবর্তনহীন বিশ্ব-বিষাদ। আত্মশোধনের জন্য আছে ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা, আত্ম-নির্যাতন-যন্ত্রনার নিবিড়তম অভিজ্ঞতা। ওঅর্ডস্বার্থ, কোলরিজ, শেলি-বায়রণের রোমান্টিক বিষন্নতা ছাড়িয়ে বোদলেয়ার যেন আরও খানিকটা দূরস্পর্শী, তাঁর দুঃখসাধনা আরও মর্মান্তিক। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে বোদলেয়ারের এই রোমান্টিক দুঃখসাধনা 'অনেক বেশী সত্যবাদী', অনেক বেশী 'সার্থক'।[৩৯] এভাবেই, কবিতা বিষয়ে বোদলেয়ারের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বুদ্ধদেব। বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদের ভূমিকায়, দীর্ঘ প্রবন্ধে অবিরত সমর্থন করেছেন বোদলেয়ারকে। বোদলেয়ারের মতো বুদ্ধদেব কবিতা বলতে বোঝাতে চাইলেন এমন রচনা যাতে সব অবান্তরতা বর্জন করে কবিতাকেই সর্বস্ব মনে হয়, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছু নেই। যার প্রতিটি অংশই কবিতা দ্বারা আক্রান্ত। আধুনিক কবিতার যাবতীয় সূত্র খুঁজে পেলেন বোদলেয়ারে। ইংলন্ডের ব্লেক, কীটস, কোলরিজ, জার্মানিতে হ্যেল্ডার্লিন, নোভালিস, ফ্রান্সের নের্ভাল, গ্যাটে, আমেরিকার এডগার অ্যালানপো, হুইটম্যান, - এঁদের তুলনায় বোদলেয়ারে তিনি খুঁজে পেলেন কবিতা বিষয়ক এমন কিছু নতুন সূত্র, যা সমন্বিত হয়ে 'ভাবীকালের ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠলো'।[৪০] পরবর্তী ফরাশি কবিতায়, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে শুধু নয়, বোদলেয়ারের কবিতার নান্দনিক সূত্র সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার উৎস হতে পারে - এমন-ই মনে করেন বুদ্ধদেব।

নির্দেশিকা

১. বসু, বুদ্ধদেব, সম্পাকদীয়, 'কবিতা', পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৬, ক্রমিক সংখ্যা ৬৩.

২. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮৯, পৃঃ ২৩।

৩. তদেব, পৃ. ২৫।

৪. বসু, বুদ্ধদেব, অনুবাদকের বক্তব্য, রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৯১, পৃ. ৭২।

৫. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ. ২৮০-২৮১।

৬. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, শার্ল বোদলেয়ার ঃ তার কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ. ১

৭. তদেব, পৃ. ৩

৮. তদেব, পৃ. ৪

৯. তদেব, পৃ. ২

১০. তদেব, পৃ. ৫

১১. তদেব, পৃ. ৭

১২. তদেব, পৃ. ৩১

১৩. তদেব, পৃ. ৩১

১৪. তদেব, পৃ. ৪

১৫. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৯১, পৃ. ১১

১৬. তদেব, পৃ. ১৩

১৭. তদেব, পৃ. ৩৩

১৮. তদেব, পৃ. ৩৪

১৯. তদেব, পৃ. ৩৮

২০. তদেব, পৃ. ৪১

২১. তদেব, পৃ. ৪১

২২. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬

২৩. তদেব, পৃ. ৪৬

২৪. তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪

২৫. তদেব, পৃ. ৬৪
২৬. তদেব, পৃ. ৩৩
২৭. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮৯, পৃঃ ২৫।
২৮. তদেব, পৃ. ২০
২৯. তদেব, পৃ. ১৯
৩০. তদেব, পৃ. ২২
৩১. তদেব, পৃ. ২৩
৩২. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ. ২২২
৩৩. আহ্‌মদ, শাহাবুদ্দিন, 'বুদ্ধদেব বসু ঃ বোদলেয়ার ও ল্য ফ্ল্যুর দ্যু মাল' এর অনুবাদ', উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম, ১৯৭৪, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃ. ৩৬
৩৪. Eliot, T.S., 'Baudelaire', selected essays, London, Faber & Faber Ltd., 1961, 3rd Enlarge Edition, page-426.
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরভি, শার্লবোদলেয়ার ঃ অনন্য স্রষ্টা, পরিশিষ্ট, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২, পৃ. ১৫৯
৩৬. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, শাল বোদলেয়ার ঃ তার কবিতা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ. ৬
৩৭. তদেব, পৃ. ৫
৩৮. তদেব, পৃ. ১৯
৩৯. তদেব, পৃ. ২২
৪০. তদেব, পৃ. ৫-৬

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির শিরোনাম - 'এলিজি ঃ বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি'[১] কবিতার প্রথম পংক্তিটি এরকম—

তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরোসা পেতো কবি, ছায়া পেতো,
সচ্ছলতা পেতো সুন্দর, নির্ভরযোগ্য কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হিমানী
পেতে পেতে মনে হয় আজো পাবো সহসা সন্ধ্যায়, ক্ষণকাল
ব্যস্ত তুমি ..... ।[২]

এই কবিতার-ই অন্য একটি স্তবকে অন্য একটি পংক্তি —

কিন্তু তুমি, প্রান্তর যেমন সীমাহীন, পারহীন সমুদ্রের আলেখ্য
যেমন তেমন অব্যর্থ, দীর্ঘ, কবিতার অগ্রজ কুসুম।[৩]

এই কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেবকে বলেছেন 'কবিতার অগ্রজ কুসুম', বলেছেন, তাঁর কাছে এসে অন্য কবিরা 'বৃক্ষের ভরোসা পেতো', 'ছায়া পেতো'। আধুনিক বাংলা কবিতার আশ্রয় যেন তিনি। এক হিসেবে আধুনিক বাংলা কবিতার অভিভাবক ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে এই অভিভাবকত্ব অর্জন করেছিলেন 'একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারপর বুদ্ধদেব বসু।'[৪] নিজে একজন প্রধান কবি হয়েও তিনি সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের অবিরত উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছে লেখায়। বুদ্ধদেবের এই ভূমিকা আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বিরল। বুদ্ধদেব সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য ঃ

আমার অবাক লাগে, আবিরাম নিজে লিখেও অন্যের লেখা সম্বন্ধে
কি করে একজন এতটা শ্রদ্ধা এতটা আগ্রহ দেখাবার ফুসরত করে
উঠতে পেরেছেন ! ..... সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠে স্বাগত
জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুকদিয়ে আগলানো, -
সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর
কে করেছেন ?[৫]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলাসাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠপোষকের নয়, প্রহরজাগা সান্ত্রীর কিংবা সেনাপতির।[৬] অজিত দত্ত লিখেছেন —

আমার কবিতা লেখার ক্ষমতায় আমার কোনো আস্থা ছিলোনা।
..... বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলাপ হবার পর বুদ্ধদেব যখন আমার
লেখার প্রশংসা করলো, লেখার জন্য আমাকে রোজ তাগিদ
দিতে থাকলো, তখন থেকেই বলতে গেলে আমি কবিতা লেখার
মতো আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেলাম।[৭]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন - তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন নবীন কবিরা।

> একজন নবীন কবি কি করে জানবেন যে তাঁর কবিতা সক্ষমতার
> সীমারেখাটা স্পর্শ করেছে কি-না ? ..... বুদ্ধদেব বসুর মতন একজন
> কবির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আত্মবিশ্বাস অনেক দৃঢ় হয়।[৮]

কবিতা লেখায় সমকালীন কবিদের প্রেরণা যেমন দিয়েছেন তেমনি সমকালীন কবিতার বিচারও করেছেন বুদ্ধদেব। বিচার না বলে একে উপভোগ বলাই সংগত। কেননা, প্রচলিত অর্থে যাকে বিচার বলে, সেরকম কিছু ঘর্মাক্ত - কলেবর রচনা বুদ্ধদেবের একেবারেই নেই। ফলে, তাঁর রচনা বা সমালোচনা সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দেরই প্রকাশ। আর, তাঁর কৃতিত্ত্ব এইখানে যে, নিজের আনন্দকে তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তাঁর এই দক্ষতা তাঁর অপরূপ বাগবিন্যাস প্রণালীর জন্যে, এবং তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেও। সমকালীন কবিদের রচনা থেকে তিনি এমন অনেক ব্যবহৃত শব্দ, মিল বা ভাবচ্ছবি আবিষ্কার করেন, এমন অনেক হীরকখণ্ড খুঁজে পান যা পাঠকের চোখেও মায়াবী আলোর ছোঁয়া লাগায়। তাঁর এই বৃত্তিটি নির্বাধ হয়ে উঠেছিলো বিশেষভাবে, ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পরে যেসব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের বলবার কথাও ছিল নতুন, তাঁদের বাহন ও প্রচারক রূপেই 'কবিতা' পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। অবশ্য, এরকম ভাবনার সূচনা হয়েছিলো আরো আটবছর আগে, ঢাকা শহরে যখন বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত তাঁদের 'প্রগতি' ছাপায় অক্ষরে প্রকাশ করলেন তখন থেকেই। কবিতার মতো 'প্রগতি'র ও উদ্দেশ্য ছিল নতুন সাহিত্য প্রকাশ করা, সর্বোপরি, প্রচার করা। 'প্রগতিতে'ই জীবনানন্দের কবিতা প্রথম আলোচিত হয়েছিল। কবিতা প্রকাশিত হলে —

> প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলার আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে
> এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনোদিন মুছবেনা।
> আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী
> বস্তু নয় - সে কথা ঐ চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালি পাঠক বর্গ
> অনুভব করেন। সেই সঙ্গে আবিস্কার করেন এমন সব কবিকে
> যাঁরা ভবিষ্যতে কবিতার নানা দিক বিজয় করেছেন।[৯]

প্রকৃতপক্ষে, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়- এই সব আধুনিক কবি 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমেই পাঠকের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। এঁদের অনেকের কবিতাই আগে নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পাননি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনাও হয়নি।

> কবিতা পত্রিকাই তাঁদের প্রথম কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা
> নিয়ে আলোচনা করে।[১০]

'কবিতা'র প্রথম বছরেই ছাপা হয় জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'বনালতা সেন', সমর সেনের

'স্মৃতি' বিষ্ণু দে,র 'বিবমিষা', বুদ্ধদেবের 'চিল্কায় সকাল' সুধীন্দ্রনাথের 'জন্মান্তর' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' কবিতা। 'কবিতা'র দ্বিতীয় বছরে জীবনানন্দ দাশের অনেকগুলি কবিতা এবং অন্যান্য অনেক কবির কবিতার সঙ্গে প্রকাশিত হয় সমর সেনের "কয়েকটি কবিতার" সমালোচনা। 'নবযৌবনের কবিতা' - এই শিরোনামে প্রকাশিত হয় লেখাটি। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। এমনও মনে করা হয়েছে যে —

> বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না - করতেন এবং
> সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখতেন তাহ'লে
> তখনকার দিনের সমর সেন হয়তো অমন উৎসাহে অত কবিতা
> লিখতেন না এবং তাঁর কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়তো না [১১]

- এই বছরের-ই চৈত্র সংখ্যায় বুদ্ধদেবের আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের সমালোচনা। 'প্রকৃতির কবি'-এই শিরোনামে লেখা। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিতার একজন প্রধান কবি। কিন্তু, একথা বুদ্ধদেব-ই প্রথম বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন —

> ... জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান
> কবি ব'লে মনে করি, ...।[১২]

মোটকথা 'কবিতা'র প্রায় সমস্ত পৃষ্টাগুলিতে অধিকার বিস্তার করেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার তরুণতম কবিরা। তাঁদের কবিতা যে শুধু প্রকাশিত হয়েছে, তাই নয়, তাঁদের কাব্যগ্রন্থগুলিও বস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে 'কবিতা'য়। কখনো জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ কবি স্বয়ং এই সব সমালোচনামূলক প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছেন। কখনো সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী', 'অর্কেষ্ট্রা', বিষ্ণু দে'র 'চোরা বালি', অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'খসড়া', 'একমুঠো' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', 'কবিতা'র পাতায় সমালোচিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোকে স্বয়ং সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর এইসব সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধগুলি 'কবিতা' ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। পরে সেগুলি 'কালের পুতুল', 'সাহিত্যচর্চা', 'উত্তর তিরিশ', স্বদেশ ও সংস্কৃতি', 'সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' - প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া আছে 'An Acre of Green Grass'এ ইংরেজি প্রবন্ধের সংকলন এবং 'প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ' - এগুলিতেও আধুনিক কবি ও কবিতার সমালোচনা মূলতঃ জায়গা জুড়ে আছে। 'An Acre of Green Grass'এর প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই অবশ্য 'কালের পুতুলে'র প্রবন্ধ গুলির ইংরিজি প্রতিরূপ। কেবল শরৎচন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধটি 'কালের পুতুল'এ নেই। ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সংকলন' গ্রন্থে অধিকাংশ প্রবন্ধ পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। দু-একটি প্রবন্ধ পত্রিকা থেকে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থভুক্ত এইসব প্রবন্ধগুলিতে বুদ্ধদেব মূলতঃ আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচার ও প্রসারের কথা বলেছেন। আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন। নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পাঠকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিরাও কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল। ঐতিহাসিক দিক

থেকে একই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও তাঁদের মধ্যে আছে

ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত প্রচুর পার্থক্য।[১৩]

আধুনিক কবিদের অন্তর্গত এই বিরোধ ও বৈচিত্র্য বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। আর, প্রতিপাদ্য হয়েছে আধুনিক কবিতার মূল ধারাটিকে বিশেষ ভাবে সনাক্ত করা। অবশ্য, এই আধুনিক কবিতাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকল ভাবে শনাক্ত করা যায়না।[১৪] তিনি আধুনিক কবিতাকে বলেছেন বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি ও সন্ধানের কবিতা। আবার,

এর-ই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ,
বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।[১৫]

- আধুনিক কবিতার এই বহুগামী চরিত্র লক্ষণটি বুদ্ধদেব তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কখনো বিভিন্ন কবির রচনায়, কখনো একই কবির বিভিন্ন সময়ের রচনার মধ্যে থেকে তিনি আধুনিক কবিতার অন্তর্বীজটির সন্ধান করেছেন। যা প্রায় তাঁর সমকালেই অঙ্কুরিত হয়ে, ক্রমে পত্রে -পুষ্পে বিকশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর সমকালীন ও কিছু পূর্ববর্তী আধুনিক বাঙালি কবি ও কবিতা সমালোচনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার এই তত্ত্ব ও চারিত্র্য স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

। ১ ।

বুদ্ধদেব-কৃত আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'মাইকেল' নামের প্রবন্ধটির কথা। কেননা, 'মধুসূদন এক অর্থে আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক কবি।'[১৬] মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেব একটি মাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। 'কবিতা' দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৫৩) 'মাইকেল' নামে তা প্রকাশিত। পরে, সাহিত্যচর্চা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে প্রবন্ধটি।

মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য নেতিবাচক। তাঁর মতে, কবিকর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন মধুসূদন। আধুনিক পাঠকের পক্ষে তাঁর রচনাবলীর আধিকাংশ প্রায় অপাঠ্য। তাঁর প্রহসন দুটি অনেকটাই তাঁর 'ছেলেমানুষি'।[১৭] 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি হয়েছে ছাঁচে-ঢালা, কলে-তৈরী নির্দোষ নিস্প্রাণ সামগ্রী।[১৮] আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাইকেলের প্রভাব প্রায় শূন্য মাইকেলের রচনায় প্রথাবিরুদ্ধতা নেই, আছে চিরাচরিত প্রথার একান্ত অনুকরণ। রাম-রাবণ সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবনার বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন নি। রাক্ষস রাবণ, দুশ্চরিত্র রাবণের ধারনা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল এবং এজন্যই 'রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন'[১৯] এই প্রশ্ন কাব্যে উত্থাপন করলেন না কবি। রাবণ যেন তার চারিত্রিক অসততার জন্যই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। ফলে, প্রবল পরাক্রান্তের মহাসর্বনাশকে কেন্দ্র করে যে ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হয়, রাবণ চরিত্রে তাও অনুপস্থিত। মাইকেলের রাবণ চরিত্রে মহৎ সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই।

মাইকেল মধুসূদনকে বুদ্ধদেব বাংলাভাষাতেও দক্ষ শিল্পী বলতে চাননি। আবাল্য মাতৃভাষাকে

অবজ্ঞা করেছেন তিনি। বাংলাসাহিত্যে তাঁর দক্ষতা আকস্মিক ঘটনা। এর সঙ্গে নিরন্তর অনুশীলণের কোনো যোগ নেই। মাইকেলের ভাষাকে তিনি বলেছেন - 'মৃত শব্দরাজিতে আর্কীণ মাধকেলি কলরোল',[২০] যা কেবল কানে বাজে কিন্তু মরমে প্রবেশ করেনা। সার্থক স্রষ্টার মতো কোনো ঐতিহ্যকেও আত্মস্যাৎ করতে পারেন নি মধুসূদন। হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অধিকার করতে না পেরে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন চিরাগত প্রথার অন্ধকূপে। তাই, তাঁর মেঘনাদ, প্রমীলা কিংবা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা কেউ-ই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের বীরনারীও চিরাচারিত প্রথার কাছে সমর্পিত-প্রাণ। তাঁরা কেউ-ই নারীত্ব বিষয়ে বিদ্রোহিনী নয়। ব্রজাঙ্গনা কাব্যেও চিরাচরিত প্রেম প্রকৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে মাইকেল যশের অধিকারী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে নবজন্মের যবনিকা উত্তোলন করেছে মাত্র। আসল পালার সূচনা রবীন্দ্রনাথ থেকে। মধুসূদন যদি এই ছন্দের যবনিকা উত্তোলন নাও করতেন, রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার যাত্রা শুরু হতে পারতো। মাইকেলের ছন্দ অত্যন্ত কড়া, কখনো নরম সুরে বাজেনা। এর কোনোখানে গান নেই, সমস্তটা বক্তৃতা। একে তিনি বাংলাসাহিত্যে 'নির্বীজ ঐশ্বর্যের উদাহরণ'[২১] বলেছেন। মাইকেলের জীবন ও সৃষ্টির মধ্যেই তিনি দেখেছেন কেবল অবিমিশ্র অপব্যয়।

মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমালোচনা প্রসঙ্গে টি.এস. এলিয়ট-এর লেখা Milton সমালোচনার কথা উল্লেখযোগ্য মনে, হয়।[২২] এলিয়ট Milton এর উপর প্রথম যে প্রবন্ধটি লেখেন, অথাৎ Milton-I, তাতে তাঁর বক্তব্য হল মিল্টন কবি হিসেবে বিশেষ উঁচুদরের নন্ এই মত প্রকাশের পর সমালোচক মহল থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ওঠে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে Milton-II, এলিয়েট উল্লেখ করেছিলেন, যে, মিল্টন একেবারে নীচু দরের কবি নন্, কিছু কিছু ভালো imagery তাঁর রচনায় আছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেছিলেন মিল্টন উঁচুদরের কবিই। একুশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায়। পরিণত বয়সে 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪, আষাঢ়) প্রবন্ধে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। মধুসূদনকে অনন্য সাধারণ কবিপ্রতিভার অধিকারী বলতে কুণ্ঠিত হননি। এবং মেঘনাদবধের অসাধারণ শিল্পঋদ্ধির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'মেঘনাদ বধে'র দ্বিতীয় সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এতে তিনি দেখেছেন শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি। আধুনিককালে, মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদন সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাঁর 'কবি শ্রী মধুসূদন' গ্রন্থে। মোহিতলাল 'মেঘনাদবধ'কে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একদিকে মধুসূদনের সুগভীর কবিকল্পনা, অন্যদিকে, মানবতাবোধ - মোহিতলালের বিবেচনায়, এই দুটি বস্তুই এই কাব্যের ব্যাপক সাফল্যের হেতুমূল।

> হোমারের মহাকাব্য হইতে তিনি সেই আদিম মানবতার রসপ্রেরণা
> লাভ করিয়াছিলেন। বাঙালি কবি কৃত্তিবাস ও কালিদাসের কাব্য
> হইতে-তিনি সেই মানবতায় অতি সরল ও সহজ রূপ সংগ্রহ
> করিয়াছিলেন। ..... মধুসূদনের কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আছে।[২৩]

তাঁর বক্তব্য —

> মেঘনাদ বধে'র ভাষায়, যমক অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য প্রায় সর্বত্র আছে,
> তাহার কারণ শুধু শব্দালঙ্কার প্রীতি নয় - অব্যর্থশব্দধ্বনির দ্বারা
> ভাবের যথাযথ রূপসৃষ্টিও তাহার অভিপ্রায়।[২৪]

'মেঘনাদ বধ'- কাব্যের ভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা।

> ছন্দে ও বাগবন্ধে, ধ্বনি ও রূপ ব্যঞ্জনায় তাহাকে কবির কল্পনা
> অনুযায়ী যে বেশ বিন্যাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার অভ্যস্ত
> রুচি ও রীতি সংস্কার কে অনেকাংশে বর্জন করিতে হইয়াছে,
> ..... তাহার ফলে ভাষা শুধুই ভাষামাত্র নাই, একটি স্বতন্ত্র
> কবিভাষায় পরিণত হইয়াছে।[২৫]

মোহিতলাল মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মধুসূদন-ই একমাত্র আধুনিক।

> রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়, বাংলাকাব্যে আধুনিকতা অতঃপর যে
> পূর্ণস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার আদি প্রবর্তক মধুসূদন।
> ..... তাহাতেই আধুনিক কাব্যমন্ত্রে বাঙালির প্রথম দীক্ষালাভ হইয়াছিল।[২৬]

অর্থাৎ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তি হিসেবেই তিনি মধুসূদনের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। মধুসূদন সম্পর্কে মোহিতলাল কিংবা বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী সমালোচনা থেকেও আমরা জানি যে, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের অবদান অসামান্য। ফলে, মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ণে বুদ্ধদেবের 'মাইকেল' প্রবন্ধটি আজ প্রায় গুরুত্বহীন।

। ২ ।

'কালের পুতুল' গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু।

১) প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য (১৯৪১),

২) প্রমথ চৌধুরী (১৯৪৬)[২৭]

'An Acre of Green Grass' এর 'Pramatha Chowdhury' প্রবন্ধটি মূলতঃ এই দুই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ। দুটি প্রবন্ধেই তিনি বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট অবদানের কথা বলেছেন। বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্থান নির্নয় করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর দেশবাসী সুবিচার করেনি। জীবিতকালে তাঁর অসাধারন কর্মের তুলনায় প্রতিষ্ঠা তিনি পাননি। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি উদাসীনতা আরও একবার প্রমাণিত হ'ল। প্রায় আশি বছরের দীর্ঘ জীবন ও সাহিত্যসাধনায় তিনি বাংলাদেশে সমাদৃত হতে পারেননি।

বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

গদ্যরচনাা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর-ই প্রমথচৌধুরীর স্থান। গদ্যের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, অকারণ বিশেষণ প্রয়োগ প্রভৃতির ফলে গদ্যরূপের মধ্যে যে শৈথিল্য অনেক সময় এসে যায়, প্রমথ চৌধুরী সচেতনভাবে সেগুলিকে পরিহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পে, প্রবন্ধে, বাংলা গদ্যের যে পরিচ্ছন্ন, পরিমিত চেহারাটি রূপলাভ করেছে, তাঁকে অনুকরণ যোগ্য বলেছেন।

> প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আরো ব্যাপক হ'লে বাংলা গদ্যের অন্য
> একটি ধারা আমরা এতদিনে দেখতে পেতাম।[২৮]

বাংলাসাহিত্যে চলিত ভাষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য। পরিচ্ছন্ন গদ্য রীতির সঙ্গে অনন্য সাধারণ স্টাইলের মেলবন্ধন ঘটালেন তিনি।

প্রমথ চৌধুরী অনুকরণযোগ্য লেখক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি পাঠক তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেনি। 'সবুজ পত্র' এবং 'সবুজপত্র' -পরবর্তী অনেক লেখক প্রথম চৌধুরীর রচনা দ্বারা প্রভাবিত। প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না হয়েও অনেকে প্রমথ ভজনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই অসামানয ব্যক্তিত্বের কাচে ঋণ স্বীকার করেছেন।

> One feels that pramatha chowdhury is an alien in Rabindra nath's
> world, whereas Rabindra nath has free acess to pramathean
> drawing - room : he visits, dines and lingers, but does not stay. .....
> But to the last day, his respect for pramatha chawdhuri's intellect
> remained undiminished[২৯]

প্রমথ চৌধুরীর জগতে মানব স্বভাবের কৃত্রিম খণ্ডীকরণের স্থান নেই।[৩০] প্রমথ চৌধুরী এরকম এক অবিচল চরিত্র যে, তিনি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। পাঠক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে এই নিরপেক্ষ শিল্পীর প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না। Boris pasternak তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "Doctor zivago" তে লিখেছিলেন -

> Gregoriousness is always the refuge of mediocrities, ...
> Only individual seek the truth and they shun those whose sole
> concern is not the truth.[৩১]

অর্থ্যাৎ মূখবদ্ধতা মধ্যবর্তীর আশ্রয়। শিল্পের পথে প্রমথ চৌধুরী একলা-পথিক।

প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এই সমালোচনা অনেকটা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরীর অনুরূপ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রমথ চৌধুরী বিষয়ক আলাদা কোনো প্রবন্ধ লেখেননি। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর প্রমথ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে ঋণস্বীকার করেছেন বুদ্ধদেবের এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া

যেতে পারে। ... একজনের নাম খুব বড় করে আমার মনে পড়ে,
তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথের নাম আমার বিশেষ করে মনে
আসার কারন এই যে আমি তাঁর কাছে ঋণী।[৩২]

এছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ৪৫নং কবিতা প্রমথ চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। 'ঘরে-বাইরে' উৎসর্গ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রমথ চৌধুরীর শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন তাঁর পরিচয় ফুটে উঠেছে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে -

... বিষয়কে সহজ করা, উপাদেয় করা অথচ পুষ্টিকর অংশে
কৃপণতা না করা, এ প্রমথ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না।[৩৩]
"তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি কোথাও ফাঁক
নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। ..... তোমার
গদ্যরচনারীতির মধ্যে যে নৈপুন্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা
তার পুরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়।[৩৪]

দুটি চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিশিষ্টতার কথা বলেছেন। এবং তিনি মনে করেন পাঠকসমাজে প্রমথ চৌধুরী যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হতে পারছেন না, লেখক পাঠকের মধ্যে যে নিবিড় যোগ সৃষ্টি হচ্ছে না, তার মূলে লেখকের ত্রুটি নেই, আছে পাঠকের অনগ্রসরতা। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্যও অনেকটা এরকম। বুদ্ধদেবও লিখেছেন -

সেই অবিচল চরিত্রে যে সব লেখকের প্রতিষ্ঠা, যাঁরা পাঠক সংখ্যার
হ্রাস বৃদ্ধির উর্দ্ধে, প্রমথ চৌধুরী সেই বরণীয়দের অন্যতম।[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির কথা বাদ দিলে বুদ্ধদেব বসুই প্রথম প্রমথ চৌধুরী'র সমালোচনা করে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন একথা বলা যায়। প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর খ্যাতি এবং কীর্তি সুমাত্রা সূত্রে আবদ্ধ নয় বলে আক্ষেপ করেছেন। বুদ্ধদেব বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্বের, প্রতি এবং তাঁর ব্যতিক্রমী চারিত্র্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন। সাহিত্যশিল্পী হিসেবে তিনিও যে যথেষ্ট মর্যদা পেতে পারেন সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

। ৩ ।

'কালের পুতুল' প্রবন্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ বিষয়ক মোট তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ক) জীবনানন্দ দাশ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) খ) জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন (১৯৪৩), গ) জীবনানন্দ দাশের স্মরণে (১৯৫৫)।

'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে' প্রবন্ধটি 'কালের পুতুলে'র ১ম সংস্করণে (১৯৪৬) ছিলোনা, 'কালের

পুতুলে'র নতুন সংস্করণে (১৯৫৮) এটি যুক্ত করা হয়েছে। নতুন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব নিজেই একথা উল্লেখ করছেন। এছাড়া, 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কেননা, এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের কিছুটা অংশ মূলতঃ বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ-সমালোচনা। কালানুক্রমিক দিক থেকে "জীবনানন্দ দাশের স্মরণে" প্রবন্ধটি সবশেষে লেখা হয়েছে, জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে ১৯৫৫ সালে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধটিকেই আমি প্রথমে নিলাম। কারণ এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব জীবনানন্দের স্মৃতি-তর্পণ করতে গিয়ে এমন সব বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, যা তাঁর সমালোচক জীবনের সূত্রপাত হিসেবে চিহ্নিত হ'তে পারে। অন্যদিকে, পাঠকের সঙ্গে জীবনানন্দকে সামগ্রিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রবন্ধটির শুরুতেই বুদ্ধদেব জানিয়েছেন যে, কল্লোল পত্রিকায় 'নীলিমা' কবিতাটি লিখে জীবনানন্দ দাশ স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। 'কল্লোলে' প্রকাশিত ঐ কবিতায় এমন একটা সুর ছিলো যার জন্যে লেখককে ভুলতে পারা যায়নি। এরপর বুদ্ধদেব তাঁকে 'প্রগতি' পত্রিকায় আমন্ত্রণ জায়িয়েছেন। এবং তখন থেকে একের পর এক কবিতা লিখে জীবনানন্দ এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন। সমালোচক হিসবে বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকেই জীবনানন্দের এই স্বতন্ত্র জগৎ, অভিনব কবি কল্পনা বা জীবনানন্দের অদ্ভুত জগতের রূপ-ছবির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় পরিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'প্রগতি'তে এইসব কবিতা প্রকাশকরা ছাড়াও নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। প্রচারের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতাও ছিলো। বিশেষ করে জীবনানন্দ ছিলেন আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু নীরব, 'নির্জন' কবি প্রতিবাদে ছিলেন নিঃশব্দ। জীবনানন্দ তাঁর কবি জীবনের সূচনা থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত নিন্দুকের নিন্দাবাণে জর্জরিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় বক্তব্যে এইসব আক্রমণ প্রতিবোধের চেষ্টা করেছেন।

জীবনানন্দ সমালোচনায় বুদ্ধদেব তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপিত করেছেন —

ক) জীবনানন্দ বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন।

খ) তিনি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক।

গ) তিনি বাংলাকাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একক বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল এবং এই উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল যুগে 'ধ্যানী কবি'[৩৬] তিনি।

ঘ) জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি এবং প্রকৃত কবি।

ঙ) বাংলা কাব্যধারায় জীবনানন্দ সুরের নতুনত্ব আনলেন।

চ) রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পষ্ট প্রভাব নেই জীবনানন্দে। বরং, শেলী, কীট্‌স, সুইনবার্ন ও প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের প্রভাবের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।

ছ) তাঁর কবিতায় নির্জনতা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে এক সম্পূর্ন রূপকথা - জগতের প্রতিবেশ।

জ) আমাদের ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল জীবনের এক আদিম বেদনা জীবনানন্দের কাব্যের ভিত্তি চরনা করেছে।

ঝ) জীবনানন্দের কাব্যে আছে অজস্র চিত্র রচনার বিশেষত্ব, উপমা, কল্পনা ও ইঙ্গিত প্রকাশ করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া।

ঞ) আধ্যাত্মিকতার বদলে আছে 'শারীরিক তথা অবয়ব সংক্রান্ত' বিষয়ের প্রাধাণ্য।

ট) বৌদ্ধিক চেতনার বদলে ইন্দ্রিয়পরতা বেশি এসেছে।

ঠ) ছন্দকে ইচ্ছেমতো ভেঙে ভেঙে, বাঁকিয়ে - চুরিয়ে, নিজের উপলব্ধির বাহন করেছেন কবি।

ড) জীবনানন্দের কবিতার আশ্চর্য ধ্বনিময়তা কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।

ঢ) নাম শব্দ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহারেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল।

জীবনানন্দের, কবিতার মধ্যে বুদ্ধদেব শুনেছেন এক আশ্চর্য নতুন সুর - 'জলের মতো ঘুরে - ঘুরে একা কথা কওয়া।'[৩৭] ঘুর্ণায়মান জল স্রোতের মতোই সেই সুর ছড়িয়ে পড়ে, কানে এসে বাজে, মর্মে প্রবেশ করে। অনুভব - বেদ্য, মর্মগ্রাহ্য এই সুরের মধ্যে বুদ্ধদেব খাঁটি কবিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৪৩ সালে লেখা 'জীবনানন্দ দাশ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি, প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন জীবনানন্দের নির্জনতা। আধুনিক বাংলাকাব্যে এই বিশিষ্ট্য বিশেষ মাত্রা পেয়েছে জীবনানন্দে। আধুনিক বাংলাকাব্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটির উপর বুদ্ধদেব আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, জীবনানন্দ কে বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের আলোচনা চলতে পারেনা। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য রচনায় এক 'বিষন্ন গাম্ভীর্য, লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব। তিনি যে 'নির্জনতম' কবি, একথা বুদ্ধদেবই প্রথম বলেছেন। আধুনিক কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থাকলেও এই আন্দোলন কবিকে স্পর্শ করেনি। এতে কবির আত্মকেন্দ্রিকতা স্পষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু, এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় এক আত্মনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন চরিত্রবান কবিকে। এই কবিত্ব বুদ্ধদেব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন "বনলতা সেন" কাব্য গ্রন্থে। ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে -

> আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে সেই যে
> একজন চিরকালের কবিকে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার
> দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই ... সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে
> কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।[৩৮]

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৪২ সালে। ১৯৪৩-এ বুদ্ধদেব লিখলেন "জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতাসেন" প্রবন্ধটি। এরপরে জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী')১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), বেরিয়েছে। আরও পরে, 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৫০) লিখিত হয়েছে। কিন্তু, ১৯৪৬ সাল নাগাদ - যখন 'মহাপৃথিবী' বেরিয়ে গেছে, 'সাতটি তারার তিমির'এর কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে - 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনা হ'য়ে গেলো অন্যরকম। তিনি সেখানে বললেন -

> জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল ? ... জীবনানন্দ দাশ
> আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর

প্রাক্তন রচনাকে দীপ্যমাণ করেছিলো। মনে মনে এখনো তিনি
নির্জনের নির্ঝর, তাঁর চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী।
কিন্তু, পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওয়ারের
নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক
রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এই টেই প্রামণ করবার প্রাণান্তকর
চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়।
এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন
হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ ব'লে আপত্তি নয় ; নিঃসুর ব'লে
আপত্তি, নিঃস্বাদ ব'লে।[৩৯]

বাস্তবিক্, এই পর্বে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেলো। কবিতার বিষয় হিসেবে উঠে এলো ইতিহাস, সমাজ, সামাজিকতা। বুদ্ধদেব যেন জীবনানন্দের এই ধারার কবিতা গুলিকে মানতে পারছেন না। তাঁর রুচির কাছে এগুলির অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলেও বুদ্ধদেব এখানে খানিকটা যেন সীমাবদ্ধ। জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। আসলে, শুদ্ধশিল্পবাদী বুদ্ধদেব শিল্পীর সামিাজিক দায়বদ্ধতা মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজে অবশ্য একসময় প্রগতি লেখক সংঘে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়।

১৯৩৮ সালে কলকাতার আশুতোষ হলে নিখিলভারত প্রগতি লেখক
সংঘের যখন সম্মেলন হয়, তার সভাপতি মণ্ডলীতে .... বাঙালী
কবিদের মধ্যে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু।[৪০]

১৯৪২ সাল নাগাদ প্রগতি লেখক সংঘের কার্যকলাপ নানাভাবে ব্যাহত হতে থাকে। এর পর, বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই সংঘের যোগ ছিল কি-না সেখবর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের জগৎ যে পাল্টে গেলো তা বোঝা যায়। কেননা, কবি এবং কবিতার প্রতি তাঁর প্রত্যাশার চেহারা ভিন্ন হয়ে গেলো ততদিনে। ১৯৪২ সালে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো '২২শে শ্রাবণ' নামে এক পয়সায় একটি সিরিজের একটি পুস্তিকা। এর প্রথম কবিতাটি ছিলো - 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', লিখেছেন - বুদ্ধদেব বসু। একে, ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে বেশ প্রগতিশীল বলেছেন নরেশ গুহ।[৪১] 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রথম সংস্করণে কবিতাটিকে স্থান দিয়েছিলেন কবি। কিন্তু, দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কবিতাটিকে তিনি নিঃশব্দে বর্জন করেছেন। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র দে'জ সংস্করণের সম্পাদনা করেছেন নরেশ গুহ। এতে তিনি যে নতুন দশটি কবিতা নির্বাচিত করেছেন তার মধ্যে দুটি হ'ল 'যামিনী রায় কে' এবং ''রবীন্দ্রনাথের প্রতি''। নরেশ গুহ লিখেছেন -

.... কবিতা দুটি একটু আলাদা জাতের রচনা। সতর্ক পাঠক লক্ষ
করবেন, এদের মধ্যে সমাজচেতনার মতো একধরনের সাময়িক

প্রবণতার ছাপ আছে, যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসুকেও
ক্ষণিকের জনয নাড়া দিয়েছিলো।[৪২]

এই সমাজ-চেতনা যে "ক্ষনিকের জন্য"ই বুদ্ধদেবকে নাড়া দিয়েছিলো, একথা ঠিক। কেননা, ১৯৪২ পরবর্তী কোনো রচনায় আর তাঁর এই চেতনায় পরিচয় পরিস্ফুট হয়নি। বরং এর পরে দেখি, তিনি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতার বিশ্বাস সমপূর্ণ খারিজ করে দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতা লিখলেন ১৯৫৫ সালে। সেখানে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে ছিলেন মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আশার বাণী শুনিয়েছেন কি শোনান নি, সেটা তাঁর বড় পরিচয় নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ নিরিবিলিতে আরো অন্য কথা বলেছেন তাঁর কবিতায় যার অনুরণন কখনো থামবে না।[৪৩] কবিতা ও শিল্প বিষয়ে তাঁর এই ধারনার জন্যই হয়তো জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতাকে বুদ্ধদেব মেনে নিতে পারেন নি।

জীবনানন্দের একজন বিশিষ্ট সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তিনি 'কবি জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থে জীবনানন্দের আলোচনা করেছেন। এর আগে 'নিরুক্ত', 'পূর্বাশা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবনানন্দ বিষয়ক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার কোনো বিশেষ পর্বের অনুরাগী ছিলেন না। বরং তাঁর সমগ্র কাব্য-পর্ব স্বতন্ত্র আবেদন নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছে। আর জীবনানন্দের কবিতার যে সমালোচনা বুদ্ধদেব করেছেন, সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের নিজের বক্তব্য -

আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে
এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে 'বনলতা সেন'-এর
পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও
পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি।[৪৪]

এখনেই জীবনানন্দ লিখেছেন -

'নিরুক্ত' ও 'পূর্বাশার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার
শেষের দিকের কবিতায় আমার পরিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ
করেছে।[৪৫]

আসলে, "ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি যে একদিন 'সাতটি তারার তিমির' পার হয়ে "বেলা - অবেলা কালবেলা'র পথ বেয়ে 'শত জল ঝর্ণার ধ্বনি'[৪৬] শুনে ছিলেন, সেই পর্বে জীবনানন্দের কবিতার আস্বাদনে বুদ্ধদেব অনুপস্থিত। 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। যখন চারপাশে যুদ্ধ - দক্ষির-পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলি ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, যখন এশিয়ায় অগণন শকুন উড্ডীন ও লোভাতুর, তখন জীবনানন্দের কবিতায় বারে বারে ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, বালি, হঙকঙ, সাংহাই প্রভৃতির উল্লেখ অকরণ নয় মোটে। তবে, 'কবিতা'র (১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা) সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু বাদ দিলে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনা হয়েছে সম্পূর্ণ ইতিবাচক। একজন কবিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে, কবি-জীবনের শুরুতে কবিকে চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে, - 'বনলতা সেনে'র পরিণত কবির সঠিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সমালোচক বুদ্ধদেব যে অসীম দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতেই হয়।

। ৪ ।

বাংলাকাব্যে বিশশতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক নাগাদ রবীন্দ্র বলয় অতিক্রম করে কবিতা লেখায় সচেষ্ট হয়েছিলেন একদল তরুণ কবি। এই তরুণ কবি-দলে মোহিতলাল, নজরুলের সঙ্গে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এই তিন কবিই নতুন সুর শোনলেন বাংলা কাব্যে। এবং যতীন্দ্রনাথে এই নতুনত্ব দেখা দিল একটু ভিন্নভাবে। সেই সময় তিনি আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে।[৪৬] এই সুরকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -

> সহজ, টাটকা, আটপৌরে।[৪৭]

রুক্ষ, ধুসর জীবনের যে অপূর্ব কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন, 'মরীচিকা' (১৩৩০), 'মরুশিখা' (১৩৩৪), 'মরুমায়া' (১৩৩৭) -এ জাতীয় কাব্য-নামে তার ব্যঞ্জনা গভীরতর রূপে প্রকাশ পেয়েছিলো।

কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে কী দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে উত্তরসূরী কবিকুল কী পেলেন, মেটেকথা, বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান কী—এর একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করেছেন বুদ্ধদেব। লিখেছেন — উত্তরসূরী কবিদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন,

> আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎথেকে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে।[৪৮]

কবিতার প্রকরণ বিষয়েও উত্তরসূরী কবির কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যতীন্দ্রনাথ।

> পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার
> জাত যায় না।[৪৯]

শুধু ভাষা ও ছন্দই নয় নতুনত্ব ছিল তাঁর কবিতার পংক্তিতেও।

> এক একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পংক্তি।[৫০]

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র জীবনাদর্শ থেক তা ভিন্ন, ভিন্ন মোহিতলাল থেকেও। বুদ্ধদেব তাতে প্রথম দেখেছেন ব্যঙ্গোক্তি, সংশয়, নেতিবাদ। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার অচল অনড় ভিত্তি নড়ে উঠলো। কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনা রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর হলো। সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হল, তা রূপের দিক থেকে ভাবের দিক থেকে নয়। আর সেই প্রভাবও ক্ষণিক এবং অদূরস্পর্শী। তথাপি তিনি প্রশংসনীয় 'রবীন্দ্রনাথের মতো' লিখতেন না বলে। এটি সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি প্রধান ঘটনা।

যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বুদ্ধদেবের যাবতীয় বক্তব্য মেনে নিয়েও একথা বলতেই হবে, যে, একজন কবির পক্ষে শুধুমাত্র রবীন্দ্র-বলয় অতিক্রম করাই একমাত্র লক্ষ্য, এরকম ভাবলে কবির বিশেষত্বকেই খর্ব করা হয়। কবির বক্তব্য আসলে, সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত থেকে গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের শুভ ও মঙ্গলবোধের ধারনা কিছুতে নষ্ট হয় না। কিন্তু, যতীন্দ্রনাথের তাতেই সন্দেহ হ'ল। রবীন্দ্রনাথও দুঃখকে অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর চোখে দুঃখ শেষ পর্যন্ত আনন্দলাভের একটা অপরিহার্য ধাপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দরূপ খুঁজেছেন, সেখানে

প্রথম কাব্য 'মরীচিকায়' (১৯২৩) যতীন্দ্রনাথ খুঁজে চলেছেন 'দুঃখের রুদ্রমূর্ত্তি'।[৫১]

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বব্যাপী অমৃতত্ত্বের কথা বললেন, যতীন্দ্রনাথ তাতেই দেখলেন সর্বব্যাপী দুঃখ। এই বিশিষ্টতাই যতীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে স্বতন্ত্র করে তোলে। বুদ্ধদেবের আগে যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর প্রবন্ধটি 'কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', ১৩৫৪ সালে লেখা।[৫২] যতীন্দ্রনাথ সমালোচনায় এই দুই কবি সমালোচকের সদৃশ্য আছে, পার্থক্য ও আছে। যতীন্দ্রনাথের ভাষা প্রসঙ্গে মোহিতলাল লিখেছেন —

> ভাষার সকল রীতিকে লংঘন করিয়াই, এই যে একটি অনবদ্য
> বাক্‌ভঙ্গীর সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ঐ এক কবির কবিপ্রাণের ভাষা -
> আর কোনো কবির সাধারণ কবিতার ভাষা উহা নহে।[৫৩]

যতীন্দ্রনাথের উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে মোহিতলাল লিখেছেন -

> .... উপমা ও দৃষ্টান্তের অব্যর্থতা, সময়ে সময়ে কাব্যরসকেও
> অতিক্রম করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও চমকিত করে।[৫৪]

ভাষা, চিত্রকল্প বিষয়ে বুদ্ধদেবের বক্তব্যও অনেকটা মোহিতলালের অনুসারী। তবে, মোহিতলালের সমালোচনার সঙ্গে পার্থক্য এসেছে অন্য দিক থেকে। বুদ্ধদেব যতীন্দ্রনাথের কবিতায় যে সংশয় ও নেতিবাদ লক্ষ্য করেছেন, মোহিতলাল তাঁর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধি। যতীন্দ্রনাথের অস্তিক্যবাদের কথা দ্বর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় —

> .... এই মরুচারী কবি দুঃখ, বেদনা, বিষন্নতা ও নৈরাশ্য নিয়েই
> স্বগতোক্তি করেননি। সর্বোপরি যতীন্দ্র নাথ ছিলেন সৌন্দর্যরসিক ও
> ঈশ্বর-চেতনায় দৃঢ়বিশ্বাসী মানবতাবাদী কবি।[৫৫]

মোহিতলালের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সমালোচনার পার্থক্য থাকলেও এই দুই কবি সমালোচকই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় যতীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় করেছেন। এবং তাঁদের বক্তব্য মূলতঃ ইতিবাচক।

। ৫ ।

'An Acre of Green Grass' -এর ইংজেরী প্রবন্ধটি বাদে নজরুল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু একটিমাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সালে লেখা। পরে "কালের পুতুল" প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে কবি নজরুলের কবিত্বশক্তি, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান, তাঁর বিশেষত্ব, সঙ্গীতে তাঁর অবদান ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নজরুলের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ তুলে ধরেছেন তিনি।

দেশজোড়া এক অস্থির আবর্তের মধ্যে নজরুল আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে। গান্ধীজী অসহযোগ করছেন। জাতীয় আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দেশবাসীও এই আন্দোলনে প্রবলভাবে সাড়া দিচ্ছে। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন — অসহযেগের অগ্নিদীক্ষার পর সমস্ত মনপ্রাণ

যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই হল বাণী।[৫৬] নজরুলের কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হ'লে

তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিল।[৫৭]

দেশ ও দেশবাসীর উদ্দীপনাকে কবিতায় বাণীবদ্ধ করে নজরুল খুব তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোনো কবি হননি। কবি হিসেবে তিনি 'জাত বোহেমিয়ান'।[৫৮] এলোমেলো, বিশৃঙ্খলা ও বেনিয়মের মাঝে তিনি কবিতা লিখতেন, গান গাইতেন। নজরুল তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে নজরুল সবচেয়ে বড় কবি। সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিল তাঁর কবিতায়। তা সত্ত্বেও, তাঁর স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব সুস্পষ্ট। অতি অল্প সময়ে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করছেন তিনি। এই লোকপ্রিয়তার কারন তিনি চড়া গলায় কবি। 'An Acre of Green Grass'-এর ইংরেজী প্রবন্ধটিতে ও বলেছেন -

Nazrul I repeat, is a loud poet; his poetry is boisterous.[৫৯]

এই বিশেষত্বের জন্য ইংরেজী সাহিত্যের কিপলিং-এর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। কিপলিঙের মতো তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন।

নজরুলের রচনার কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর লেখা কখনও ফাঁকা আওয়াজ সর্বস্ব হয়েছে। অনেক সময় এর মধ্যে কবিত্বশক্তিরও অভাব ঘটেছে। প্রেমের বা প্রকৃতির বিষয়ে কবিতায় এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, "অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে রুদ্ধস্রোত।"[৬০] গদ্যলেখক হয়ে জন্মান নি নজরুল। গদ্যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচনার আর একটি প্রধান ত্রুটি হল অদম্য স্বতস্ফুর্ততা। এই স্বর্তঃ স্ফুর্ততা তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি।

যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে ; ভাবতে বুঝতে
সংশোধন করতে কখনো তিনি থামেন নি, কোথায় থামতে হবে
দিশে পান নি।[৬১]

তাঁর কবিত্বশক্তিতে আছে পরিমিতিবোধের অভাব। তাঁর রচনার উদ্দাম বেগ দুর্দমনীয় গতি সঠিক মাত্রায় রূপায়িত হয়নি। এদিক থেকে বায় রণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ধরা পড়ে। তাঁর লেখার মধ্যে পরিণতির কোনো ইতিহাস নেই।

প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি।[৬২]

তাঁর প্রতিভা ছিল, সম্পদ ছিল, কিন্তু সাহিতয কর্মে সে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নেই।

সঙ্গীত শিল্পী নজরুলের মূল্যায়ণও করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে, নজরুলের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী তাঁর গানের। স্বদেশী গান তথা বীরত্বব্যঞ্জক গানের ক্ষেত্রে

রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের স্থান। সংগীত রচয়িতা নজরুলের প্রশংসা করলেও একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করছেন বুদ্ধদেব। ত্রুটিটি হল — 'দুরতিক্রম্য রুচির দোষ।'[৬৩]

নজরুল প্রতিভার মূল্যায়ণে বুদ্ধদেব তাঁকে কবি ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর গানের সম্ভার অল্প হলেও তা অক্ষয়। বাংলা কবিতার ইতিহাসেও তাঁর আসন স্থায়ী। কেননা, তাঁর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথও নজরুলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'ধুমকেতু' সম্পাদক নজরুলকে আশীর্বাদ করেছিলেন।[৬৪] রবীন্দ্রবলয় থেকে যে শক্তিতে নজরুল বেড়িয়ে এসেছিলেন সেই শক্তিমানকে কবিগুরু অভিনন্দন জানিয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদারও নজরুলের গুণগ্রাহী ছিলেন। কবি নজরুল সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন -

> বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ
> অনুভব করিনাই .....।[৬৫]

বুদ্ধদেব-পূর্ববতী রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের বক্তব্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব অনেকটাই একমত। তবে বুদ্ধদেব যত বিস্তৃতভাবে সমালোচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্নয় করেছেন তেমনটি রবীন্দ্রনাথ, এমনকি মোহিতলালও করেননি।

। ৬ ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেব মোট পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'কালের পুতুল' প্রবন্ধ গ্রন্থে আছে তিনটি —

ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫)

খ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী (১৯৩৭)

গ) সুধীন্দ্রনাথ দেত্তর কবিতা (১৯৪৫)

এছাড়া, 'সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আছে -

ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৬০) - প্রবন্ধ । সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লেখা এটি। প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকয় 'কবির মৃত্যু' এই শিরোনামে প্রকাশিতও হয়েছিলো ১৯৬০ সালের ২৫শে জুন সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই প্রবন্ধটির রচনাকালও ১৯৬০। এই গ্রন্থেই আছে আর একটি প্রবন্ধ 'সুধীন্দ্র দত্ত ঃ কবি' (১৯৬০)। এটি মূলতঃ - নাভানা কর্তৃক প্রকাশিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহে ভূমিকা। প্রথম দুটি প্রবন্ধে কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের সাধারণ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব। তাছাড়া, 'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী' তে সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তার বিশেষ পরিচয় প্রসঙ্গে দুটি কাব্যের মূল্যায়ণ করেছেন তিনি। তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেষ্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী'র মধ্যে এক অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের কথা বলেছেন। এবং সামগ্রিকভাবে কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে লেখা 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' (১৯৬০) প্রবন্ধে কবি সুধীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, ব্যক্তিত্বও প্রতিভা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া, সমকালীন দুই কবি জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্য এরকম — সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধিনির্ভর কবি। গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্ত্তি নেই তাঁর রচনায়। তাঁর শব্দ ব্যবহার শিক্ষিত ও যথাযথ। চিন্তা ও যত্নপ্রসূত। সংস্কৃতে যাকে বলা হ'তো 'শাস্ত্র কবি'[৬৬] তাঁকে তাই বলতে ইচ্ছে করে। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম করেন তিনি। ভাষাকে নানা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে ও পরিভাষায় আকীর্ন করে তোলেন। তাঁর রচনাবিন্যাসে অন্যমনস্কতার কোনো স্থান নেই। তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা ও দেহবিলাসিতা আছে। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে মোহিতলালের তুলনা চলে। অবিরত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, মননশীলতার জন্য তাঁকে 'বীরকবি'[৬৭] বলাযায়। তিনি 'স্বভাব কবি নন্, স্বাভাবিক কবি'।[৬৮] কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিয়ন্তর পরিশ্রম করেছেন। বাংলাভাষায় কবিতার পংক্তি ইংরেজি ধরনে বিশ্লেষণ করে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিতেন। তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুত নিয়ে আর কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতেঅগ্রসর হননি।

সুধীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর প্রাকরণিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর ধারনায় যথেষ্ট স্পষ্টতা ছিল। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তাঁর শূন্যস্থান অপূরনীয়। 'অর্কেষ্টা' কাব্যে তিনি 'কবি যতটা, কারিগর ঢের বেশি।'[৬৯] ছন্দের নিখুঁত ব্যবহার ও আঠারো মাত্রার পয়ার নিয়ে তাঁর দুঃসাহসী পরীক্ষা বিস্ময়কর। তাঁর 'অকেষ্টা' কাব্যের তুলনায় "ক্রন্দসী" আরও পরিণত। তিনি আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যগের শ্রেষ্ঠ কবি।[৭০] কাব্যাদর্শের দিক থেকে তিনি রোমান্টিক এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক।[৭১] তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ।[৭২] অল্পমাত্র আয়াষে সে দুরূহতা অতিক্রম করা যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুই কবি সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ। এই দুই কবির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

> একদিকে স্বজ্ঞা ও সুতীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ও আর একদিকে সুতীক্ষ্ণ মেধা
> ও জগতের সংস্কৃতি।[৭৩]

দুই কবির মধ্যে মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থাকলেও আধুনিক মানুষের অন্তর্গত চৈতণ্যের দ্বন্দ্বে দুজন-ই ক্ষতবিক্ষত দুজন-ই শেষ পর্যন্ত অন্ধকার থেকে আলোয় পথ খুঁজেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বুদ্ধদেব মূলতঃ সুধীন্দ্রনাথের ইতিবাচক সমালোচনা করলেও কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবিতার গম্ভীর ধ্বনিগৌরব সত্ত্বেও পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অভিভূত হওয়া যায়না। প্রতি পংক্তির অর্থগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়। তাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আর পাঠকের উপভোগের মধ্যে একটা ব্যবধান থেকেই যায়। যে জাদুতে কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে, যাতে জীবনের কোনো গূঢ় প্রদেশ উদভাসিত হয় বাক্যের সেই 'ঐন্দ্রজালিক সাধনার পথে'[৭৪] তিনি চলেন না।

কবি সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথও। অবশ্য, পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেননি তিনি। সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠি পত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথের "স্বগত" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর ১১-ই এপ্রিল, ১৯৩৯ সালে অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি —

> সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এ বাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে।
> তাহলেও সংস্কারাটয় একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারিনে।[৭৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথের ভাষাকে যাঁরা 'দুরূহ' বলেন তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে একমত হ'তে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁদের মতকে উড়িয়েও দিতে চাননি। তিনি সুধীন্দ্রনাথকে 'মনন-বিলাসী'[৭৬] কবি বলেছেন। ১৯৩৯ সালে অমিয় চক্রবর্ত্তী কে লেখা চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তা বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে পৃথক, এমন বলা যায় না। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের "সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেষ্টা" প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ১৯৩৫ সালে। যেখানে তিনি সুধীন্দ্রনাথকে 'বুদ্ধিনির্ভর'[৭৭] কবি বলেছেন। তাঁর "সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী" ১৯৩৭- সালে লেখা। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেও একথা বলা যেতে পারে যে, সুধীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণে বুদ্ধদেবের প্রবন্ধগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন।

। ৭ ।

অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাব্য বিষয়ে বুদ্ধদেব তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'কালের পুতুল' গ্রন্থে।

ক) 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ খসড়া' (১৯৩৮)

খ) 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ একমুঠো' (১৯৪০)

এবং গ) 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল' (১৯৫৫)

প্রথম দুটি পুস্তক সমালোচনা। তৃতীয় রচনাটিতে আছে কবি অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাব্যের সামগ্রিক সমালোচনা। তাঁর কাব্যের পালাবদল ; এক-একটি মোড়-ফেরা, রূপান্তর - বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। প্রথম প্রবন্ধেই 'খসড়া'র কবিকে 'আধুনিক কবিদের অন্যতম'[৭৮] বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। 'একমুঠো' প্রকাশিত হলে, একে বুদ্ধদেব 'খসড়া'র 'দ্বিতীয় অধ্যায়'[৭৯] বলেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধ 'অয়িম চক্রবর্ত্তীর পালাবদল' - নামটি-ই তাৎপর্যপূর্ণ। অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবি স্বভাবের পর্বে পর্বে যে রূপান্তর ঘটে গেছে, যে ভাবগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেচে, সেই চলমান কবিস্বভাবের একটি স্থিরচিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। অমিয় চক্রবর্ত্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' থেকে 'একমুঠো', 'পারাপার', 'পালাবদল'-এর যাবতীয় রূপ-রূপান্তরের কথা আছে এখানে। প্রবন্ধটির নাম ও দিয়েছেন তাই 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল।

বুদ্ধদেবের মতে আধুনিকতার যাবতীয় লক্ষ্য ছড়িয়ে আছে অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায়। আধুনিক কবির শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি কবিতার আসরে এসেছেন। 'খসড়ায়' কবির বিশেষত্ব ছিল দৃষ্টি

ভঙ্গি'র বহির্মুখিতা, 'একমুঠো' তে কবির এই বিশেষত্বকেই তিনি বলেছেন 'সর্বদেশীয়'।[৮০] বর্ষা বিষয়ক কবিতা লেখায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে "আধ্যাত্মিক কবি তিনি।"[৮১] তাঁর কাব্যে বিচিত্র প্রসঙ্গের জটিলতার মধ্যেও আছে এক বিরাট সংগতি। বাংলাভাষায় প্রেমের কবিতা রচনায় তাঁর স্থান বিশিষ্ট। দুঃখের কথা, বেদনার কথার মধ্যেও কখনো কখনো কৌতুক সৃষ্টি করেছেন তিনি। চার মহাদেশ - জোড়া তাঁর কাব্যের পটভূমি।[৮২] তাঁর রচনায় দৈহিক প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। 'রক্ত মাংসের সংক্রাম সবচেয়ে"[৮৩] কম তাঁর কবিতায়।

কলাকৌশলের দিক থেকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর কবি। তাঁর কবিতায় ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সার্থক হয়েছে। তাঁর কবিতার উপমা রূপকগুলি আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর কবিতার পরিভাষাও এযুগের। ভাষার ব্যবহারে তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে, ভাষাগত কিছু ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব।

ক) 'পারাপার' ও 'পালাবদলে'র কবিতায় তল প্রত্যয়ের ব্যবহার পৌণঃপুনিক।[৮৪]

খ) কোথাও কোথাও 'স্মরণী', 'আনন্ত', 'আনন্তিক' প্রভৃতি অভিনব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[৮৫]

গ) 'ধ্যানতা', 'পুণ্যতা', 'সংসর্গতা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োজনও 'ধ্যান', সংসর্গ', 'পুণ্য' দিয়ে চলতে পারে।

তাহালেও, বিষয়গত ও ভাষাগত দিক থেকে অমিয় চক্রবর্ত্তী আধুনিক। তিনি আত্মসচেতন কবি। এই আত্মসচেতনতা আধুনিকতার-ই লক্ষণ। আধুনিকতার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

বুদ্ধদেব বসুর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমিয় চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষে ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন।[৮৬]

> নবজাতক' কাব্য -গ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপর-ই দিয়েছিলুম।
> নিশ্চিত ছিলুম, কারন দেশবিদেশের সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁর
> সঞ্চরণ।[৮৭]

তিনিও মনে করেন, এদেশের কবিতায় বিদেশের আবহ লক্ষণীয় মাত্রা পেলো অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায়। অমিয় চক্রবর্ত্তীর মেজাজের সঙ্গে হপকিন্সের মেজাজের মিল লক্ষ্য করে দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন -

> উভয় কবিই উচ্ছাস অপছন্দ করেন ... প্রয়াস চিহ্নহীন আত্মসমাহিত
> সারল্যের দিব্য বিভাই তাঁদের কাব্যের সম্পদ।[৮৮]

প্রচলিত ছন্দোশাস্ত্রে এই দুই কবির-ই আস্থা ছিলোনা। সুইনবার্ণের অতিকথন দোষ থেকে কাব্যের উদ্ধারের জন্য হপ্‌কিন্স যেমন ছন্দের নব নব শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন ও ব্যাকরণ বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রানুসরণ থেকে বাংলাকাব্যের মুক্তির জন্য অমিয় চক্রবর্ত্তীও তেমনি করেছেন।[৮৯] অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় 'স্বেচ্ছাকৃত শব্দার্থবিপর্যয় কে তিনি আধুনিক বাংলাকাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত

করেছেন। তবে, দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' - এর প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ সালে, তাঁর বহু পূর্বে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যেই অমিয় চক্রবর্ত্তী বিষয়ে বুদ্ধদেবের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। অমিয় চক্রবর্ত্তী যে নিয়মিত ছন্দের বাইরে গিয়েও কবিতা লিখেছেন, একথা বুদ্ধদেব-ই প্রথম বলেছেন। তিনি-ই প্রথম অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় অসম পংক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেন, অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় আছে সংশয়ের দোটানা। বারংবার বিশ্বাসের শৈথিল্য তাঁর অন্তরের এই গভীরতর উপলব্ধিকে দোলায়িত করেছে।[৯০] - এই সংশয় দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন, বেদনা - বিক্ষোভের আলোড়ন ও অস্থিরতা, এই গভীর অশান্তি আধুনিক যুগোত্থিত। এই লক্ষণ অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একথা যেমন দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন, বুদ্ধদেব তারও আগেই অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতার এই বিশেষত্বকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন।

। ৮ ।

সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭) প্রবন্ধে সমর সেনের স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব ইত্যাদির সঙ্গে সমর সেনের কয়েকটি কবিতার স্বরূপ স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। এবং বাংলা সাহিত্যে 'কয়েকটি' কবিতা'র স্থান নির্ণয় করেছেন তিনি। এর মধ্যেই সন্ধান করেছেন তার পরবর্তী পালাবদলেরও ইশারা।

বুদ্ধদেবের মতে, সমর সেনের কবিতায় একধরনের বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট। এই বিদ্রোহ বিশেষতঃ রীতির দিক থেকে।[৯১] তাঁর কবিতা কেবল গদ্যে রচিত। তাঁর গদ্যচ্ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়। কবিদের প্রথানুগ সৌন্দর্য সাধনায় সমর সেন ব্যতিক্রম। সমকালীন সমাজশক্তির ক্ষয়, অবক্ষয়, দুর্বলতা, পঙ্কিলতা, ব্যভিচার - এসবের ফলে, ক্রমাগত মানবজীবনের ভারসাম্যহীনতার দ্রষ্টা তিনি। এসব উপেক্ষা করে, স্থানিক ও সাময়িক ঘটনায় দৃক্‌পাত না করে জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে গুরুত্ব দিতে পারেননি কবি। পারিপার্শ্বিক জীবন ও প্রতিবেশের উদ্দাম ব্যভিচার ও বিকৃতি কবিকে পীড়িত করেছে। এই বিকৃতির ফলে, তাঁর কবিতার লক্ষণ হিসেবে বড় হয়ে উঠেছে এক অসুস্থতাবোধ। কখনো বা আধুনিক নগর জীবনের প্রায় অনুপুঙ্খ ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। এতে কবির শক্তি ও পরিণতির স্তর খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সময়ের রঙ ধরা পড়েছে কবির কাব্যে। 'কয়েকটি কবিতা'র মধ্যেই তিনি একটি পালাবদলের আভাস খুঁজে পেয়েছেন। এই কাব্যে বিষন্ন নাবিকের গানে তিনি সেই মোড় ফেরার সূচনা লক্ষ্য করেছেন। 'কয়েকটি কবিতা' আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। বুদ্ধদেব নিজে একে 'কাল প্রভাবে কিছু বেশী আধুনিক'[৯২] বলেছেন। আধুনিক যুগের ক্লান্তি, অবসাদ, ক্ষয় অনেক বেশী ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কবি হিসেবে বুদ্ধদেব এই আধুনিকতার বিকার, বিকৃতি ও অবক্ষয়ের দ্রষ্টা। সমালোচক হিসেবে এই ক্ষয়শীল আধুনিকতার নিরীখে সমর সেনের কবিতার বিচার করেছেন।

'কবিতা' পত্রিকায় সমর সেনের কবিতা প্রথম প্রকাশিতা হ'লে বুদ্ধদেব বসুকে ১৯৩৫ সালের

তরা অক্টোবর (শান্তিনিকেতন থেকে) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> সমর সেনের কবিতা কয়টিতে রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য
> প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।[৯৩]

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি' কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। একটি চিঠিতে[৯৪] সমর সেন কবিগুরুর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। 'কয়েকটি কবিতা' প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত জানা যায়নি। তবে, সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ' বেরোবার পর ১১.০৩.৪০ তারিখে লেখা সমর সেনের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে, সে
> আমরা অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারনের কাছে এর ম্যাপ এখনো
> স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়নি। সুতরাং এখানে তোমার আসন অল্প
> লোকের কাছেই স্বীকৃত হ'তে বাধ্য।[৯৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, সমর সেনের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যে আশা পোষণ করতেন, তা পূর্ন হয়নি। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তাতে সমর সেনের কবিতা সংকলিতও হয়নি। কিন্তু 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় 'নবযৌবনের কবিতা' নাম দিয়ে 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা লিখলেন।[৯৬] এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই শক্তি ও পরিণতির স্তর খুঁজে পেলেন।

সমরসেন সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্যের সমর্থন মেলে অন্য সমালোচকদের বক্তব্যে। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন

> The second fact about Samar Sen's pieces is the newness of their
> mood and content.[৯৭]

তিনি বলেছেন —

> Today, therefore, Samar Sen is an up-to-date representative poet.[৯৮]

বুদ্ধদেবের ভাষায় 'শহরের কবি', 'কলকাতার কবি' সমর সেন। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন - "মানসিকতায় অসম্ভব রকম খাঁটি আর্বান মানুষ" তিনি। আবার, বুদ্ধদেব যেমন সমর সেনের কবিতার হতাশা-নৈরাশ্য-অবক্ষয় ক্লান্তির মধ্যে একটা উত্তরণের আলোকবর্তিকা দেখেছিলেন-তেমনি শঙ্খঘোষ ও লিখেছেন —

> .... তাঁর কবিতা নিছক 'ডেকাডেন্স' এর বিমর্ষতা থেকে উত্তীর্ণ
> হয়ে আসে, সেইটে আছে বলেই স্তব্ধ রাত্রের একাকিত্বের মধ্যেও
> আশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তাঁর কবিতার বিরহী নায়ক.... ।[৯৯]

তাহলেও, সমর সেনের কবিতায় আধুনিক জীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, শূন্যতা - এক বিরাট নেতিবাদ জায়গা জুড়ে আছে।

নেতির বর্নহীন শূন্যতায় বাস করে অস্তিত্ব ও সদর্থকতা সম্বন্ধে সে
হয়ে ওঠে আদ্যোপান্ত সংশয়ী।[১০০]

অনিশ্চিত, অনিকেত, ক্লান্ত, বিষন্ন দিন-রাত্রি - শূন্যগর্ভ 'না' এর জগৎ তাঁর কবিতার মূল প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে —

জাহাজের অদ্ভুত শব্দ, মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা যদিও কোনো হতত্তরদূর
দিগন্তের দিকে আহ্বান জানায়, তবু, সচেতন জ্ঞানপাপী মন জানে,
কোনো মহত্তর দিগন্ত নেই। দূর সমুদ্র থেকেও যে গান ভেসে আসে,
সে বিষন্ন নাবিকের গান, বা নাবিকের বিষন্ন গান।[১০১]

বুদ্ধদেব বসুও মনে করেছিলেন -

রোমান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোমান্টিক হ'তে পারেননি
ব'লে সমরসেন দীর্ঘশ্বাস ফেঁলেছিলেন 'কয়েকটি কবিতা'য়।[১০২]

কেননা,

এই কবির অবিকল চৈতণ্য জানে বিষন্নতাই, নিঃসঙ্গতাই অনিবারনীয়
পরিণাম-পরিণাম নিরাশা।[১০৩]

তাই, বারবার ফিরে আসা এই বিষন্নতার বোধ, ক্লান্তি সংশয় আধুনিক সময়-স্বভাবকেই মূর্ত করে তোলে। সমর সেন প্রবলভাবেই আধুনিক কবি। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় সমর সেনের কবিতার এই বিশেষ দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বুদ্ধদেব-পরবর্তী সমালোচকবর্গের বক্তব্যও তাঁর সমালোচনার পরিধির বাইরে যেতে পারেনি।

। ৯ ।

বিষ্ণুদে বিষয়ক একটি মাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রবন্ধটির নাম 'বিষ্ণুদে ঃ চোরাবালি' (১৯৩৮)। এটি মূলতঃ পুস্তক সমালোচনা। চোরাবালি 'কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণুদে'র অসাধারন দক্ষতার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। 'ঘোড়সত্তয়ার' কবিতটির স্থান নির্ণয় করেছেন বর্তমান বাংলাসাহিত্যে। কবি হিসেবে বিষ্ণুদের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

'পরিচয়' - পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত বিষ্ণুদে'র 'ঘোড়সত্তয়ার' কবিতাটিকে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলেছেন। তাঁর মতে এই কবিতা কেবল বাংলাভাষাতেই নয়, পৃথিবীর যেকোনো ভাষাতেই গৌরবের বিষয়।[১০৪] 'ঘোড়সত্তয়ার' কবিতায় ধ্বনির উত্থান - পতন, অনিয়মিত মিল, আকস্মিম অনুপ্রাস, নাট্য ও গীতির মিশ্রণ ইত্যাদি গুণের জন্য —

পুরো কবিতাটি জটিল ও গম্ভীর সংগীতের মতো মনের মধ্যে
হানা দিতে থাকে।[১০৫]

এছাড়া, এই কবিতাটি বোঝার জন্য পৃথক প্রযত্নেরও দরকার হয়না। এটি এই কবিতার অন্যতম গৌরব। বিষ্ণুদে'র 'ওফেলিয়া', 'ক্রেসিডা' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে তিনি বলেছেন ধ্বনি-নির্ভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা নেই। শুধুমাত্র ধ্বনির উপর বিষ্ণুদের স্বচ্ছন্দ প্রভুত্বের জন্য বাংলা কাব্যজগতে বিষ্ণুদে'র আসন স্থায়ী হ'তে পারে বলে মনে করেন তিনি।

'চোরাবালি'র কবি হিসেবে বিষ্ণুদে'র শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা ও শৈথিল্যের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। যেমন পয়ার রচনায় বিষ্ণুদের কৃতিত্ব অনেক কম। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাটি লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বুদ্ধদেবের বক্তব্য -

> যেকোনো অবস্থাতেই একটি কাব্যগ্রন্থ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয়
> বহন করে - তাকে কেউ হাতে ধ'রে নিয়ে এসে সভায় বসিয়ে দিয়ে
> গেলো এটা কাব্য-প্রেমিকের কাছে বাহুল্য ব'লে বোধ হয়।[১০৬]

বিষ্ণুদে'র কাব্যে ব্যবহৃত অত্যধিক অপ্রকলিত, দুর্বোধ্য কিছু শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। 'ক্রতুকৃতম্', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ'[১০৭] ইত্যাদি কথাগুলোর জমকালো আওয়াজ প্রীতিকর হলেও, এ জাতীয় শব্দ অভিধান দেখার অন্তরায়। সাধারণ অভিধানে এসব শব্দ সবসময় পাওয়াও যায়না। ফলে, পাঠক এসব শব্দে বিভ্রান্ত হতে পারেন। সমকালীন অন্য কবিদের তুলনায় বিষ্ণুদে-র প্রতি তাঁর উৎসাহ যথেষ্ট কম। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন যে, বিষ্ণুদে-র অল্প বলার চাতুরী তাঁকে মুগ্ধ করে।[১০৮] বিষ্ণুদে সমালোচনায় তিনি নিজেও যেন সেই আর্ট বজায় রেখেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকবিতায় একজন প্রধান কবি বিষ্ণুদে। তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর অন্যতম "মূলাধার কবি"[১০৯] ও বলা হয়। তিনি বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। কিন্তু জীবনদর্শনে তাঁদের সঙ্গে আছে মেরুপ্রমাণ ভিন্নতা। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে তিনিও বুঝেছিলেন - রবীন্দ্র-অনুসরণে এর মুক্তি নেই। তাহলেও, বুদ্ধদেব তাঁর সম্পর্কে মিতবাক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুদে-র 'রাজায়-রাজা' প্রবন্ধটি। বুদ্ধদেবের প্রতি বিষ্ণুদে-র প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় আছে এখানে। তাছাড়া, বিষ্ণুদে-র 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্যে' প্রবন্ধে ও বুদ্ধদেবের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন বিষ্ণুদে। যে কারনেই হোক, সমকালীন এই কবি সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

> আপনার কোনো কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না।[১১০]

তবে, বুদ্ধদেবের বক্তব্য একেবারে অভিনব নয়। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে বিষ্ণুদে কে লিখেছিলেন—

> তোমার নতুন লেখা বইখানি পড়তে চেষ্টা করিনি, তা ঠিক নয়।
> কিন্তু তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছো যে,
> আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে।[১১১]

১৯৩৫ সালে 'কবিতা' পত্রিকা বেরোবার পর, এই বছরের ৩রা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও তিনি লিখেছেন —

> বিষ্ণুদে-র কবিত্বশক্তি আছে, কিন্তু তাঁকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে,
> সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো
> বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে, কিন্তু, এগুলি
> প্রায়-ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে,
> তবে বলতেই হবে, এটা জবরদস্তি।[১১২]

বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় বিষ্ণুদে-র এই মুদ্রাদোষের কথা অবশ্য বলেন নি।

আসলে, বিষ্ণুদে তাঁর কাব্যে বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক বহু প্রসঙ্গ আপন ভাবনা প্রকাশের আধার রূপে ব্যবহার করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে এই সাঙ্গীকরণ অভিনব। বিষ্ণুদে-পূর্ববর্তী অন্য কোনো কবিই এই নির্মিতির কথা ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথও নন। এই অনর্জিত সংস্কার এবং কাব্যপাঠে বিশ্বসাহিত্য সাঙ্গীকরণের অনভ্যাস বিষ্ণুদে বিষয়ক এরকম সমালোচনার একটি কারণ হতে পারে। বিষ্ণুদে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের লেখা নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বিষ্ণুদে-র কবিতা পাঠে অথবা বিষ্ণুদেকে বোঝার পক্ষে খুব সহায়ক হতে পারেনি।

। ১০ ।

সুকান্ত সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। 'কবিতা' দ্বাদশবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৫৪) 'সুকান্ত' প্রথম প্রকাশিত হয়।

সুকান্তের কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - 'মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের কিশোর সুকান্তের কবিতা দেখে বুদ্ধদেব বিস্মিত হয়েছিলেন।[১১৩] তাঁর এই বয়সের কবিতাগুলিই পরে 'পূর্বাভাস' কাব্যে ছাপা হয়েছিলো। সুকান্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য

> সে একটি ভালো লাইন লিখলে উৎসাহ পেয়েছি নিজের কাজে।
> ... ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট
> ক'রেই বলে।[১১৪]

একজন কবির পক্ষে এগুলি বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা নাহলেও এত কম বয়সী কিশোর কবির পক্ষে এসবই উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে বুদ্ধদেবের। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নামের আদ্যক্ষরে যেমন মিল আছে, তেমনি,

> .... কী প্রসঙ্গে , কী আঙ্গিকে, কী অঙ্গীকারে পদাতিকের একান্ত
> অনুগামী সে।[১১৫]

রাজনৈতিক পদ্য লিখে নিজের শক্তির অপচয় করেছে সে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও রাজনৈতিক

মতবাদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে স্বাধীনতা ছিল। সুকান্তের ক্ষেত্রে —

তা হয়ে উঠেছিলো সুচিন্তিত দাসত্ব।[১১৬]

অথচ, তাঁর কবিত্বশক্তি ছিলো। অনেক উদ্দেশ্যহীন কবিত্বময় পংক্তি তিনি লিখেছেন। পরে, তিনি শুধু-ই রাজনৈতিক মতাদর্শ-প্রধান কবিতা লিখেছেন। সামাজিক শাসন - শোষণ, শাসক-শাসিতে সম্পর্ক তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। 'সিগারেট', 'রাণার', 'সিঁড়ি', 'কলম' তাঁর এই মনোভাবের প্রতীক কবিতা। এগুলিও কবিতাই। কিন্তু, বুদ্ধদেব এর চেয়ে ভালো কবিতার আভাস পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। সম্ভাবনা রূপায়িত হওয়ার আগেই সুকান্ত উৎসর্গ করলেন নিজেকে। বুদ্ধদেবের ভাষায়—

কোনো মতাবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, শক্তিশালী কবির ও
কীরকম অপমৃত্যু ঘটে, তারই উদাহরণ সুকান্ত।[১১৭]

তাঁর কবিত্বে কুঁড়ি ধরেই ঝ'রে গেলে। সুকান্ত সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্য —

কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হ'তে পারার
আগেই মরলো সে।[১১৮]

তাই তিনি তাঁর দ্বিগুণিত দুঃখও প্রকাশ করেছেন 'সুকান্ত' প্রবন্ধে।

সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য[১১৯] এই তরুণতম কবি কিশোরের মৃত্যুর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের অকালমৃত কবি কীটসের তুলনা করেছেন। অসহনীয় দারিদ্রের জন্য সুকান্তের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন চ্যাটারটনের। তিনি লক্ষ্য করেছেন সুকান্তের মধ্যে এক 'অপূর্ব-বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'[১২০]। সুকান্তকে তিনি 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রথম জনগণের কবি'[১২১] বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু জনগণের কবি হিসেবে প্রথমতঃ 'পদাতিকে'র কবিকেই চিহ্নিত করেছেন। সুকান্ত কে বলেছেন 'পদাতিকে'র 'অনুগামী কবি'।[১২২] বুদ্ধদেবের মতে, কবি হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা তাঁর ছিল। সে সম্ভাবনা রূপায়িত হবার আগেই সুকান্ত মারা গেলেন। কিন্তু, জগদীশ ভট্টাচার্য এই কিশোর কবির রচনার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন - এ যুগের প্রধান তিনটি চিত্তবৃত্তির প্রকাশ।[১২৩] দেখেছেন - ১) জনজীবন চেতনা ২) সমপ্রাণতা ৩) শুভকর্ম প্রেরণার কবি কে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার
বিদ্যুৎশক্তিকে কল-কারখানায়, খেতে, খামারে, ঘরে ঘরে সবে
পৌঁছে দিতে শুরু করেছে ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে
গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলাসাহিত্য চিরদিন
দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।[১২৪]

তাঁর আরেকটি বক্তব্য —

সুকান্তর যেসব কবিতা প'ড়ে আমরা চমকাই, সুকান্তের পক্ষে
সেসবই আরম্ভ মাত্র।[১২৫]

তবু, বুদ্ধদেবের মতো, একথা বলতেই হবে যে, এই কিশোর কবি তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত জীবনে যে অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার পূর্ণতা দেখা গেলোনা। সময় পেলেন না কবি। বাংলা কবিতার চিরাচরিত পথ থেকে দূরে এসে কবিতার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র। পূর্ববর্তী সমরসেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়-ই একটা নতুন মূল্যবোধ ও চেতনা কাজ করতে শুরু করেছিলো। গণমনের সুর তাঁরাও ধরেছিলেন। কিন্তু, শুধু মাত্র গণ-চেতনার বাণী সম্বল করে, জ্ঞান- বিজ্ঞানের পথ না মাড়িয়ে সুকান্ত অতি অল্পবয়সেই কবিতায় যে শিল্পসিদ্ধি ঘটিয়েছেন, তা বিরল দৃষ্টান্ত। এদিক থেকে তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অপরিমেয় ক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আধুনিক বাংলা কবিতার একটি পর্বে ব্যক্তি চৈতণ্যের চেয়ে সমাজ-চৈতন্য প্রধান হয়ে উঠেছিলো। সুকান্তের কবিতা এই সমগ্র সমাজ-চৈতণ্যের-ই ধারক। অবশ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় -, "পরিণতির চেয়ে প্রতিশ্রুতির পাল্লাই ভারী"[১২৬] করেছেন তিনি। এদিকে থেকে বুদ্ধদেব-পরবর্তী সুকান্ত সমালোচনাও বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে খুব দূরবর্তী নয়।

। ১১ ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ও বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ একটি। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ পদাতিক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত অল্পবয়সে নিজের একটি বিশিষ্ট রীতি নির্মাণ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সেইসঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছেন। কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং লোকপ্রিয়তা অনেকসময়-ই একসঙ্গে দেখা যায়না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রম। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বুদ্ধদেব একজন শক্তিমান কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে লিখেছেন -

ক) সুভাষ মুখোপাধ্যায়-ই প্রথম বাঙালি কবি, যিনি প্রেমের কবিতা না লিখে কাব্য-জীবন শুরু করেছিলেন।

খ) প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লেখেননি। যে সমরসেন কে বুদ্ধদেব বলেছেন -

> আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি [১২৭]

সেই সমর সেন-এর প্রথম কবিতাগুলিতে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রেম-প্রকৃতির মধুর সুরভি ছুঁয়ে গেছে।

গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনব কবি। তিনি অভিনব শুধু এই কারনে যে, সমর সেনের পরে এবং আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী ; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, ... সমগ্র মনুষ্য সমাজেরই জন্য।[১২৮]

ঘ) সময়-স্বতাবের কারনে আধুনিক কবিতার প্রধনা দুটি সুর হয়ে উঠেছিল নৈরাশ্য ও বিদ্রূপ। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সমস্যা সংকটের মধ্যেও নতুন প্রতিশ্রুতির বাণীবাহক। একারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় —

ব্যঙ্গনিপুণ হয়েও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ
দিয়েছে তা আশার উল্লাস।[১২৯]

ঙ) প্রবল বিশ্বাসের বোধ থেকেই তাঁর কাব্যে এসেছে সরলতা। 'পদাতিকে'র কবি কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ না করে বক্তব্যকে সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

চ) 'পদাতিকে'র অনেক কবিতায় একটা উচ্চস্বর, বক্তৃতার ঢং লক্ষ্য করা গেছে।

কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা বলেও তাঁর কণ্ঠস্বর
বিকৃত হয়নি ; যে ছন্দ তাঁর কবিতাগুলোকে দোলাচ্ছে, নষ্ট হয়নি
তার সুমিতি।[১৩০]

ছ) সৎবুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে শেষ পর্যন্ত ফিরতেই হয় কবিতার জটিল কলাকৌশল ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার দিকে। 'পদাতিকে'ই লক্ষ্যণীয় -

সরলতার পাশাপাশি জটিলতা, নিঃসঙ্কোচ, উচ্চ-ঘোষণার
পাশে-পাশে ব্যঙ্গের চাতুরী, ধ্বনির বিচ্ছুরিত আভা।[১৩১]

জ) সমসাময়িক বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছ থেকে কবিতার পাঠ নিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর লেখা অন্য কারো অক্ষরের উপর মকশো-করা নয়।

ঝ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব গৌণ। তথাপি 'পদাতিকে'র বিষয়গত বৈশিষ্ট্য হলো - এতে বিষয়'বা বিশ্বাস শুকনো নীতি রূপে পর্যবসিত হয়নি। তাতে সরসতা সঞ্চারিত করেছেন কবি।

ঞ) তাঁর কবিতায় কখনো কখনো সাময়িক প্রসঙ্গ ও 'সংবাদ পত্রের-তথ্যে' এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব।

.... তথ্যকে আবেগের তাপে গালিয়ে নিয়ে সুভাষ তাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন।[১৩২]

চ) তাঁর কবিতার কৃৎকৌশল সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন, তাঁর 'ছন্দের জ্ঞান নিখুঁত'। নতুন ধ্বনি অন্বেষণেও তাঁর ঝোঁক প্রবল। পয়ারে হসন্ত শব্দের ব্যবহারও অভাবনীয়। কবিতার কলাকৌশলে তাঁর দখল অসামান্য। 'পদাতিকে'র মতো ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কবিদেরও শিক্ষনীয় বিষয় আছে।

'পদাতিকে' বুদ্ধদেব দেখেছেন দু ধরনের কবিতা —

১। জনপ্রিয় কবি গণ-মনের জন্য লিখেছেন সরল, চড়া গলার কবিতা।

২। অন্যদিকে আছে, জটিল বিন্যাসের সংস্কৃতিবান কবিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যুগ্ম শক্তির পরিচয় আছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কবির পক্ষে দুদিক বজায় রাখা চলবে না, একদিক ছাড়তে হবে। জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করা যাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন, মানুষ ও কর্মী হিসেবে, কবি হিসেবে নয়। যিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় কবি, নয় কর্মী হতে হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে

তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন - "তিনি কোন পথ বেছে নেবেন ?"

অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কথা মনে রেখেও বলা যায়, মার্কসবাদী সমাজ-চৈতণ্য, গণমনের সুর, হতাশা-নৈরাশ্যের বদলে সাম্যবাদের স্বপ্ন চোখে নিয়ে কবিতার আসরে জায়গা করে, নিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'পদাতিক' এই বিশ্বাস ও স্বপ্নের কাব্য। বিশেষ প্রত্যয়ের কাব্য। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "চিরফুট" এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪১-'৪৬ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বসুদ্ধ কালীন এই সময়ে ভারতবর্ষে দেখা দিল বিয়াল্লিশএর আগষ্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশ-এর মণ্বন্তর পঁয়তাল্লিশ-এ নাগাসাকি-হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ। দেশের মানুষের এই বিপদের ঘনঘটা ও তোলপড়ের দিনে 'পদাতিকে'র স্বপ্ন সংগ্রামে রূপ নিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তেজনার দিনগুলিতে তঁর কাব্যেও দেখা দিল বিপ্লবের ভাষা। 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণ'-এ এই বিপ্লবের ধ্বনি শোনা গেল। এর পর দীর্ঘদিন কবি নীরব। ১৯৫৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় একদশক পরে প্রকাশিত হ'ল তাঁর 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থ। দলীয় রাজনীতির দাবি মেটাতে কবি রচনা করলেন জনতাতোষণ নির্বাচনী ইশ্‌তাহার।[১৩৩] জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন —

> জীবনের নিগূঢ় প্রেরণা থেকে যাঁর কাব্যের ফুল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে
> ফুটে উঠবে, সেই মহৎ কবিকে রাজনীতির প্রয়োজনে রসনারোচন
> পদ্যরচনায় শক্তি বিনিয়োগ করতে দেখলে আফশোসের শেষ
> থাকেনা।[১৩৪]

কিন্তু এই কাব্যেই নবজন্ম হ'ল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। তাই, বিপ্লবী ও সংগ্রামী কবির কাব্যেও ফুল ফুটুক না ফুটুক বসন্ত এল। "ফুল ফুটুক" কাব্য শেষ হয়েছে আশাবাদে। পদাতিক কবি মাটিতে লীন হওয়ার আগে তাঁর ভালোবাসা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন মানুষের কাছে। বিপ্লব ও স্বপ্নে বিশ্বাসী কবি শেষপর্যন্ত কিন্তু কোনো মতবাদে আর আবদ্ধ থাকতে পারেননি। তাই, সমাজচৈতণ্য ও ব্যক্তিচৈতণ্য কখনো একাকার হয়ে যায়, কখনো বা নিছক ব্যক্তিচৈতণ্যের গভীর থেকে উঠে আসে এক-একটি রূপকল্প। "যতদূরে যাই" কাব্যে আলো-আঁধার, স্বপ্ন - বাস্তবের এক অপূর্ব মেশামেশি জায়গা পেতে থাকে। আর, "এই ভাই", "ছেলে গেছে বনে" - ১৯৭১-'৭২ এর মধ্যে লেখা এই দুই কাব্যে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাংস্কৃতিক সংকটে বিষন্ন কবিকে পাই। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন -

> কিন্তু পরিণত সুভাষের কাছে পাঠকের আরো কি-এক প্রত্যাশা যেন
> অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে।[১৩৫]

কবির কাছে পাঠকের প্রত্যাশা সীমাহীন ; বিশেষতঃ যে কবির সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ নিবিড়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী কবি, সাম্যবাদের কবি, বিপ্লব-বিশ্বাস ও প্রতিবাদের কবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কবি, শিল্পী, এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কবি-শিল্পীর অন্তর্গত তাগিদেই তিনি মতাবাদের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে এক চিরন্তন শাস্বত চেতনায় উত্তরিত হয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমালোচনাকে তাই মূল্যগর্ভ মনে হয়। কেননা, যিনি প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী, তিনি কোনো মতবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, - একথা তিনি জোর দিয়েই বলেছিলেন।

। ১২ ।

বুদ্ধদেব তাঁর সমকালীন অপ্রধান কবিদের কবিতা নিয়েও সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'নিশিকান্ত ঃ অলকানন্দা' (১৯৪০) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব কবি নিশিকান্ত-এর কৃতিত্বের কথা বলেছেন। তিনি নিশিকান্ত-এর কবিতাকে ধর্মসাধনার ফল ও উপায় হিসেবে না দেখে কবিতা হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। 'অলকানন্দা'র কবিতাগুলির যথেষ্ট কাব্যমূল্যের কথা তিনি উল্লেখকরেছেন। তাঁর মতে, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় - এমন জনের কাছেও 'অলকানন্দা'র কবিতা ভালো লাগতে পারে।

বুদ্ধদেবের সমকালীন আর এক কবি দীনেশ রঞ্জন দাশ। বুদ্ধদেব অবশ্য লেখক হিসেবে নয়, সম্পাদক হিসেবে তাঁর গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। গোকুল চন্দ্রের পরে,

> দীনেশ রঞ্জন 'কল্লোল' কে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখলেন তা নয়,
> নানাভাবে পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন।[১৩৬]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এঁদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'কল্লোলে'র অবদান ছিলো। নজরুলের গজল গানও প্রথম প্রকাশিত হয় 'কল্লোলে'। মোটকথা, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে লেখক-শিল্পীরা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই 'কল্লোল'কে অবলম্বন ক'রে এগিয়ে গিয়েছেন। এদিক থেকে সাহিত্য পত্র হিসেবে 'কল্লোল' এবং এর সম্পাদক হিসেবে দীনেশরঞ্জন দাশ স্মরণযোগ্য।

'কালের পুতুল' প্রবন্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু অন্নদাশংকর ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমটি হ'লো - 'অন্নদাশংকর ঃ নূতন রাধা' (১৯৪২), অন্যটি, 'পুনশ্চ' (১৯৪৫)। 'পুনশ্চ' প্রবন্ধ অবশ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধের-ই বর্দ্ধিত অংশ। 'পুনশ্চ' নামের মধ্যেই তাঁর ইঙ্গিত আছে। অন্নদাশংকরের 'নূতন রাধা' মূলতঃ তাঁর প্রথম পর্যয়ের কাব্য গ্রন্থ। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

> তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞান।[১৩৭]

অন্নদাশংকরের কাব্যরীতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন 'একটি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল মনোহর গদ্যরীতির তিনি অধিকারী।'[১৩৮] তাঁর মতে, 'নূতন রাধা' প'ড়ে মনে হয় তাঁর কবিত্বশক্তি যেন গদ্য শক্তির প্রসারের চাপে খানিকটা কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। বুদ্ধদেবের বক্তব্যঃ অন্নদাশংকরের 'নূতন রাধা'য় কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট।[১৩৯] 'পুনশ্চ' (১৯৪৫) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব জানালেন, 'উড়কি ধানের মুড়কি' লিখে যে অন্নদাশংকর ছড়াকে আবিষ্কার করেছিলেন, এরপর ছড়ার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। ছোটোদের পত্রিকায় প্রকাশিত অন্নদাশংকরের ছড়াগুলিকে বুদ্ধদেব "বয়স্কপাঠ্য" বলেছেন। কারন, কোনো সাধারন শিশু এর পূর্ণরস গ্রহণ করতে পারবে না। অন্নদাশংকরের এই ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন ছোটো এবং আঁটো সাঁটো ছড়াগুলি "লঘু অথচ অত্যন্ত তরল নয়"।[১৪০] বলেছেন, - এগুলি চটুল হলেও সৌজন্য সম্মত। ছড়াগুলির অপূর্ব কারুকুশলতার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।

দুজন তরুণ মৃত কবির উদ্দেশ্যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব। কবি দুজন হলেন সুকুমার

সরকার এবং ফাল্গুনী রায়। দুটি প্রবন্ধেই এই দুই স্বল্পায়ু কবির সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। কবি হিসেবে ফাল্গুনী রায়ের বিশেষত্ব, তাঁর দোষত্রুটি ইত্যাদির সঙ্গে ফাল্গুনী রায়ের কবিতার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ তুলে ধরেছেন তিনি। অন্যদিকে, কল্লোল যুগের একজন অপ্রধান কবি হিসেবে সুকুমার সরকারের ও একটি নাতিদীর্ঘ মূল্যায়ণ উপস্থাপিত করেছেন তিনি।

ফাল্গুনী রায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

ক) ফাল্গুনীর কবিতায় তারুণ্যের সমস্ত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য স্ফুট হয়েছিলো।

খ) পরিণত বয়সে পৌঁছুবার আগেই ফাল্গুনীর মৃত্যু হ'ল ; তাই তাঁর বাল্য রচনাগুলিই বাংলাসাহিত্যে তাঁর পরিচয়ের চিহ্ন বহন করছে।

গ) তাঁর কবিতায় শক্তি ও সম্পদ - দুই-ই আছে।

ঘ) ফাল্গুনীর কবিতার মধ্যে তিনি "জাত-কবি"-র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। ফাল্গুনীর কবিতা পড়লে যথার্থ বোঝা যায় যে, তিনি বাক্-প্রেমিক। কথার প্রেমে আত্মহারা কবি নিজেকে সংযত করতে পারেন না।

৪। ফাল্গুনীর কবিতা অগোছালো, এলোমেলো হলেও এর ভাষার উজ্জ্বলতা প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করেছে।

সুকুমার সরকার বিষয়ক প্রবন্ধে কবি সুকুমার সরকারের কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর জীবন ও কবিতার একটি নিবিড় সংযোগ চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধদেব।

'নতুন কবিতা' শিরোনামে বুদ্ধদেব মনীশ ঘটকের 'শিলালিপি' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। এটি মূলতঃ পুস্তক সমালোচনা হলেও এতে মনীশ ঘটকের কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক যুবনাশ্ব-এর আত্মনাম মনীশ ঘটক। সমকালীন লেখকদের প্রতি বুদ্ধদেব যে সর্বদাই Appreciation ধর্মী সমালোচনা করেননি, মনীশ ঘটকের 'শিলালিপি' সমালোচনা -এর একটি প্রমাণ।

মনীশ ঘটকের কবিত্বশক্তিকে স্বীকার করতে পারেননি বুদ্ধদেব। 'শিলালিপি'র কবিতাগুলি প্রসঙ্গে লিখেছেন কিছু আছে ছন্দে, কিছু আছে গদ্যে, এবং এই দুই রীতি মিলেমিশেই আছে, তাদের আলাদা ক'রে দেয়া হয়নি। তার উপর আবার কোনো কবিতা ব্যঙ্গের, কোনোটি নিছক বর্ণনার, অন্য কোনোটি হৃদয়াবেগের। হৃদয়াবেগ না ব'লে শরীরাবেগ বললেই ভালো হয়, কেননা মীনশবাবুর কবিতার সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্বার, দুর্জয়।[১৪১] বুদ্ধদেব এমনও উল্লেখ করেছেন -

> প্রসঙ্গ নিয়ে কদাচ আমি কলহ করিনে, তবে 'শিলালিপি'তে
> নারী দেহের পৌনঃপুণিক বর্ণনা খানিকটা অপরিণত মনোভাবের
> পরিচয় দেয় ব'লেই একথা বলতে হ'লো।[১৪২]

কবি কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মৈনাক' কাব্যের সমালোচনা বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন 'কবিতা' আষাঢ়, ১৩৪৭ সংখ্যায়। 'মৈনাক' রচনাকালে কামাক্ষী প্রসাদ রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত কবি। বুদ্ধদেব মনে করেন

মৈনাক' বইটির স্বল্পসংখ্যক কবিতাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই তাঁর
খ্যাতিকে আরো ব্যাপক ও দৃঢ় করবে।[১৪৩]

কবি হিসেবে কামাক্ষী প্রসাদকে তিনি অনেকটা রোম্যান্টিক মনের অধিকারী বলেই মনে করেন। তাঁর মনে, 'মৈনাকে' সার্থক রচনার সংখ্যাই বেশি। এবং সমস্ত বইটি প'ড়ে সন্দেহমাত্র থাকেনা যে কামাক্ষী প্রসাদ অচিরে আরো বেশি উৎকর্ষের অধিকারী হবেন।

। ১৩ ।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও বাঙালি কবিদের সমালোচনায় বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কবিতার জগতে নতুন কবিদের স্বাগত জানাতে তাঁর প্রচেষ্টা লক্ষণীয় মাত্রা পেয়েছে। 'উত্তরধিকার' পত্রিকায় লেখা হয়েছে —

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কবিতায়
নব্যাগন্তুকদের ঠাঁই করে দিয়েছেন তিনি সম্পাদক হিসেবে, প্রতিষ্ঠিত
করে দিয়েছেন সমালোচনা করে।[১৪৪]

বুদ্ধদেবের নিজেরও বক্তব্য —

স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলনা ; ..... আমার
সমকালীন কবিদের গুণকীর্জর আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম।[১৪৫]

তাঁর আগে অথবা পরে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে আর কেউই সমকালীন কবিদের নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠেননি। জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'য় আধুনিক কবি ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করলেও সমকালীন কবিদের প্রতি এতো উৎসাহ দেখান নি। বিষ্ণুদে-র নামোচ্চারণ পর্যন্ত করেননি তিনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দের কবিতা পছন্দ করতেন না। আমিয় চক্রবর্ত্তী বুদ্ধদেবের কবিতা বিষয়ে নিরুৎসাহ প্রকাশ করেছেন।[১৪৬] বিষ্ণু দে-র সঙ্গে বুদ্ধদেবের আদর্শগত বিরোধ ছিল। কিন্তু, বুদ্ধদেব সমকালীন কবিদের একই সঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, সেই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সমর সেন, এমনকি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় - এঁদের সকলের কবিতা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেন বুদ্ধদেব। এঁদের নতুনত্ব, অভিনবত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব স্ফুট করেছেন পাঠকের কাছে। দেখাতে চেয়েছেন এঁরা প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিষয় ও প্রকরণগত দিক থেকে এঁদের পার্থক্য আছে, কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে নতুন। জীবনানন্দের কবিতা 'কল্লোলে, প্রথম প্রকাশিত হ'লে, সেখানেই তিনি আধুনিক কবিতার এই বিরাট প্রতিভাকে সনাক্ত করেছিলেন। অবশ্য, জীবনানন্দের শেষ পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলিকে অভিনন্দিত করেন নি বুদ্ধদেব।[১৪৭] আসলে, জীবনানন্দের শেষ পর্বের কাব্যগুলিতে যে ধারা বদলের ইশারা পাওয়া যায়, তাতে জীবনানন্দ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সামগ্রিক বোধ হঠাৎ-ই যেন

বাধাপ্রাপ্ত হ'লো। ততদিনে কবিতা-মনস্ক পাঠকের কাছে জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক গভীরতা ও নতুন কাব্য-অভিজ্ঞতার বিস্তারও ঘটেগেছে। তাঁর আত্মলীনতার মধ্যেই বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব শক্তির পরিচয়। কিন্তু, 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা-অবেলা কালবেলা'র কবি সমাজমনস্ক। প্রবল সমাজবোধতাড়িত কবিতা লিখলেন তিনি এই সময়ে।

এই মানসিকতার গড়ন জীবনানন্দের আত্মলীনতা থেকে কিছু পৃথক।[১৪৮]

সমাজ - সংস্পর্শজাত আবেগের যে অভিজ্ঞতা এই সময় রূপ লাভ করেছে জীবনানন্দের কবিতায় বুদ্ধদেব তা মেনে নিতে পারেননি। 'ব্যক্তিগতকেই শুদ্ধ মনে করার প্রেরণা কাজ ক'রেছিলো'[১৪৯] তাঁর মধ্যে। বুদ্ধদেবের কবিতা ও প্রবন্ধাবলী পড়েও ম'নে হয় তিনি কবিতায় প্রেম, বিষাদ, আনন্দ, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য আবেগকে যতটা স্পর্শ করতে চান, তত্ত্ব বা চিন্তাভাবনাকে ততটা প্রকাশিত দেখতে চাননা।

একেবারে কাব্য-নাট্যগুলির যুগে এসে বুদ্ধদেব বসুকে আত্মস্থ
করতে দেখা যায় জীবনতত্ত্ব আর জীবন-আবেগের ফলবান মিশ্রণ।
সে অনেক পরের কথা।[১৫০]

একারনেও হয়তো বুদ্ধদেব জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতাগুলির সদর্থক সমালোচনা করতে পারেনি যাহোক, মূলতঃ জীবনানন্দকে পাঠকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব। চিনিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের 'নির্জনতম' কবিকে, স্বতন্ত্র স্বভাবের কবিকে। কবি নিজেই উচ্চারণ করেছিলেন —

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রা দোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?[১৫১]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এই স্বতন্ত্র বোধের কবিকে চিহ্নিত করে বুদ্ধদেব লিখেছেন - 'আমাদের এই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো সময়ের মধ্যে জীবনানন্দ একজন আত্মমগ্ন শিল্পী।'[১৫২] সামগ্রিকভাবে দেখলে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনা যথেষ্টই মূল্যবান।

সমকালীন কবিদের সমালোচনায় বুদ্ধদেব অকৃপণ ছিলেন। তাহলেও প্রশ্ন উঠেছে তাঁর বিষ্ণুদে সমালোচনা নিয়ে। একই সময়ের কবিদের নিয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন 'কেন বিষ্ণুদে নয়, ...।'[১৫৩] এমনও মনে করা হয় যে, নিজেরই সমকালীন কবি বিষ্ণুদে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এই অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহের কারন কিছুটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত, কিছুটা বা ব্যক্তিগত। রাজনীতির দিক থেকে বিষ্ণু দে মার্কসবাদে বিশ্বাসী, আর, বুদ্ধদেব সাহিত্যের বিশুদ্ধতায় আস্থাশীল। নন্দন তাত্ত্বিক এই পার্থক্যের জন্যই তাঁর প্রবন্ধ নন্দনতাত্ত্বিক এই পার্থক্যের জন্যই তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহে (ভারবি সংস্করণ, ১৯৬৬) বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গ এলোইনা। মার্কসীয় বিশ্বাসে আস্থাশীল কবিদের তিনি এই সংকলন গ্রন্থে বর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে, উল্লেখ্য মনে করি যে, যেকোনো লেখক বা সমালোচকের নিজের অভিরুচি,

মানসিক ধাঁচ অনুযায়ী পছন্দ অপছন্দ থাকবেই। বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতা বিষয়ে যতটা উচ্ছ্বাসিত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও কম গুরুত্ব দেননি তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব 'কবিতা'র পাতায় যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, সে সম্বন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজের বক্তব্য —

> পদাতিক'-এর আলোচনা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর
> অনেকেই আশংকা করেছিলেন, অতি প্রশংসায় ছেলেটির মাথা
> ঘুরে যাবে।[১৫৪]

তিনি আরও লিখেছেন —

> নিরুত্তাপ আশ্রয়ের চেয়ে নতুন লেখকদের লেখায় পক্ষে বরং
> স্বাস্থ্যকর ঈষদুষ্ণ প্রশ্রয়।[১৫৫]

নিছক রাজনীতির কারনে তিনি কোনো লেখক শিল্পীর প্রতি কখনো অনুদার ছিলেন না। আজন্ম রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেবের অন্তর্গত প্রকৃতির জন্যে তিনি কোনো মতবাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় ননি। তাঁর নিজের মধ্যেও চলেছিলো একটা রূপান্তরের প্রক্রিয়া। কবিতা, জগৎ ও জীবন বিষয়ে তাঁর ধারনাও একটি স্থির বিন্দুতে আটকে থাকেনি। উপলব্ধির পথে তিনি ক্রমাগত উত্তরিত হ'তে চেয়েছেন 'অন্য কোনোখানে'। ক্রমাগত পা বাড়িয়েছেন অনিশ্চিতির পথে। তাঁর এই অতৃপ্তির বোধ থেকেই জীবনের শেষ পর্বে তিনি হয়তো পরিক্রমা করেছেন রামায়ণ - মহাভারত - বাল্মীকির যুগে, প্রাক্-পৌরানিক পুরাকথার বৃত্তে। ব্যক্তি বুদ্ধদেবের এই প্রবণতার জন্যেও তিনি হয়তো একটি স্থির প্রত্যয়ের মধ্যে বাধা পড়েননি। ক্রমাগত বিরোধ - বৈচিত্র্যের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন অভীষ্ট সত্যকে। লক্ষ্য করেছেন কত বিচিত্র প্রবণতা ও সত্যের বিচিত্র গতিমুখ। সমকালীন কবি ও কবিতাসমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য-ই স্পষ্ট হয়েছে। কখনো তিনি সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুদের মতো কবি-ও তাঁদের কবিতা সমালোচনায় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছেন। আবার, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্ত্তী-র কবিতা-র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তিনি। রাজনীতি বা কবিতার মৌল প্রেরণাগত পার্থক্য তাঁকে ততটা বিচলিত করেনা। বরং খুঁজে নিতে চান শিল্প হিসেবে তার মূল্যকে। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সময়ের মধ্যে এঁরা কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল হয়েছেন - এটি যেমন তিনি লক্ষ্য করেছেন, তেমনি, দেখাতে চেয়েছেন এঁদের ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য কে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার যে বিচিত্র প্রবণতা-ঋদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ধারা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে ক্ষীণতন্বী হয়ে দেখা দিয়েছিলো, তার গতিপথ প্রস্তুত করলেন। স্বঘোষিতভাবেই উচ্চারণ করলেন যে রবীন্দ্রোত্তর এই কবিরা আধুনিক, আধুনিকতার বিচিত্র লক্ষণ তাঁদের কবিতার শরীরে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকায় লিখেছেন—

> আমি পাঠককে অনুরোধ করি আধুনিক কবিতার কোনো -
> একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে ব্যাপারটাকে
> সমগ্রভাবে দেখতে।[১৫৬]

এই কবিদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ কোনটা তা তর্কের বিষয়। কিন্তু,

> কোনো একটা সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে তাতে সন্দেহ নেই, সেটাকে
> অনুভব করা যায়, ... ।[১৫৭]

অনুভূতিবেদ্য সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থির কোনো বিশিষ্ট নাম উল্লেখ করেননি বুদ্ধদেব। বার-বার শুধু বলেছেন এঁরা স্বতন্ত্র, এঁরা নতুন, এঁরা অভিনব। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে এই অভিনবত্ব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ থেকে মোড়-ফেরা, একটা বিরাট পালাবদল। নাম দিতে হলে, বলতে হয়, এরই নাম আধুনিকতা।

অন্যান্য সমালোচনা

বুদ্ধদেবের সাহিত্য সমালোচনায় উপরোক্ত চারটি বর্গ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য লেখক শিল্পীদের নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'An Acre of Green Grass' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'Sarat Chandra Chattopadhyay' নামের প্রবন্ধ। ইংরেজী সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে তুলনা করেছেন তিনি। ডিকেন্সের মতো, তিনি জনগণের প্রিয় লেখক। এবং এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের তুলনায়ও খ্যাতির শিখর স্পর্শ করে আছেন। সমস্ত শ্রেনীর পাঠকদের কাছেই তিনি আদরণীয়। 'Sarat Chandra Chattopadhyay' প্রবন্ধে চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন -

> It would not be strange in Bengal to come upon a man ...
> who has read no books at all except a few of Sarat Chandra's.

'কবিতা' পত্রিকা পৌষ, ১৩৬৩, একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধটি লিখেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে একশ বছরের কথা সাহিত্যে স্পষ্ট দুটো ভাগ। একদিকে সরল বাস্তবের প্রতি ঝোঁক, অন্যদিকে অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যময় বিকৃতি এককথায় কাব্যধর্মের দিকে আগ্রহ। এই বাস্তবতাবাদে আবদ্ধ হয়ে আছে বাংলা কথাসাহিত্যের অনেকটা অংশ। 'কল্লোল, পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিল এই বাস্তবতা। আবার, কোনো কোনো লেখক ভেবেছিলেন কেবল বাস্তবতাবাদে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যের এই সময়ে আর্বিভূত হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি 'কল্লোলের সর্বশেষ 'পরিপক্ক ফল' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্বাভাবিক শক্তিকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পূর্ববর্তীকালের রচনাগুলিকে কবিত্বগুনে সমৃদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকে প্রথমে বাস্তবতাবাদ পর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। এরপর আস্তে আস্তে এমন এক প্রদেশ তিনি দখল করে নেন যেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগ, কেরানি, কেরানির বৌ, প্রত্যেকেই উঠে এসেছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তথাপি, বুদ্ধদেবের মতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেননি। বিশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তু নিষ্ঠায় দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম।

'কবিতা' পত্রিকা চৈত্র ১৩৫২, একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় নবীনচন্দ্র সেন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব। প্রবন্ধটির নাম 'নবীনচন্দ্র সেন'। কবি নবীনচন্দ্র সেন এককালে বহু পাঠকের হৃদয় জয় করলেও আজ তার নাম বিস্মৃতপ্রায়। এর কারন সন্ধান করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেন যে, আজকের দিনে মহাকাব্যের আসন নিয়েছে উপন্যাস। আর তাই, নবীনচন্দ্র কাব্য পাঠকের যে আগ্রহটি পূরণ করতেন তাঁর স্বল্প পরিসর গল্পের মাধ্যমে, আজ তা অবিশ্রান্ত এগিয়ে চলেছে। উপন্যাসের দিনে নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব তাই বুদ্ধদেবের মতে স্মৃতি সঞ্চারী মঙ্গলাচরণ কারণ, এই উৎসব কবি নবীনচন্দ্রের মূল্য নিরূপণে আমাদের সাহায্য করবে।

'কবিতা' পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৬৬, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪ - এ নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ী বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রবন্ধটির শিরোনাম 'শিশির কুমার ভাদুড়ী'। প্রবন্ধটির সূচনাতেই তিনি জানান যে, বাংলাদেশে এমন একটি সময় ছিল যখন প্রত্যেকেই বিচিত্র; পরিবর্তনশীল বিষয় নিয়ে ছিলেন উৎসাহিত। কিন্তু শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয় বিষয়ে প্রায় সকলেরই ছিল সীমাহীন উচ্ছ্বাস। তিনি সে সময় প্রায় প্রবাদবাক্যে, রূপকথায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়ের প্রথম থেকে শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত কোথাও ছিল না আড়ষ্টতা, আদ্যন্ত ছিল এক সুরে বাঁধা। তবুও তাঁর নাট্যমন্দির টেঁকে নি। এরপর তাঁকে দেখতে পাই রংমহলে, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি, সেভাবেই মূর্ত করে তোলেন। তবে 'শেষ রচনা', 'যোগাযোগ' এগুলিতে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তথাপি প্রথম বিশ শতকের বাঙালী জীবনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

এছাড়া, 'কবিতা' কার্ত্তিক ১৩৪৯, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'যোগেশচন্দ্র চৌধুরী' প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। 'কবিতা, চৈত্র, ১৩৬৬, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩ - এ প্রকাশিত হয়েছে 'রাজশেখর বসু' প্রবন্ধ। 'কবিতা, ১৩৪৯, ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় শিল্পী সোমেন চন্দ তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যের বিষয় হয়েছেন। 'কবিতা' চৈত্র ১৩৫৭, ষষ্ঠদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয় বক্তব্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু তাঁর আলোচ্য হয়েছে। এছাড়াও কিছু পূর্ববর্তীকালের অথবা সমকালের লেখক, শিল্পী অথবা তাঁদের রচনার প্রতি আগ্রহ বোধ করেছেন তিনি।

নির্দেশিকা

১। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, 'এলিজিঃ বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি', উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পা) ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ১০৩.

২। তদেব, পৃঃ ১০৩

৩। তদেব, পৃঃ ১০৩

৪। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতি ' উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পা) ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ২০১.

৫। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা) কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ২১.

৬। তদেব, পৃঃ ১০৩।

৭। দত্ত, অজিত, 'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা), কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ২৪.

৮। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'আমাদের ঋণ', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা), কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ২৪.

৯। চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষী প্রসাদ, কবিতার সাত বছর, বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা), কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ৬৬-৬৭.

১০। তদেব, পৃঃ ৬৭.

১১। তদেব, পৃঃ ৬৮.

১২। বসু, বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশঃ ধুসর পাণ্ডুলিপি' কালের পুতুল কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৩৩.

১৩। বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ ৭.

১৪। তদেব, পৃঃ ৮.

১৫। তদেব, পৃঃ ৮.

১৬। মজুমদার, মোহিতলাল, কবিশ্রী মধুসূদন, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৬৫, পৃঃ ২৮

১৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৫৪ পৃঃ ২৫.

১৮। তদেব, পৃঃ ২৬.

১৯। তদেব, পৃঃ ২৯.

২০। তদেব, পৃঃ ৩২.

২১। তদেব, পৃঃ ৩৮.

২২। Eliot, T.S, Milton I & Milton II, On Poetry and Poets. London, Faber and Faber, 1st published 1957.

২৩। মজুমদার, মোহিতলাল, কবিশ্রী মধুসূদন, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৬৫, পৃঃ ২০.

২৪। তদেব, পৃঃ ১৩২.

২৫। তদেব, পৃঃ ১২৩.

২৬। তদেব, পৃঃ ১২০.

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, প্রমথ চৌধুরী, 'কবিতা', দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৩ তে প্রকাশিত।

২৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৬.

২৯। Bose, Bnddhadev, 'Paramatha Chowdhury', An Acre of Green Grass, Calcutta, Papyrus, 1948. Page -28.

৩০। বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রমথ চৌধুরী' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ২০.

৩১। Doctor Zivago, Boris Pasternak, New York, Ballantine Books, First edition, March 1981. Page-9.

৩২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪তম খন্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃঃ ৫৩০-৫৩১.

৩৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, ৫ম খন্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৌষ ১৩৫২, পৃঃ ১১৭.

৩৪। তদেব, পৃঃ ১৬৯-৭০.

৩৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রমথ চৌধুরী' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ২১.

৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৬.

৩৭। দাশ, জীবনানন্দ, 'বোধ', ধূসর পান্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রঃ লিঃ, ১ম সংস্করন, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃঃ ৩৮.

৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন,' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৩৮.

৩৯। বসু, বুদ্ধদেব, সম্পাদকীয় 'কবিতা' ১২শ বর্ষ, ১৩৫৩-৫৪ এর আশ্বিন সংখ্যা-

৪০। গুহ, নরেশ, 'ছিলেনা বনের মৃগ', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা) কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৪২.

৪১। তদেব, পৃঃ ৪৩.

৪২। গুহ, নরেশ, ভূমিকা, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, বুদ্ধদেব বসু, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, পৃঃ ৭.

৪৩। গুহ, নরেশ, 'ছিলেনা বনের মৃগ', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা) কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৪৫.

৪৪। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী (সম্পাদিত), ঢাকা, মুক্তধারা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৩২.

৪৫। তদেব, পৃঃ ৫৫.

৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৩২.

৪৭। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৪৮। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৪৯। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৫০। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৫১। সিংহ, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা জুলাই,১৯৮৬, পৃঃ ১২৭.

৫২। মজুমদার, মোহিতলাল 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', কলিকাতা বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃঃ ১৪৫।

৫৩। তদেব, পৃঃ ১৫৯.

৫৪। তদেব, পৃঃ ১৬৬.

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, ভূমিকা, 'শত বর্ষের আলোকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', সুনীল কান্তি সেন (সম্পাদনা)।

৫৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'নজরুল ইসলাম', কালের পুতুল কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২৫.

৫৭। তদেব, পৃঃ ১২৫.

৫৮. তদেব, পৃঃ ১২৬.

৫৯। Bose, Buddhadev, An Acre of Green Grass. Calcutta, Pupyrus, 1948, Page-52.

৬০। বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২৯.

৬১। তদেব, পৃঃ ১৩০.

৬২। তদেব, পৃঃ ১৩০.

৬৩। তদেব, পৃঃ ১৩১.

৬৪। খান, আজাহার উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৯৬৯, পৃঃ ৩২৬.

৬৫। মজুমদার, মোহিতলাল, পত্রসংখ্যা-১, মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, আজহার উদ্দিন খান, ভবতোষ দত্ত (সংকলিত ও সম্পাদিত), কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯, পৃঃ ২.

৬৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,

জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬

৬৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৬৭

৬৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কবি' সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৮০

৬৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬৪

৭০। বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৮৯

৭১। বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৮৭

৭২। তদেব, পৃঃ ৮৮

৭৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৭৪

৭৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬৯

৭৫। হালদার, নিরঞ্জন (সম্পাদিত) সুধীন্দ্রনাথ, কলিকাতা রামায়নী প্রকাশ ভবন, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৭৫ পৃঃ ২১৭

৭৬। তদেব, পৃঃ ২১৮

৭৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬৪

৭৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তীঃ খসড়া', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৯৪

৭৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ একমুঠো', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৯৬

৮০। তদেব, পৃঃ ৯৬

৮১। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৯৯

৮২। তদেব, পৃঃ ১০৬

৮৩। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮৪। তদেব, পৃঃ ১০২

৮৫। তদেব, পৃঃ ১০১

৮৬। ভাদুড়ি, পিনাকী, উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮৮ পৃঃ ১৫৩

৮৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, নবজাতক, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬৮

৮৮। ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগষ্ট ১৯৫৮ পৃঃ ৩২৮

৮৯। তদেব, পৃঃ ৩২৮

৯০। তদেব, পৃঃ ৩৬৭

৯১। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৭

৯২। তদেব, পৃঃ ৫৮

৯৩। বসু, বদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি ঃ বদ্ধদেব বসুকে', বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ ১৩৮৪ পৃঃ ৫৮৩

৯৪। সমর সেনঃ বিশেষ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, সংকলিত চিঠি, সম্পাদক পুলক চন্দ, ১৯৮৮

৯৫। অনুষ্টুপ, সমরসেনের বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮, দ্বাবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক পুলক চন্দ,

৯৬। বসু, বুদ্ধদেব 'নবযৌবনের কবিতা', 'কবিতা' (সম্পাদিত), আষাঢ় ১৩৪৪, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৫১-৬০

৯৭। Mukhopadhaya, Dhurjatiprasad, 'A Modern Poet but not Progressive',অনুষ্টুপ, সমর সেন ঃ বিশেষ সংখ্যা, পরিশিষ্ট- পৃঃ ১২

৯৮। তদেব, পরিশিষ্ট - পৃঃ ১৪

৯৯। ঘোষ, শঙ্খ, নিঃশব্দতার ছন্দ, অনুষ্টুপ, সমর সেন, বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ১৪

১০০। সিকদার, অশ্রুকুমার, মূল্যায়ণ প্রসঙ্গঃ সমর সেনের মদন ভস্মের প্রার্থনা, কলমের ফ্রন্ট, বিশেষ সমর সেন সংখ্যা, বর্ষ - ৮, সংখ্যা -৯, পৃঃ ৩৪

১০১। তদেব, পৃঃ ৩৬

১০২। বসু, বুদ্ধদেব, নতুন সংস্করণের ভুমিকা, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯.

১০৩। সিকদার, অশ্রুকুমার, মূল্যায়ণ প্রসঙ্গঃ সমর সেনের মদন ভস্মের প্রার্থনা, কলমের ফ্রন্ট, বিশেষ সমর সেন সংখ্যা, বর্ষ - ৮, সংখ্যা - ৯, পৃঃ ৩৬।

১০৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

১০৫। তদেব, পৃঃ ৭৬

১০৬। তদেব, পৃঃ ৭৮

১০৭। তদেব, পৃঃ ৭৯

১০৮। বসু, বুদ্ধদেব ভূমিকা 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (সম্পাদিত) কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স

প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪ পৃঃ ছয়।

১০৯। মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, একালের বাংলা কবিতাঃ নিবিড় পাঠ, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯২

১১০। বসু, বুদ্ধদেব, 'বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৪৩

১১১। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃঃ ১৭ (বিষ্ণু দে কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।)

১১২। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বুদ্ধদেবকে লেখা,কলকাতা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ -১৩৮৪ পৃঃ ৫৮৩

১১৩। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ভুমিকা সুকান্ত সমগ্র কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৪

১১৪।বসু, বুদ্ধদেব, 'সুকান্ত', 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা),১২ শ বর্ষ, ১৩৫৩-৫৪ সংস্থা পৃঃ ২৪৬-২৪৭

১১৫। তদেব, পৃঃ ২৪৭

১১৬। তদেব, পৃঃ ২৪৮

১১৭। তদেব, পৃঃ ২৫০

১১৮। তদেব, ২৫১ পৃঃ

১১৯। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ পৃঃ ৩৩৯

১২০। তদেব, পৃঃ ৩৪০

১২১। তদেব, পৃঃ ৩৪১

১২২। বসু , বুদ্ধদেব, 'সুকান্ত' , 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত),১৩৫৩-৫৪ সংখ্যা, পৃঃ ২৪৭

১২৩। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ পৃঃ ৩৩৯

১২৪। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ভুমিকা, সুকান্ত সমগ্র, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৪

১২৫। তদেব, ভূমিকা

১২৬। তদেব, ভূমিকা,

১২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃকয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশাস প্রাঃ লিঃ,পৃঃ ৬০

১২৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ পদাতিক' কালের পুতুল , কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুযারী ১৯৫৯

১২৯। তদেব, পৃঃ ৮২

১৩০। তদেব, পৃঃ ৮৪

১৩১। তদেব, পৃঃ ৮৪

১৩২। তদেব, পৃঃ ৯০

১৩৩। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ পৃঃ ৩০৩

১৩৪। তদেব, পৃঃ ৩০৪

১৩৫। তদেব, পৃঃ ৩২৫

১৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

১৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'অন্নাদাশঙ্করঃ নূতন রাধা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ১১৪

১৩৮। তদেব, পৃঃ ১১৪

১৩৯। তদেব, পৃঃ ১১৫

১৪০। বসু, বুদ্ধদেব, ' পুনশ্চ,' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুযারী ১৯৫৯, পৃঃ ১১৮

১৪১। বসু, বদ্ধদেব, 'নতুন কবিতা,' কবিতা আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৪৫

১৪২। তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮

১৪৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'নতুন কবিতা', কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৪৭

১৪৪। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, উত্তরাধিকার, নীলীমা ইব্রাহিম (সম্পাদিত), ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ৯৪.

১৪৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ৯৪.

১৪৬। দাশ গুপ্ত, প্রণবেন্দু, 'বুদ্ধদেব বসু, রুচি ও শিক্ষা', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পাদনা), কলিকাতা, বর্ণালী মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ১১৫.

১৪৭। বসু, বদ্ধদেব, সম্পাদকীয়, 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৩,

১৪৮। চক্রবর্ত্তী, সুমিতা, 'বাংলা কবিতাঃ জীবনানন্দের উত্তরাধিকার', জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৭, পৃঃ ১৬৬.

১৪৯। তদেব, পৃঃ ১৬৭.

১৫০। চক্রবর্ত্তী, সুমিতা, 'জীবনানন্দের কবি সমালোচকরা', জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৭, পৃঃ ১৩১.

১৫১। দাশ জীবনানন্দ, 'বোধ', ধূসর পান্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, ১ম খন্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃঃ ৭০.

১৫২। বসু, বদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ৫৬.

১৫৩। মুখোপাধ্যায়, পবিত্র, কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, অন্বেষা, কলিকাতা, ১৯৮১

১৫৪। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু', বুদ্ধদেব বসু ঃ, নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পাদনা), কলিকাতা, বর্ণালী মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ২০.

১৫৫। তদেব, পৃঃ ১৬৭.

১৫৬। বসু, বদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পাদিত) কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১ম সংস্করণ মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ ছয়.

১৫৭। তদেব, পৃঃ আট-নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু ও সমকালীন সমালোচক

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সমকালীন সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই ধারায় জীবনানন্দের কথাও উল্লেখ্য মনে করি। যদিও 'কবিতার কথা' ছাড়া তাঁর কোনো বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ চোখে পড়ে না। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তীর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নিবন্ধের সংখ্যা কম নয়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির লেখায় নতুন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।[১] এলিয়ট, রিচার্ডস, এজরা পাউন্ড এবং অন্যদিকে, বেন, জেভ, টুভে, গ্রীন পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় নতুন রীতির প্রবর্তন করেন।[২] জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে দেখার অতিব্যবহৃত পদ্ধতির বদলে এই নতুন সমালোচনা পদ্ধতি বাংলায় সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি সমালোচকরা প্রবর্তন করেন। এই সমালোচনায় কাব্য-প্রকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রকরণ বিচারের মাধ্যমে কবিমানসের পরিচয় গৃহীত হয়।

এই ধারাকে বলা যেতে পারে প্রকরণ বাদ।[৩]

এই ধারায় উল্লেখযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ দুটি - 'স্বগত' (১৯৩৮), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)। এছাড়া, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত আরও প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-প্রতিম রচনা তাঁর আছে।[৪] বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', 'রুচিও প্রগতি' গ্রন্থেও নতুন সমালোচনা রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের সমকালের প্রাবন্ধিক সমালোচক হিসেবে অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য মনে হলেও সাহিত্য সমালোচনার যে বিরাট বিচিত্র্য বুদ্ধদেবের লেখায় পাই, তা অন্য কোনো কবি সমালোচকের রচনায় নেই। তাঁর সমালোচনা কর্মের একটি বড় অংশ জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া, সমকালীন তরুণ কবি, লেখক এবং কিছু পূর্ববর্তী আধুনিক কবি শিল্পীর রচনা বৈশিষ্ট্য তাঁর আলোচনার বিষয় হয়েছে। ইয়োরোপীয় কবি ও কবিতার সঙ্গে তুলনা করেও তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। আবার, এলিয়ট বলেছিলেন, প্রত্যেক যুগে পুরোনো কবি ও কাব্যের নূতন মূল্যায়ণ হয়। কথাটা বলেছিলেন, নূতন কবিদের কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোনো কবিদের শ্রেষ্ঠতা - ক্রমপরিবর্তনের তত্ত্ব সূত্রে। সেখানে তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রতিভার সামঞ্জস্য করেছিলেন। পুরোনো কবিদের কাব্যে বর্তমানের জীবন বোধের সমর্থন খোঁজা হয়। প্রত্যেক ভালো লেখকের-ই লেখায় অন্য যুগের দাবী মেটানোর কিছু সম্বল থাকে। তার মধ্যে এমন একটা প্রবৃদ্ধ জীবনচেতনা থাকে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের আবেগকে স্পন্দিত করে। কবি সাহিত্যিকের অন্তর্লোকেই থাকে অভিজ্ঞতার সেইসকল সঞ্চয়। তাহলেও তাদের রচনার মধ্যে থেকে সেই অন্তর্বীজ সন্ধানে অনেকসময় সমালোচনা কর্মই সহযোগী হয়। বুদ্ধদেবের প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা অনেকটা এই মনোভা সঞ্জাত। তিনি যত বিস্তৃতভাবে ভারতের সুপ্রাচীন কাব্যগুলি নিয়ে আধুনিক সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর সমকালের অন্য কোনো কবি সমালোচক তা করেন নি। সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী,

বা আরো অনেকেই সাহিত্য সমালোচনার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্যের যে বিরাট বিস্তৃত ক্ষেত্র, তাতে কোনো আগ্রহ বোধ করেননি। অথচ, ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যে আধুনিক কাব্য শৈলীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ - এঁরা প্রত্যেকেই সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা প্রকাশ করেছেন। কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রবন্ধ নিবন্ধের কথা বিবেচনা করলে, রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই একমাত্র, যিনি 'রামায়ণ', 'মেঘদূত', 'মহাভারত' - এই তিনটি বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থকে নিজের কালের প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করে, তার সঙ্গে আধুনিক জীবন চেতনাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন।

বুদ্ধদেবের সমালোচনা গুলির মধ্যে তাঁর রবীন্দ্রচর্চা দীর্ঘবিস্তারী। ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিদের তুলনায় তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা পরিমাণে অনেকটাই বেশি।[৫] বিশেষতঃ তাঁর সমকালীন তিন প্রধান কবি সমালোচক অর্থাৎ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তীর রবীন্দ্র-দর্শরে তুলনায় বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সমালোচনা অনেক বেশি অনুপুঙ্খ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিষ্ণু দে বিস্তারিত আলোচনাই করেন নি। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে সংকলিত পাঁচটি প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধগুলি হ'লো -

ক) রবীন্দ্র-প্রতিভার উপক্রমণিকা খ) রবিশস্য গ) ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ
ঘ) সূর্যাবর্ত ও ঙ) দিনান্ত।

> এলিয়ট যাকে Workshop criticism বলেছিলেন, বাংলায় তার সাফল্যজনক উদাহরণ হিসেবে এই পাঁচটি প্রবন্ধকে উপস্থিত করা যায়।[৬]

রবীন্দ্র-সমালোচনা বিষয় বিষ্ণু দে-র প্রধান দুটি গ্রন্থ -

১। 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা', (১৩৭২)

২। 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা।' (১৯৬৭) এছাড়া, 'সেকাল থেকে একাল' (১৯৮০) গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স, পাউন্ড, এবং 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার গরজে' প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'এলেমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' -(১৯৫৮) গ্রন্থের 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিও এখানে স্মরণযোগ্য। অমিয় চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলির আধিকাংশ 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ক) রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি, খ) রবীন্দ্র-কাব্যে বিসংগত সত্য, গ) রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঘ) বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ, ঙ) নবজাতকমালা, চ) ছড়া, ছ) কবিতার চেয়ে বেশি, জ) 'গীতাঞ্জলি'ও সত্য কবিতা, ঝ) শেষলেখা এছাড়া, উল্লেখ করতে পারি তাঁর ইংরেজি গ্রন্থটির কথা - 'Modern Tendencies in English Literature' 'কবিতার কথা'য় (১৩৬২) জীবনানন্দ যে ক'টি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সেগুলি হ'লো -

১। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা
২। মাত্রাচেতনা
৩। উত্তর-রৈবিক বাংলাকাব্য

বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সমালোচনার সঙ্গে এঁদের রবীন্দ্র-চর্চার তুলনা করলে দেখা যায়, এঁরা কেউ-ই বুদ্ধদেবের

মতো কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে মূল্যায়ণ করেন নি।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'রবীন্দ্র-প্রতিভার উপক্রমণিকা'য় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো গ্রন্থকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। রবীন্দ্র-সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বটি বিশেষভাবে তাঁর আলোচনার লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র আলোচনায় বুদ্ধদেব যেমন এক-একটি কাব্যের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তেমনি 'রচনাবলী'কে সমগ্রভাবেও দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র রচনাবিশেষের মধ্যে থেকে কবিসত্তার স্বরূপসন্ধান করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থকে বিচারের মধ্যে না এনে রবীন্দ্র-সাহিত্যজীবন বিশেষতঃ তাঁর রচনার প্রথম পর্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্র-সৃষ্টির মধ্যে

> দুর্বল রচনা পরিমাণে অত্যল্প। এমন কি 'প্রভাত সঙ্গীত' -এও
> তাঁর স্বকীয় সুর শোনা গিয়েছিলো।[৭]

এখানেই তিনি লিখেছেন

> বস্তুতঃ রবীন্দ্ররচনাবলীর উত্তরকান্ড একটু বেশি শুদ্ধ ; এবং
> প্রকরণকে প্রসঙ্গের উপরে প্রাধাণ্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা পরিণতির
> দিকে এগিয়েছে।[৮]

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে এরকম টুকরো, বিচ্ছিন্ন মন্তব্যই তিনি বেশি করেছেন। শেষ পর্যন্ত নিজেই বলেছেন-

> আসলে আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্য নিরূপণ গঙ্গা জলে
> গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর;[৯]

বুদ্ধদেব ঠিক এরকম ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যে তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ছবি। আঙ্গিকগত দক্ষতার কথাও তিনি বলেছেন। অবশ্য, রবীন্দ্র-কাব্যসমালোচনা লেখার ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধার কথা তিনিও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতেও সে বাধা রবীন্দ্রনাথ নিজে। এদিক থেকে এই দুই সমালোচকের ভাবনায় মিল খুঁজে পাই। কিন্তু, রবীন্দ্র-সমালোচনার পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার কথা মনে রেখেও বুদ্ধদেব যতটা বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে একের পর এক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র-সমালোচনার পরিসর সে তুলনায় যথেষ্ট অপ্রশস্ত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও স্বল্পবাক্। বিষ্ণু দে-র যে দুটি প্রধান গ্রন্থে আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার পরিচয় পাই - তাতেও দেখি, বুদ্ধদেবের মতো তিনি ধারাবাহিক ভাবে কবি ও কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করেননি। দুটি গ্রন্থেই রবীন্দ্র-সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রপ্রতিভা, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য নিয়ে টুকরো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যই করেছেন। তাঁর আক্ষেপ -

> রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার আমাদের আজও সার্থকভাবে অর্জিত হ'লনা।[১০]

তবে, বুদ্ধদেবের মতো তিনিও রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যের শিল্পসফলতার কথা বলেছেন। এবং

তিনিও মূলগতভাবে রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখার একটি বিরাট বাধার কথা বলেছেন। তাঁর রচনাবলীর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই -

এই মানসের স্বভাবগৌরব আমরা প্রায়-ই বুঝি না।[১১]

অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং রবীন্দ্রনাথ 'একই জগতের অধিবাসী',[১২] ছিলেন। বুদ্ধদেবের মতো তিনিও 'নবজাতক' কাব্যে আধুনিকতার ছোঁয়াচ লক্ষ্য করেছেন।[১৩] রবীন্দ্রনাথের রচনায় বুদ্ধদেব দেখেছিলেন -

সমাজ সচেতন রবীন্দ্রনাথ, দেশসেবক রবীন্দ্রনাথ, কর্মী রবীন্দ্রনাথের
সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের একটা দ্বন্দ্ব আছে।[১৪]

একিন্তু তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিই আসক্ত ছিলেন। অমিয় চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কবিকাহিনী ও কর্মকাহিনীকে মিলিত ভাবে দেখতে চান।[১৫] বিষ্ণু দে কবি, কর্মী ও দেশ সেবক রবীন্দ্রনাথকে অভিন্ন দেখেছেন।[১৬] এখানে মূলতঃ অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণুদে-র রবীন্দ্র দর্শনে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে বুদ্ধদেব কিছুটা ভিন্ন গোত্রের সমালোচনা করলেন।

অন্যদিকের রবীন্দ্র - কবিতায় আবেগের শুদ্ধতার মূল্য দেন জীবনানন্দ।[১৭] রবীন্দ্র কাব্য ধারার কোনো একটি মাত্র পর্যায় তাঁর উল্লেখ্য নয়। কবি - স্বভাব যে ক্রমে শুদ্ধ হয়ে -

প্রতি পর্যায়ে - কবিতার সারাৎসার রেখে যেতে পারে, তার-ই প্রাণনা
দেখেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথে।[১৮]

তাঁর মতে, ' শেষ লেখা', 'পূরবী' অথবা 'বলাকা' কোনোটাই কম মূল্যবান নয়। জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর সমগ্রতায়। পাশাপাশি স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যধারার প্রতি বিষ্ণু দে-র পক্ষপাতের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বলাকা' থেকে সমাজ প্রাধান্য পেতে থাকে বলে আপত্তি বুদ্ধদেবের। কিন্তু, জীবনানন্দ চেয়েছিলেন -

কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা, মর্মে থাকবে
পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।[১৯]

তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজবোধের জন্য তিনি বুদ্ধদেবের মত নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন না।

বুদ্ধদেবের সমকালীন অন্যান্য সমালোচকেরা ইয়োরোপীয় কবি ও কবিতার প্রসঙ্গ দিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন। এক্ষেত্রে, প্রথম থেকেই তাঁরা তাঁদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী আলোচনার বিষয়ে নির্বাচন করেছেন। বুদ্ধদেবের কাব্যভাবনার সঙ্গে যেমন বোদলেয়ার, হ্যোল্ডার্লিন, রিল্কে প্রভৃতি ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিদের কাব্যভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এলিয়টের প্রভাব লক্ষনীয় হয়েছে। বোদলেয়ার, মালার্মে, ভালেরি প্রমুখ ফরাসী আধুনিক কবিদের কাব্য থেকে পরিগ্রহণ করেছেন তিনি।[২০] বিষ্ণু দে-র কবিতায় পাউন্ড এলিয়ট এলুয়ার, আরাগঁ প্রভৃতি কবির প্রভাব আছে। অমিয় চক্রবর্ত্তী ইংল্যান্ডের কবি হপকিন্স পড়েছেন।[২১] এলিয়টের প্রভাব তাঁর উপর ততটা নেই, যতটা সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় পাওয়া যায়। জার্মান কবি রিল্কে এবং ধর্মীয় কবি পল ক্লোদেল অথবা-

আঙ্গিকগত উৎকর্ষের কবি উনগারেত্তির সঙ্গেও তাঁর কবিতার যুক্ত
আলোচনা সম্ভব।[২২]

জীবনানন্দকে প্রভাবিত করেছেন ইয়েটস, বোদলেয়ার, এলেন পো। 'কবিতার কথা' র তিনি এদের নাম উল্লেখ করেছেন।

T.S.Eliot এর 'Traditional and Individual Talent' প্রবন্ধটির প্রতিফলন দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' (১৯৩০) প্রবন্ধটিতে। আধুনিক কবিকে ঐতিহ্যের কাছে যেতেই হবে, এলিয়টের এই বক্তব্য সুধীন্দ্রনাথ শিরোধার্য ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ঐতিহ্য ও টি.এস. এলিয়ট' (১৯৩৪) প্রবন্ধ টি উল্লেখযোগ্য। সেখানে সুধীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য- ঐতিহ্য ব্যতীত শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। কোন যথার্থ আর্টিষ্ট স্বয়ম্ভূ নন। তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- কাব্যে দূষিত বা কুশ্রী কলে কিছু নেই। এই নতুন ভাবনার পথ প্রদর্শক বোদলেয়ার। তাহলে, বাংলা কবিতায় সুধিন্দ্রনাথ তাঁর প্রভাব কে স্বীকার করেছেন। বোদলেয়ার প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। আধুনিক কবিতা বিষয়ক ভাবনায় বুদ্ধদেব বোদলেয়ার কে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক কবিতার মূল সূত্র গুলি তিনি তাঁর কাছ থেকেই সন্ধান করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে য়ুরোপীয় কবিদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করে এলিয়ট। হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের মতো তিনি আগ্রহী নন, বরং তাঁর আলোচ্য অন্যান্য য়ুরোপীয় কবি সাহিত্যিক।

বিষ্ণু দে এলিয়ট সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'টমাস স্টার্নস এলিয়ট', 'টি.এস.এলিয়টের মহাপ্রস্থান', 'এলিয়ট প্রসঙ্গে'- ইত্যাদি। বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের এলিয়ট-প্রীতির তুলনা চলে। এই দুই সমালোচক-ই এলিয়টের প্রতি গভীর আগ্রহ বোধ করেছেন। কিন্তু, বুদ্ধদেব এলিয়ট প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন মন্তব্য করলেও কোন প্রবন্ধ লেখেন নি। বিষ্ণু দে রিল্কে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন-

রিল্কের মধ্যে বস্তুর বিষয়ে তদ্গত আত্মদানের মেজাজ মরমিয়া হয়ে যায়।[২৩]

বুদ্ধদেবও রিল্কে চর্চায় শেষ পর্যন্ত বলেছেন - তাঁর ঈশ্বরানুভূতি, কল্পনা ও আবেগের আতিশয্য রূপান্তরিত হয় বিষয় নিরপেক্ষ তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখানে দুই সমালোচকের রিল্কে চর্চার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দুজন-ই রিল্কের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিষয় নিরপেক্ষ বলেছেন। বিষ্ণু দে-র সমালোচনায় জার্মান কবি ব্রেখ্‌ট যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তাঁর মতে, আধুনিক সাহিত্যের দক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্রেখ্‌টেই পেয়েছে অভূতপূর্ব সার্থকতা।[২৪] বুদ্ধদেবের সমালোচনায় জার্মান কবি হ্যেল্ডার্লিন, রিল্কে গুরুত্ব পান, কিন্তু ব্রেখ্‌টের প্রসঙ্গে কোনো প্রবন্ধ নেই। সমকালীন অন্য সমালোচকেরাও ব্রেখ্‌ট সম্বন্ধে ততটা আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

আধুনিক বাংলা কবিতায় অমিয় চক্রবর্ত্তী এলিয়টের প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। তবে, সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দের মতো ততটা উচ্ছ্বসিতও তিনি নন। পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আগ্রহী হলেও পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। কিন্তু, 'পাস্তের নাক-এর প্রসঙ্গে দুটি চিঠি' তে অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎকর্ষ বিচার করেছেন।

য়ুরোপীয় কবিদের সম্বন্ধে জীবনানন্দ পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। তবে, টুকরো বিচ্ছিন্ন মন্তব্যে

তিনিও একথা উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক বাংলা কাব্যে য়ুরোপীয় কবি সাহিত্যিকদের ঋণ স্বীকার করতে হয়। একথা ঠিক যে, রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা যে য়ুরোপীয় কবি ও কবিতা থেকে পুষ্টি লাভ করেছে, তা রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রধান প্রধান কবি সাহিত্যিকরা স্বীকার করেছেন। তবে, বুদ্ধদেবের রচনায় য়ুরোপীয় কবিদের মধ্যে যেমন বোদলেয়ার পৃথক মাত্রায় ঋদ্ধ, তাঁর সমকালীন অন্যান্যরা বোদলেয়ারকে ততটা গুরুত্ব দেন নি। বরং, সুধীন্দ্র নাথ, বিষ্ণু দে'র রচনায় এলিয়ট-ই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছেন।

বুদ্ধদেবের সমালোচনায় আধুনিক বাঙালি কবি ও বাংলা কবিতার প্রসঙ্গও যথেষ্ট বিস্তৃত তিনি তাঁর সমকালীন ও কিছু পূর্ববর্তী আধুনিক কবি ও কবিতা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করেছেন। সুধীন্দ্র নাথ, বিষ্ণু দে বা সমকালীন অন্যান্য সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রসঙ্গে আমার নিরীক্ষার বিষয়।

সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখা সুধীন্দ্র নাথের প্রবন্ধ 'কুলায় ও কাল পুরুষ' (১৩৬৪) গ্রন্থে 'উক্তি ও উপলব্ধি', 'চোরা বালি', 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মধুসূদনের অবদান সম্বন্ধে সুধীন্দ্র নাথের বক্তব্য হ'লো -

> মাইকেল শুধু ম্রিয়মান বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলে ঝিমিয়ে পড়েননি,
> বাঙালি কবিকে তরজা ওয়ালার দল থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন তিনি।[২৫]

তাঁর ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন -

> তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিল, এবং সজীব
> ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দ কোষের-ই শরণ নিয়ে
> থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত
> বাংলা ঐকান্তিক দৈন্য ও মানা চাই।[২৬]

সুধীন্দ্রনাথের সমকালীন হয়েও বুদ্ধদেব কিন্তু মধুসূদনের খ্যাতির সঙ্গে তাঁর কীর্ত্তির 'সুমাত্রা সূত্রের সম্বন্ধ'[২৭] খুঁজে পান নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী মধুসূদনের কীর্ত্তি ন্যূনতম। বুদ্ধদেবের সমকালীন আর এক কবি বিষ্ণু দে ভিন্নতর দৃষ্টি কোণ থেকে মধুসূদনের কবি প্রতিভার বিচার করেছেন। তৎকালীন শিল্প চিন্তার পটভূমিতে ভাষা সম্বন্ধে তিনি মধুসূদনের অসাধারন দক্ষতার কথা বলেন। য়ুরোপীয় ভাষা সাহিত্যে পারদর্শী মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা -

> কি করে এই প্রায় বাইরের মানুষ ভাষার প্রকৃতির একেবারে অন্তরের
> খোঁজ পেলেন?[২৮]

এর উত্তরে বিষ্ণু দে নিজেই বলেন -

> শব্দের পর্যায়ে হয়তো তাঁর উপযুক্ত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য কম ছিল, মাতৃ
> ভাষার সেমান্টিক তত্ত্বে হয়তো তিনি যথোচিত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারেন
> নি, কিন্তু তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছিল ভাষার কথন ছন্দ, ভাষার দেশজ
> ব্যবহারের স্মৃতি।[২৯]

বুদ্ধদেব কিন্তু মধুসূদনকে বাংলা ভাষাতেও দক্ষ শিল্পী বলতে চান নি।

> মৃত শব্দ রাজিতে আকীর্ণ বলে মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না।[৩০]

বুদ্ধদেবের সমকালীন দুই সমালোচকের বক্তব্য বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ন পৃথক। সাহিত্য কর্মে মধুসূদন যেখানে সফল, সেখানে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় গগনস্পর্শী। ভাষা বিন্যাসে বা শব্দ যোজনায় তিনি তেমন সতর্ক না হলেও তাঁর উদ্যোগ অভিনন্দন যোগ্য। তাঁর 'মেঘনাদ বধে'র শিল্প সাফল্য আজ প্রায় তর্কাতীত। ফলে, আধুনিক বাংলা কবিতা সমালোচনায় বুদ্ধদেবের কৃতিত্বের কথা মনে রেখেও বলা যায় মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ণে তাঁর সমকালীন অন্যান্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ।

বিষ্ণু দে বিষয়ে বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ ছাড়াও সমকালীন সমালোচক সুধীন্দ্র নাথ দত্ত ''চোরাবালি'' প্রবন্ধ লিখেছেন। 'চোরাবালি' কাব্যের ভূমিকাও তাঁর-ই লেখা। 'চোরাবালি' প্রবন্ধের নাম হলেও সুধীন্দ্র নাথ এখানে বিষ্ণু দে-র সমগ্র কবি কৃতির মূল্যায়ণ করেছেন তাঁর মতে বিষ্ণু দের কবি প্রতিভা অসামান্য ও অভিনব।[৩১] বিষ্ণু দে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্বপ্নবাক্। একমাত্র 'চোরাবালি' প্রবন্ধে তিনি সমকালীন এই বড় কবির কাব্যকৃতির সমালোচনা করলেন। এখানে তিনি কাব্য হিসেবে 'চোরাবালি'কে উৎকৃষ্ট বললেও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর শব্দ ব্যবহারে করায় সৎপাঠকের পাঠ ব্যাহত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩২] কিন্তু, বুদ্ধদেবের-ই সমকালীন সমলোচক সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভিন্ন মাত্রার। বিষ্ণু দে-র কাব্য 'অভাবনীয় রূপে কন্টকাকীর্ণ'[৩৩] এমন মত যারা পোষণ করেন, এর উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন -

> বিষ্ণু দে'র তুল্য নিরাভরণ লেখক এদেশে বিরল।[৩৪]

বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক বহু প্রসঙ্গ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রাচ্য প্রাত্যীচ্যের ঐতিহ্য, পুরাণ প্রতিমা, লোককথা, কিংবদন্তী, ইতিহাস ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে উপাদান হিসেবে এসেছে।

> অবশ্য এই ঐতিহ্য কেবল বঙ্গদেশীয় নয়, বিশ্বমানবিক।[৩৫]

বিষ্ণু দে'র কাব্য প্রক্রিয়ার এই সারসত্তা উপলব্ধি করতে পারলে, তঁর কবিতাও বিষয় মাহাত্ম্যে, আর্য গৌরবে সার্বজনীন অনুভূতির বাহন হয়ে উঠবে- এরকম মনে করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় বিষ্ণু দে'র কবিতার ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত এই 'বিশ্বমানবিক' ধারাটির কথাও বলেননি। আবহমান মানব সভ্যতার ব্যাপ্ত পটভূমি উপস্থিত বলে বিষ্ণু দে-র কবিতার শব্দ, অনুসঙ্গ ও চিত্ররূপ গুলিকে খানিকটা রহস্যাবৃত বলে মনে হয়। বুদ্ধদেবের সমালোচনা সেই রহস্য উন্মোচনেও সাহায্য করে না।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবি - ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাঁর সমকালীন অন্য কোন সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এত বিস্তৃত আলোচনা করেননি। জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা' য় 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি মাত্র অনুচ্ছেদ লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য - ' আধুনিক বাংলা কাব্যে সবথেকে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা' তিনি।[৩৬] আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় এদিক থেকে তিনি বিশিষ্ট। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় লিখেছেন - ব্যর্থতা ও হতাশা কবি মেনে নিয়েছেন

নিজের ভাগ্য ব'লে।[৩৭] জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথকে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের অর্ন্তযামী শিষ্য। বুদ্ধদেবেরও বক্তব্য - রবীন্দ্র রীতি বর্জনের চেষ্টা তিনি করেন নি, বরং তা থেকে যথেচ্ছ আহরণ করেছেন তিনি। তাহলে, একথা বলা যেতে পারে যে, সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সমালোচনাই সমগ্র সুধীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের আলোচনা দীর্ঘ। অন্য কোনো সমকালীন সমালোচক এত দীর্ঘ আলোচন করেন নি। বুদ্ধদেবের মতো জীবনানন্দও স্বীকার করেছেন, তাঁর কবিতার আঙ্গিকের বিচিত্র আবহের কথা।[৩৮] তাঁর মতে, আঙ্গিকের ইশারা কবি পেলেন হপ্‌কিন্সের কাছে। বুদ্ধদেব অমিয় চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ আলোচনা করলেও কোথাও হপ্‌কিন্সের কথা উল্লেখ করেন নি।

প্রমথ চৌধুরী বিষয়ে বুদ্ধদেব ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সমালোচক জীবনানন্দ দাশ। তিনি দুটি চিঠি লিখেছিলেন — এতে বুদ্ধদেবের মতো তিনিও প্রমথ চৌধুরীর গদ্য শিল্প, শিল্প রচনার দক্ষতা, ও অন্যান্য প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন।[৩৯]

অমিয় চক্রবর্ত্তী লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ। 'সাহিত্য গুরু প্রমথ চৌধুরী' এবং 'প্রমথ চৌধুরীর গল্প' — দুটি প্রবন্ধ-ই তাঁর গদ্য গ্রন্থ 'সাম্প্রতিক' এ (১৯৬৩) প্রকাশিত। অমিয় চক্রবর্ত্তী মনে করেন, প্রমথ চৌধুরী বিশেষ ভাবে আধুনিক লেখকদের শিক্ষাগুরু।

> ভাষার টেকনিকে এবং প্রসাধন সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ঋণী।[৪০]

তবে জীবনানন্দ দাশ বা অমিয় চক্রবর্ত্তীর সমালোচনা বুদ্ধদেবের প্রমথ - সমালোচনার বাইরে কোনো নতুন দিক উদ্‌ঘাটন করে নি। প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে বিষ্ণু দে'র প্রবন্ধ 'প্রমথ চৌধুরী ও আমরা'।[৪১] তিনি প্রমথ চৌধুরীর রচনাগুলি অর্থাৎ, Text এর যে সমালোচনা করেছেন, তা কিন্তু বুদ্ধদেব বা অন্য কোনো সমকালীন সমালোচক করেন নি।

সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র[৪২] সমালোচনা করেছিলেন বিষ্ণু দে। বুদ্ধদেব মনে করতেন, তাঁর কবিতা কেবল-ই গদ্যে রচিত।[৪৩] বিষ্ণু দে লিখলেন -

> ভাষা তার অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগ রীতি
> কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্ক বাহক নয়।[৪৪]

সমর সেন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে-র সমালোচনার একটি বড় পার্থক্য হ'লো - বিষ্ণু দে মনে করতেন, সমর সেনের কাব্যলোকের জলবায়ু একান্তই রবীন্দ্র কবিতার। বুদ্ধদেবের মতে, সমর সেন রবীন্দ্র প্রভাবে কখনোই পড়েন নি।

> কয়েকটি কবিতা'য যে রকম সচেতন ও তির্যক ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-কাব্য
> উদ্ধৃত করা আছে, তাতেই বোঝা যায় যে, আমাদের যেমন প্রথম
> যৌবনে নিঃশ্বাসের বাতাস-ই ছিলো রবীন্দ্র-কাব্য, এ কবির সেরকম নয়।[৪৫]

কবি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন জীবনানন্দ। তাঁর 'নজরুলের কবিতা' নামের প্রবন্ধ টি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫১, কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা) নজরুল কে তিনি বড় কবি না বললেও অনেক সফল কবিতার স্রষ্টা বলেছেন। নজরুল সম্বন্ধে তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে শারদীয় সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'কবিতা পাঠঃ দুজন কবি'। এই দুই কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ও নজরুল ইসলাম। কাউকেই বড় কবি না বললেও নজরুলের কবি প্রতিভার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। তবে, নজরুল সম্বন্ধে জীবনানন্দের বক্তব্য খুব পৃথক নয়।

সমকালীন অপ্রধান কবিদের সম্পর্কেও বুদ্ধদেবের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁদের সমকালের অপ্রধান কবিদের পৃথক ভাবে গুরুত্ব দিয়ে কোন প্রবন্ধ-ই লেখেন নি। বুদ্ধদেব তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় এবং কোন কোন গ্রন্থেও এঁদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

বুদ্ধদেবের সমকালের তিন প্রধান কবি সমালোচক-ই তাঁদের প্রবন্ধ নিবন্ধে জোরের সঙ্গে আধুনিক কবিতাকেসমর্থন করেছেন, আধুনিক কবিতার শিল্প তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তাঁরা অনুসরণ করেন নি, সে সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

> বস্তুত বাংলা ভাষার আলোচ্য কবিরা আধুনিক কবিতার সমর্থনে
> পাউন্ড, এলিয়ট প্রভৃতির প্রবন্ধ থেকে, আদর্শ পরিগ্রহন করেছেন।[৪৬]

'কবিতার কথা' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ ও আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি যুগ এবং তাঁর কাব্যে সামগ্রিক পূর্ণতায় তিনি দীপ্যমান। তাহেলেও, আধুনিক কবিতা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে-

> রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিপরীত পৃষ্ঠা রূপে পরিকল্পিত হয়েছে।[৪৭]

জীবনানন্দ অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়াটাকেই আধুনিক কবিতার আসল কথা মনে করেন নি।

> দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে
> ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর - সাহিত্যের ইতিহাসে
> এরকম আন্দোলনের কোন স্থান নেই।[৪৮]

তাছাড়া, শুধুমাত্র অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরামর্শ নিয়ে নতুন কবিরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেনা। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবি, তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনা প্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্টি হয়- এমন একটা সঙ্গতি পায়, যা তাঁর কবিতায়-ই সম্ভব- অন্য কারও কবিতায় নয়। [৪৯] তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার সূচনার আগেই রবীন্দ্র কাব্যের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়বার একটা চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। তবে, রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার জন্ম হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।[৫০] কোনো কোনো আধুনিক কবির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। এবং এজন্যই আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্র - কাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করে।[৫১] জীবনানন্দের বক্তব্য হ'ল আধুনিক বাংলার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হ'ল নতুন সময় তার

নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে।[৫২] এবং রবীন্দ্র - পরবর্তী কবিরা অনেকেই বোদলেয়ার ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েট্‌স, এলিয়ট ও পাউন্ডের কাছে গেলেন খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও অবিনবত্বের আকর্ষণে। আধুনিকদের একটা বিশিষ্ট অংশ রবীন্দ্র-কাব্যে বার বার অনুষ্ঠিত হয়েছেন। তাহলেও,

> আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তা বৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে
> ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশি।[৫৩]

বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে এই বিষমতা দুরতিক্রম্য। কোনো আধুনিক লেখক তাঁকে এড়াতে পারেন নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শেষ জীবনে এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তঃ গ্রথিত করে কাব্য রচনা করে গেছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন 'উত্তর-রৈবিক যুগ 'কল্লোলের'র পর থেকে আরম্ভ।'[৫৪] এ যুগ অনেক লেখকের - একজনের নয় - কয়েকজন কবির যুগ। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্যের পর এই নতুন কবি সাধারণ সংঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান।[৫৫] বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশের - ই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে, অন্যত্র নেই - একথা ঠিক নয়। সব সময়ের জন্যই আধুনিক - এরকম কবিতা বা সাহিত্যের স্থিতি সম্ভব।[৫৬] মানুষের মনের চির পদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়, তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।[৫৭] এদিক থেকে তিনি 'মহাভারতের'র কোনো কোনো অংশকেও আধুনিক কবিতা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের মতে,

> বাংলার - আধুনিক সংস্কৃতি একা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।[৫৮]

এবং, আজ অবধি একা তিনি সেই সংস্কৃতির পরিচালক।[৫৯]

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছাড়া আমাদের মাতৃভাষার আজ আর পৃথক কোনো সত্তা নেই। তার সম্মোহন কাটাবার চেষ্টা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং 'সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্বতঃ কাম্য'।[৬০] তার বিশিষ্টতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ - ই আমাদের দীক্ষাগুরু।

> কাব্যকলার কৌশল সম্পর্কেও বাংলাদেশের যতখানি
> জ্ঞান সে সমস্ত তাঁর শিক্ষাপ্রসূত তথা দৃষ্টান্ত লব্ধ।[৬১]

বিষ্ণু দে মনে করেন,

> বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্প সাহিত্যে তো
> বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি, মানবজীবন ও কর্মের,
> আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত। [৬২]

তিনি লিখেছেন -

> সাহিত্যে আধুনিক চিন্তামগ্নতা প্রথম চর্চা করেন রবীন্দ্রনাথ।[৬৩]

য়ুরোপে সাবেক 'আস্তিক্যের অবক্ষয়ে'[৬৪] নেতির চরম উপলব্ধি যেমন কম বেশি শিল্পীর সাহিত্যিকের সত্তাকে সংগঠিত করেছিলো, একালের ইতিহাস - সঙ্গত তত্ত্বে ও সাহিত্য সৃষ্টির বিকাশ লাভের প্রক্রিয়ায় তার প্রভাবের

কথা বিষ্ণু দে স্বীকার করেন। আধুনিকদের রচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ দেখেন ঔদ্ধত্য, স্পর্দ্ধা, অঘোরপন্থী বীভৎস বা কুৎসিতের প্রতি আকর্ষণ। বিষ্ণু দে নিজে এই দুই মানস জগতের ব্যবধানের কথা উল্লেখ করেন।

জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে- এঁরা প্রায় প্রত্যেকে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে আন্বিত করে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'Modern Tendencies in English Literature' গ্রন্থটির কথাও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-

> In the poetry of the great modern, Rabindra Nath Tagore, a fine balance of values can be found; and that is so because his genious accepts the Age under the scrutiny of full poetic responsibility . . . self creation, according to Tagore, lies at the root of human existance and the self creative urge of man makes him use the materials of life by mastering the law of perfect being.[৬৫]

এখানে অমিয় চক্রবর্ত্তী যে নতুন মূল্যবোধ ও কাব্য দায়িত্বের কথা বলেছেন, তা ও অনেকটা অভিনব। পূর্ববর্তী সমালোচনার তত্ত্ব বা চারিত্র্য থেকে তা আনেকটা আলাদা।

আধুনিকতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সমকালের প্রধান প্রধান সমালোচকদের বক্তব্য এবং বুদ্ধদেবের বক্তব্যে সাদৃশ্য আছে। এঁরা প্রত্যেকে তাঁদের আধুনিকতার ধারনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে যুক্ত করে রেখেছেন। প্রত্যেকে একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, টিকে থাকাটাই সত্যিকার আধুনিকতা। অর্থাৎ, আধুনিকতার সঙ্গে চিরন্তনতার তত্ত্বকে মিলিয়ে নিয়েছেন। সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্য হ'ল- তিনি এই আধুনিকতাকে কেন্দ্রে রেখে সাহিত্য বিচার করেছেন। আধুনিক সাহিত্য কীভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত? কী ভাবে আলাদা? আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের প্রকৃতি কী? তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যোগ কোথায়? ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করেছে তাঁর বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধগুলি। তাছাড়া, কাব্য কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে ও তা আধুনিক কি-না, তা কবিতা হ'ল কি-না, সেই কাব্যে কোনো স্বকীয়তা আছে কি- না ইত্যাদি যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন আধুনিক কবিরা বারম্বার, তা সমালোচক বুদ্ধদেবেরও ভাবনার বিষয়। যে রচনার সমালোচনা তিনি লিখেছেন, সেটি তার কাছে নতুন আবিস্কার।[৬৬] সুবিস্তৃত সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সেই সাহিত্যকে জরিপ করেন, কতো বিভিন্ন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত লেখককে তিনি আবিস্কার করেন, স্বধর্ম ও সময় ধর্মের সংকট কাটিয়ে শিল্পী কিভাবে কালজয়ী হন্ সাহিত্য শিল্পের সেই চাবিকাঠি ও তিনি খুঁজে নিতে চান শিল্পের ভিতর থেকে। রাজনীতি বা সাহিত্যের কোনো শিবিরে তিনি আস্থাশীল নন। সাহিত্য বিচারের কোনো স্থির মানদন্ডও নেই তাঁর। সমকালের কবি সাহিত্যিক, য়ুয়োপের সাহিত্য ও সাহিত্যিক কিংবা রবীন্দ্রনাথ, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বিচার- এই ব্যাপ্ত সমালোচনার ক্ষেত্রে ও তিনি সেরকম কোনো স্থির নিকষ ব্যবহার করেন নি-। তবে, সর্বত্রই তিনি আধুনিকসাহিত্যরুচির পরিচয় দিয়েছেন। যা কিছু স্বতঃ সিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতেই প্রশ্ন তুলেছেন-। প্রকৃত কবিতা আবিস্কার করেছেন তাতেই, যাকে আমরা এতকাল দেখেছি ধর্মগ্রন্থ রূপে।[৬৭] সেই অর্থে তাঁর কোনো তত্ত্বাদর্শ নেই, তত্ত্বাদর্শের কথা বলতে গেলে বলতে হয় আধুনিক সাহিত্যের মনোদর্শন প্রচার করাই ছিল তাঁর অভীষ্ট। এবং এটিই ছিল তার লক্ষ্য। আধুনিকদের সঙ্গে পূর্বতন সাহিত্যের যে মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট তার জন্য সময় স্বভাবকেই দায়ী করেছেন তিনি।

নির্দেশিকা

১। মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃঃ ২৯৫.

২। তদেব, পৃঃ ২৯৫.

৩। তদেব, পৃঃ ২৯৫.

৪। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কার্ত্তিক ১৩৯০.

৫। ভট্টাচার্য, সুতপা, 'বুদ্ধদেব বসু ঃ রবীন্দ্রনাথ', কবির চোখে কবি, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ৬৭.

৬। মুখোপাধ্যায়, অরুণ, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, শ্রাবণ ১৩৭২, পৃঃ ২৬৪.

৭। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'রবিশষ্য', কুলায় ও কালপুরুষ, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ১৪.

৮। তদেব, পৃঃ ২৫.

৯। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'দিনান্ত', কুলায় ও কালপুরুষ, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৩.

১০। দে, বিষ্ণু, 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী', মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলিকাতা মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৬৭, পৃঃ ৫০.

১১। তদেব, পৃঃ ৫৪.

১২। বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী, ১৯৫৯, পৃ ঃ ৯৯.

১৩। চক্রবর্ত্তী, অমিয়, 'নবজাতকমালা', সাম্প্রতিক, কলিকাতা, নাভানা, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৬৩, পৃঃ ১৮৩.

১৪। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ১২১.

১৫। তদেব, পৃঃ ১২১.

১৬। দে, বিষ্ণু, শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলিকাতা, প্রতিভাস, ১৯৬৬ পৃঃ ৩৬.

১৭। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭ পৃঃ ১৭.

১৮। তদেব, পৃঃ ১৭.

১৯। দাশ, জীবনানন্দ, 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য', কবিতার কথা, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃঃ ৩৩.

২০। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলিকাতা, নবার্ক, ১ম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৬, পৃঃ ১৭১.

২১। তদেব, পৃঃ ১৫৯.

২২। তদেব, পৃঃ ১৭০.

২৩। দে, বিষ্ণু, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলিকাতা, প্রতিভাস, ১৯৬৬ পৃঃ ৭৫.

২৪। তদেব, পৃঃ ৯৯.

২৫। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর, কার্ত্তিক ১৩৯০, পৃঃ ২৪৪.

২৬। তদেব, পৃঃ ২৪৪.

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪ পৃঃ ২৫.

২৮। দে, বিষ্ণু, 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁন্স', মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, মণীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১৯৬৭ পৃঃ ৪.

২৯। তদেব, পৃঃ ৪.

৩০। বসু, বুদ্ধদেব, ' মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ৩২

৩১। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ' চোরাবালি', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউণ্ডেশন যাদবপুর, কার্ত্তিক ১৩৯০, পৃঃ ২৯০

৩২। বসু, বুদ্ধদেব, 'চোরাবালি', কালের পুতুল, কলকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৭৯

৩৩। দত্ত সুধীন্দ্রনাথ, 'চোরাবালি', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশ সংগ্রহ কলকাতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর, কার্ত্তিক ১৩৯০, পৃঃ ২৯০

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৯১

৩৫। তদেব পৃঃ ২৯১

৩৬। দাশ, জীবনান্দ, 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', কবিতার কথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃঃ ৩৮

৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৩৮। দাশ, জীবনান্দ, 'উত্তররৈকি বাংলা কাব্য', কবিতার কথা, কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃ৩৮

৩৯। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, ঢাকা মুক্তধারা, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৪-৩৫ এবং ৩৫-৩৬

৪০। চক্রবর্ত্তী, অমিয়, 'সাহিত্যগুরু প্রথম চৌধুরী' সাম্প্রতিক, কলিকাতা, নাভানা, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৬৩, পৃঃ ১০২

৪১। দে, বিষ্ণু, 'প্রথম চৌধুরী ও আমরা', মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৬৭.

৪২। পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৪ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, সমর সেন সংখ্যা (পুর্নমুদ্রিত), পৃঃ ১০

৪৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৭

৪৪। পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৪ সংখ্যা অনুষ্টুপ, সমর সেন সংখ্যা (পুর্নমুদ্রিত), পৃঃ ১০

৪৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের নুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৮

৪৬। মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরেপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৮৬, পৃঃ ৩৬

৪৭। তদেব, পৃঃ ৩৭

৪৮। দাশ, জীবনানন্দ, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', কবিতার কথা, কলকাতা, সিগনেটপ্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃঃ ২০

৪৯। তদেব, পৃঃ ২০

৫০। তদেব, পৃঃ ২১

৫১। তদেব পৃঃ ২১

৫২। তদেব, পৃঃ ২৪

৫৩। তদেব, পৃঃ ২৬-২৭

৫৪। দাশ জীবনানন্দ, ' উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', কবিতার কথা,কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ৬ই ফাল্গুন ১৩৬২, পৃঃ ৪০

৫৫। তদেব, পৃঃ ৪০-৪১

৫৬। দাশ, জীবনানন্দ, ' আধুনিক কবিতা', কবিতার কথা, কলকাতা, সি গনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২, পৃঃ ১১৬

৫৭। দিব, পৃঃ ১১৬

৫৮। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ , 'রবিশস্য', কুলায় ও কালপুরুষ, কলকাতা সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ১৩

৫৯। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমনিকা',কুলায় ও কালপুরুষ,কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৮

৬০। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ' সূর্যাবর্ত', কুলায় ও কালপুরুষ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৬১

৬১। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'দিনান্ত', কুলায় ও 'কালপুরুষ' কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৩

৬২। দে, বিষ্ণু, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৬৬, পৃঃ ১১

৬৩। তদেব, পৃঃ ৩৪

৬৪। তদেব পৃঃ ৮৭

৬৫। Chakrobarty Amiya, Introduction, Modern Tendencies in English Literature, Calcutta, Book Exchange, 1942, page-9

৬৬। দত্ত জ্যোতির্ময়, 'সাহিত্যসমালেচনাচক বুদ্ধদেব', বৈদগ্ধ্য, শেখর বসুরায় (সম্পদনা), বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, মে ১৯৯৯, পৃঃ ৯২

৬৭। তদেব, পৃঃ ৯৪

উপসংহার

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম যে সব শিল্পীর হাত ধরে হচ্ছিল তাতে বুদ্ধদেব ছিলেন একাধারে শিল্পী এবং ধাত্রী। তিনি যেমন নিজে নূতন কালের সাহিত্য রচনা করছিলেন তেমনি তাঁর কালের শিল্পীদের একটি পত্রিকার সংগঠিত প্রয়াসের মধ্যে এনে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পর্বান্তরের ঘোষণা করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর ভূমিকা দ্বিবিধ। তিনি বাংলা সাহিত্যের নূতন নূতন প্রতিভার সন্ধান করছিলেন এবং নূতন নূতন প্রবনতার উন্মোচন করে বাংলা সাহিত্যেকে একটা নূতন কালের দিশা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের লেখায় একদিন প্রকাশিত হয়েছিল নূতন কালের মানবাত্মার ক্রন্দন। প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী, আবার তারই ভিতরে থাকে অমৃতের পিপাসা। আর সেই পিপাসা থেকে কবি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন "মোরে আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান" (বন্দীর বন্দনা, ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৯৬২, পৃঃ ২৯)। প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী আত্মসত্তাকে তিনি নিজেই মুক্ত করেছেন। এই মুক্তিই তাঁর শিল্পী সত্তার সৃষ্টি।

বুদ্ধদেবের কাব্য এবং সমালোচনাকে এই কারনে মনে করি একই শিল্পী সত্তার দুই মুখ - কিন্তু দুইয়েরই লক্ষ্য এক। দুইয়েরই পরিপুষ্টিতে গড়ে উঠেছে শিল্পী সত্তার এক অনির্বাণ জ্যোতি - যাকে বলা যায় শিল্পী বুদ্ধদেব। শিল্পী বুদ্ধদেবের যে সত্তা,তার সৃজনশীলতার আর একটি রূপ সেই সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে তাই কবি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না। আর এখানে অনিবার্যভাবে এক ঐতিহ্যের কথা চলে আসে। একদিন প্রাজ্ঞ এলিয়ট বলেছিলেন কবিরাই কাব্যের উত্তম সমালোচক - তাঁরাই কাব্য যথার্থ অনুধাবন করেন এবং সমালোচনা করেন - অন্যদের সম্বন্ধে তাঁর ধারনা খুব সদর্থক নয়। যদিও পরবর্তীকালে এই ধারনা তিনি আর অনুসরণ করেননি। তথাপি তাঁর প্রতিপাদ্যের সত্যতা তাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়না। বুদ্ধদেবকেও বলতে পারি সেই অর্থে কবি সমালোচক। এলিয়ট লিখেছিলেন কবি সমালোচক তিনিই যিনি তাঁর সৃষ্টির ইন্ধনরূপে কাব্য সমালোচনা করেন আর তারই ভিতর থেকে তাঁর নূতন সৃষ্টির সম্ভবনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের লেখায় সমালোচনার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা কতটা উদঘাটিত হয়েছে বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় তিনি কাব্য সমালোচনা করেছেন তাঁরই কাব্যে সৃজনশীলতার একটি অঙ্গ হিসেবে। রবীন্দ্র সমালোচনার ভূমিকা হিসেবে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন " বহু দিনের সঞ্চিত এবং অনবরত পরিবর্তমান ভাবনাগুলিকেও অন্তত নিজের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে " তিনি এই সমালোচনাগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন। আর এইভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে ভাবনার ক্রমাগ্রসর এক সন্ধিতে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের সৃজন সাহিত্য একদিকে ছিল নিজের সৃষ্টিতে তাঁর ক্রমাগ্রসরতা আর তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল তাঁর কালের বাংলা সাহিত্যকে এক নূতন কালের চেতনায় অভিসিক্ত করা।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বুদ্ধদেব কী এনেছেন ? প্রথমেই এর স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না। আমরা যদি দেখি রবীন্দ্রনাথের যে চিরন্তন আনন্দবাদী সাহিত্য তত্ত্ব - রোমান্টিকতা উন্মুখ যে সাহিত্য ভাবনা সেই ভাবনার ঢেউই চলে এসেছিল প্রাক্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত। সেই পর্বে যাঁরা রবীন্দ্র বিরোধী তাদের দুটো মুখ

ঃ একদল প্রাচীন সমালোচক একদল নবীন। কিন্তু প্রাচীন বা নবীন যাই হোক উভয় শ্রেণীর সমালোচনাতেই আছে রবীন্দ্র সাহিত্যের বস্তুভারহীনতার অভাবের কথা আর অন্যদিকে অভিযোগ মায়িকতার এবং অযথার্থ কথনের অপ্রশংসা। একদিকে এসেছে বাস্তবতার অভাবের কথা অন্যদিকে নীতি দুর্নীতির প্রশ্নে নানা তর্ক বিতর্ক। এই তর্কবিতর্কে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই চিরন্তন মঙ্গলের প্রশ্নকেই সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য বলে রায় দিয়েছিলেন। ১৩২১ সালে লেখা বাস্তব বা ১৩২২ সালে লেখা কবির কৈফিয়ত সেই আনন্দবাদেরই তত্ত্ব প্রতিপাদন। এই তত্ত্ব চিন্তার মৌল পরিবর্তন তার পরেও হয়নি।

এরই মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের খোলা হাওয়া যে ভাবে ঢুকে পড়ছিল তাতে সাহিত্যে দুটো প্রশ্ন গুরুতর হয়ে উঠেছিল। প্রথমটি সাহিত্যে বস্তুসত্যের বিবরণ দেওয়ার প্রশ্ন আর দ্বিতীয়ত সাহিত্যে মানুষের বাস্তব স্থূল ভোগজীবনের কামনাবাসনার প্রশ্ন। এই দুটি প্রশ্নের উত্থাপন যারা করেছিলেন তাদের দাবী খুব দুর্বল ছিল না। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধে এই দুই প্রশ্ন এবং তার সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের বেআব্রু আমদানী নিয়েও কথা বলতে হয়েছিল। এবং ক্রমে রবীন্দ্রনাথের পুরানো বিশ্বাসের দুর্গে কোন বড় ফাটল না ধরলেও তাঁর তত্ত্ব চিন্তায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রমাণও এই 'সাহিত্যের পথে' বইতে আছে।

আধুনিকেরা বাংলা কাব্য সাহিত্যে যেসব নূতন সুর আনতে চেয়েছিলেন শিশির কুমার দাস তাকে খুব মৌলিক বলে মানতে রাজী হন না। " It was not that they were ideologically opposed to Tagore except that none of them had shared his optimism and faith in God ." (A History of Indian Literature, 1911 - 1956, Sahitya Academy, New Delhi, 1995, P - 215) আধুনিকেরা শিল্পে নীতির প্রশ্ন এবং পুরানো বিশ্বাসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এনেছিলেন। ফ্রয়েড বিশেষ করে এবং কিছু কিছু সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্ব তাঁদের সহায়ক হয়েছিল। আধুনিক কবিতার পক্ষে এই দুই মতাদর্শ অত্যন্ত উপযোগী হয়ে উঠেছিল।

বুদ্ধদেব একদিকে ছিলেন শিল্পের জন্য নিবেদিত প্রাণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত অথচ সেই রবীন্দ্রনাথকেই শিল্পের জন্য ছেড়ে সরে আসতে হয়েছে তাঁকে। আর এই কারণেই দেখি তাঁর সমস্ত শিল্পী সত্তার একটি অনুপ্রেরণা তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবনের লক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে - তাকে বলতে পারি আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি যখন 'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনা লিখেছেন সে লেখায় একমাত্র প্রশ্ন ছিল আধুনিক কাব্যের নিরিখে 'মেঘদূতে' র কাব্যমূল্য বিচার। যেভাবে তিনি 'মেঘদূতে' র মৌল কাব্য ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন তা একালের জীবনাদর্শের দিক থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না। 'রামায়ণ' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন বুদ্ধদেব তুলেছেন তারও মূলে আধুনিকতার একটি মূল প্রশ্ন নিহিত আছে। রাবনের সীতা হরণের উদ্দেশ্য নিয়ে সত্যিকারের কোন সমাধান কোন জায়গায় নেই। অথচ তার উচ্চারিত মীমাংসার চেষ্টাও দেখা যায় না। সূর্পনখার অপমানে ব্যথিত রাবণ সীতাহরণ করতে পারেন কিন্তু মহাকবি তার পরবর্তী কোন সম্ভবনা

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। এপ্রশ্ন সম্ভবত অনুচ্চারিত থাকাই ভালো বলে অনেকেই মনে করেছেন। বুদ্ধদেবের পক্ষে এপ্রশ্ন তোলা একালের ফ্রয়েডীয় চিন্তানুষঙ্গেই সম্ভব। এজন্য তাঁর মধুসূদন বিচারে লেগেছে কিঞ্চিৎ অনুযোগের সুর। তাঁর আধুনিকতা হয়ে গিয়েছে ছায়াময় এবং তাঁর রচনাবলীও হয়েছে প্রথানুবর্তনের দলিল । বস্তুত মধুসূদনের কবি ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের আত্মিক যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু। একদিকে এই বাস্তব সম্মত জীবন ধর্মের জন্য তাঁর মনের টান অন্যদিকে সেই মনেরই অভ্যন্তরে অন্য এক অধরা পিপাসা তাঁকে নিয়ত চালনা করে গেছে। সেই জন্য তিনি সহজ প্রাকৃত জীবনের ভিতর থেকে খুঁজতে খুঁজতে চলেছেন সেই চেতনা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন কবিতা রচনা জড়ের সঙ্গে আত্মার দ্বৈরথ। এই অনবচ্ছিন্ন দ্বৈরথই কবির নিয়তি। মনে হয় বোদলেয়ার ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর অনুপ্রেরণাদাতা। যখন বোদলেয়রের কাব্য অনুবাদ করেছেন কিংবা তাঁর কবিতার ভূমিকা লিখেছেন তখন তিনি শিখে নিয়েছেন এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের মন্ত্র। এইভাবে শিল্পী বুদ্ধদেব প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যে জীবনে এসে পৌঁছেছেন সে জীবন একান্ত নাগরিক । আধুনিক কবিতার প্রকৃতি প্রবন্ধে এই যুদ্ধেরই চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। বুদ্ধদেবের যে নাগরিক মনোদর্শন সে দর্শন তাঁর রুচিতে তাঁর বিচারে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। আবার এই ফরাসী কবির সঙ্গে যখন জার্মান কবি রিল্কে আসেন তখন কবি ও তাঁর কাব্যদর্শনের মধ্যে ফুটে ওঠে এক অনাস্বাদিত শুদ্ধতার শিল্পমন্ত্র । বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেবই বোধকরি প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে লেখাকে একটা পেশা হিসেবে গ্রহণ করবার দাবী করেছিলেন। ' লেখার ইস্কুল ' সেরকম একটি প্রবন্ধ। সেদিন এরকম দাবী প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত অন্যহ্য বিবেচনা করেছিলেন। এইরকম সর্বতোভাবে সাহিত্য রচনার কাজকে গ্রহণ করার মানসিকতার মধ্যেও এই আধুনিককালের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যে আধুনিকতার একটি বড় লক্ষন ছিল সাহিত্যকে কেবল সাহিত্য হিসেবে দেখা। Abrams' তাঁর 'Mirror' and the Lamp' গ্রন্থে একে objective theory বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেবের সমালোচনার একটি বড়দিক হলো এইযে সাহিত্যকে তিনি শব্দবন্ধের ভিতরে তার নানা কৃতির মধ্যে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তাঁর লেখায় শব্দ আর অর্থের এক নিবিড় দ্যোতনার সন্ধান সবসময়ই থেকে যায় আর এই অর্থময়তার বাইরে থাকে শব্দের ধ্বনি ও ছন্দের রূপ বিন্যাসের আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিচারে সেই কারণে তিনি প্রথম পর্বের কাব্যশিল্পের অধিক গুণগ্রাহী । বুদ্ধদেবের লেখায় রূপের মধ্যে সৌন্দর্য সন্ধান তাঁর সৌন্দর্য চিন্তার একটি বড় দিক। রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে এনে এখানে একটি প্রসঙ্গের কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিকেরা সরে যেতে চেয়েছিলেন — বুদ্ধদেবও তাই। তবু তাঁকে তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্য বিচারের যে ধারা তাতে এই রূপবিন্যাসের যে তত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা থেকে তা অনেক আলাদা। একথা ঠিক ' সাহিত্যের পথে ' গ্রন্থে সাহিত্যকে তিনি রূপ সৃষ্টি বলেছেন কিন্তু মনে হয় তার পিছনে সমকালীন প্রণোদনা ছিল একটা বড় দিক। সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব যে আধুনিকতা প্রবর্তনের কাজ করেছেন তার একদিকে আছে সমকালীন বাংলা

সাহিত্যের পর্যলোচনা করে তার মধ্যে সেই আধুনিকতার ধর্মকে পরিস্ফুট করা এবং তাকে বলবান করা। আর এই কাজে তিনি আধুনিক সাহিত্যের ভালো লেখার সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচয়সাধন করে তার মফস্বলী চরিত্রকে নাগরিক বিস্তার দেবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের চিন্তা বারে বারে প্রতিহত হয়েছে। আগেই বলেছি তিনি নিজে রবীন্দ্রপ্রভাবিত কবি হয়েও বার বার রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। আর তাঁর লেখায় রবীন্দ্রপ্রভাবের দুর্মর ছাপ দেখে ছিলেন হিরণ কুমার সান্যাল । শেষ দিকে তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনা নিয়ে বিতর্ক দুই রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব নিয়েও প্রবল আলোড়ন হয়েছিল। এতে মনে হয় আপাতভাবে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র চিন্তার মধ্যে কোথাও দ্বিধা ছিল। তবে আমাদের ধারণা প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই ছিল তাঁর মনের সমর্থন। যেহেতু বিশুদ্ধ কাব্যবাদী শিল্পী তিনি, তাই পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁকে তেমন আগ্রহান্বিত করে নি। এই কারণে নূতনকালের বিচারেও বুদ্ধদেব আর বেশীদূর গ্রাহ্য হননি। নূতনকালের কবিতায় এসেছিল সচেতন সমাজদ্রোহ। অথচ সমাজকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ভাবতে তিনি তেমন রাজী ছিলেন না । ফলে সাহিত্যের নিত্যগত প্রশ্নগুলি থেকে যখন সরে গিয়ে তা সমাজ বিপ্লবের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হলো তখন বুদ্ধদেবের সমালোচনা প্রবন্ধগুলি সীমাবদ্ধ সাহিত্য পরিসরে নিবদ্ধ হয়ে রইল।

গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা)

'অ'

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, কলিকাতা এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম আধুনিক সংস্করণ ১৩৫৭

অমলেন্দু বসু, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭১

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী, ১৯৯৭

অমিয় চক্রবর্ত্তী, সাম্প্রতিক, কলকাতা, নাভানা, ১ম প্রকাশ - মে, ১৯৬৩

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭২

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাংলাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা ঃ বাংলা ছোটগল্পের নব্বুই বছর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫

অরুণ কুমার সরকার, তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী, কলিকাতা, প্যাপিরাস, নভেম্বর, ১৯৮১

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বাতায়ণ, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৭০

অলোক রায়, বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা, কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৮১

অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় কলকাতা, সিগনেট বুক শপ, অগ্রহায়ণ - ১৩৮১

অশ্রুকুমার সিকদার, প্রতিবাদের পুরাণ, কলকাতা, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি, জানুয়ারী, ১৯৯২।

অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ১৯৭৭

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী

অসিত কুমার ভট্টাচার্য, বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, কলকাতা, গ্রন্থ জগৎ, ১৯৬৪

'আ'

আজহার উদ্দীন খাঁন, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৮

আদিত্য ওহদেদার, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, কলকাতা, এভারেস্ট বুক হাউস, ১৩৬৬

আনন্দ রায় (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, কলিকাতা বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮

আবুসয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২য়রা অক্টোবর, ১৯৭৩

আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৬৮।
আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সংকলিত ও সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৩৮৪।
আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনা সম্ভার (১ম খণ্ড), হরফ প্রকাশণী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৭।

'উ'

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, কলিকাতা, সংস্কৃতি প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ১৩৭৫।

'ক'

ডঃ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার, কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, আগস্ট, ১৯৮০।
কাজল চক্রবর্ত্তী (সম্পাদিত), প্রামাণ্য বুদ্ধদেব বসু, সাংস্কৃতিক খবর, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯১।
কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত মহাভারত, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৪।

'খ'

ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৬৫।

'গ'

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলার কথাসাহিত্য, কলকাতা, অভী-প্রকাশন, ১৩৮০।
গৌতম ভট্টাচার্য, কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৯২।
গৌতম ভট্টাচার্য, 'কল্লোলে' রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, প্যাপিয়াস, ১৩৯৪।

'চ'

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যের কথা, কলকাতা রূপা অ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৬৪।

'জ'

জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।
জগন্নাথ ঘোষ, নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা, শিশিরকুমার ভাদুড়ি ইনস্টিটিউট অফ ড্রামাটিক রিসার্চ অ্যান্ড কালচার, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৮।
জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১ম সংস্করণ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬২।
জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১ম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৭।

জীবনানন্দ দাশ, বনলতা সেন, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, আষাঢ় ১৩৯৩।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, আধুনিক কবিতার মানচিত্র, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা জুলাই, ১৯৮৬।

জীবেন্দ্র সিংহরায় (সম্পাদিত), আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনার রূপরেখা ঃ বঙ্কিমপর্ব, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১লা আগস্ট, ১৯৮৬।

'ত'

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অণ্বেষণে, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, অক্টোবর, ১৯৮৮।

তাপস বসু (সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশ ও সমকালীন ভাবনাক্রম, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, অক্টোবর, ১৯৮৭।

'দ'

দীনেশ চন্দ্র সেন, রামায়ণী কথা, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩১০।

ডঃ দীপক দে, সাহিত্য কি ?, কলকাতা নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, মে ১৯৮২।

দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৫৮।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সাহিত্য ও শিল্পলোক, কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ শ্রাবণ, ১৩৬৮।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (সম্পাদিত) মোহিতলাল মজুমদার ঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮২।

'ধ'

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বিষ্ণুদে প্রবন্ধসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৯৭।

ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বিষ্ণুদে ঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী, ১৯৯৮।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার আধুনিকতাও শব্দানুষঙ্গ, কলকাতা, রত্নাবলী, জুন ১৮৮৫।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় একালের বাংলা কবিতা ঃ নিবিড় পাঠ পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

'ন'

নজরুল ইস্‌লাম, সঞ্চিতা, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯২৮।

নরেশ গুহ (সম্পাদিত), কবিতাসংগ্রহ, অমিয় চক্রবর্ত্তী, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৭৯।

নরেশ গুহ (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩।

নিরঞ্জন হালদার (সম্পাদক), সুধীন্দ্রনাথ, (সম্পাদিত), কলকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১ম প্রকাশ, জুন, ১৯৭৫।

'প'

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, মেঘদূত পরিচয়, কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, এপ্রিল ১৯৭৭।

পিনাকী ভাদুড়ি, উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮।

প্রতিভা বসু, স্মৃতি সততই সুখের, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৩।

প্রবাস জীবন চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৬৩।

প্রভাতকুমার দাস, 'কবিতা' পত্রিকার সূচিগত ইতিহাস, কলকাতা, প্যাপিরাস, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

প্রমথ নাথ বিশী, রবীন্দ্র-সরণী, কলিকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জৈষ্ঠ ১৩৯২।

প্রমথ নাথ বিশী, মাইকেল মধুসূদন, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮।

'ব'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্রজ পাবালিকেশন, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৮৩।

বার্ণিক রায়, কবিতা ঃ চিত্রিতছায়া, কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম প্রকাশ, মহালয়া, ১৩৭৮।

বিনয় ঘোষ, নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৮১।

ডঃ বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক, কলিকাতা, পাইয়নীয়ার পাবলিশার্স, ২৮শে জুন, ১৯৮৭।

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৯৬।

বিষ্ণুদে, জনসাধারনের রুচি, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৭৫।

বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলকাতা, প্রতিভাস ১৯৬৬

বিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯।

বিষ্ণু দে, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাস, কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৬৭।

বুদ্ধদেব বসু, জাপানী জার্নাল, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, বৈশাখ, ১৩৬৯।

বুদ্ধদেব বসু, শার্ল বোদালয়ার ঃ তাঁর কবিতা, কলকাতা, নাভানা, মাঘ ১৩৬৭ (১ম প্রকাশ)।

বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আধুনিক বাংলা কবিতা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪।

বুদ্ধদেব বসু, উত্তর তিরিশ, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, আগস্ট, ১৯৮৭।

বুদ্ধদেব বসু, আমার যৌবন, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম প্রকাশ

এপ্রিল, ১৯৭৭

বুদ্ধদেব বসু, কবিতার শত্রু ও মিত্র, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪

বুদ্ধদেব বসু, রচনা সংগ্রহ (১-৯), কলিকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃলিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৪

বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য, কলিকাতা নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, ১ম প্রকাশ, মে, ১৯৫৫

বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৫৪

বুদ্ধদেব বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন, ১৯৬৬

বুদ্ধদেব বসু, দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা, এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, ১৯৬৩

বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী, ১৯৫৯

বুদ্ধদেব বসু, কালিদাসের মেঘদূত (অনূদিত), কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮

বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ, ১৯৭৪

বুদ্ধদেব বসু, ২২শে শ্রাবণ (এক পয়সায় একটি), কলকাতা, কবিতা ভবন, ১ম সংস্করণ আগস্ট, ১৯৪২

বুদ্ধদেব বসু, সঙ্গঃনিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২

বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২

বুদ্ধদেব বসু, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

বুদ্ধদেব বসু (অনূদিত), রিলকের কবিতা, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭০

বুদ্ধদেব বসু, হ্যোল্ডার্লিনের কবিতা (অনূদিত), কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বুদ্ধদেব বসু, হাউই (অনূদিত) সিগনেট প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

বুদ্ধদেব বসু, সব পেয়েছির দেশে কলকাতা নাভানা ১৩৬০

বুদ্ধদেব বসু, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ দ্র. রচনাবলী ৫ম খণ্ড

বুদ্ধদেব বসু, যে আঁধার আলোর অধিক, এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬৬

বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ (ভূমিকা অংশ), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬২

'ভ'

ভবতোষ দমত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৩৯০

ভবতোষ দত্ত ও আজহার উদ্দীন খাঁন (সম্পাদিত), মোহিতলাল মজুমদারের পত্রগুচ্ছ, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯

'ম'

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাসাহিত্য, কলিকাতা, নবমন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৯

মঞ্জুভাষ মিত্র, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১ম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৮৬।

মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫।

মাহবুব সাদিক, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ঃ বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মার্চ, ১৯৯১।

মীনাক্ষী দত্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), ডাক্তার জিভাগো, কলকাতা প্যাপিরাস, নভেম্বর, ১৯৯০।

মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রী মধুসূদন, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ আগস্ট, ১৯৬৫।

মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য বিতান, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ এপ্রিল, ১৯৭৪।

'র'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র - ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৌষ, ১৩৫২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মাঘ, ১৩৪৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনারতরী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১ম সংস্করণ - ১৩০০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড ঃ প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ, ১৩৮৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র, ১৩৬১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩১৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৫।

'শ'

শঙ্খ ঘোষ, ছন্দোময় জীবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা বৈশাখ, ১৪০০।

শঙ্খ ঘোষ, শব্দ আর সত্য, কলকাতা, প্যাপিরাস, ৭ই মার্চ, ১৯৮২।

শিশির কুমার দাশ, কবিতার মিল ও অমিল, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭।

'স'

সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৩৮৪।

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৬।

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা, কলিকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৬৬।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, জৈষ্ঠ্য, ১৩৮১।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম প্রকাশ, ১লা আষাঢ়, ১৩৭৯।

সমীর সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৮।

সরোজ কুমার দত্ত (অনূদিত) শিল্পীর নবজন্ম, অগ্রনী বুক ক্লাব, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮৩।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতার কালান্তর, কালকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০ সাল।

সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকান্ত, সমগ্র, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৪।

শ্রী সুকুমার সেন, 'মেঘদূত', কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য় খণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২৫শে মার্চ, ১৯৯১।

সুতপা ভট্টাচার্য, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭।

সুদক্ষিণা ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডিমী, ২০শে মে, ১৯৯৭।

সুদীপ বসু, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১০ই মার্চ, ১৯৯৭।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কুলায় ও কালপুরুষ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪।

সুব্রত রুদ্র, প্রবন্ধকার জীবনানন্দ, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, ৬ই ফেব্রুযারী, ১৯৮৫।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মাঘ, ১৩৭৬।

সুমিতা চক্রবর্ত্তী, জীবনানন্দ দাশ ও সমকালীন ভাবনাক্রম, কলিকাতা, পুস্তক বিপনি, অক্টোবর, ১৯৮৭।

সুমিতা চক্রবর্ত্তী, জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ - মার্চ, ১৯৮৭।

ডঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রকরণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, শার্ল বোদলেয়ার ঃ অনন্য দ্রষ্টা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৯২।

সুশীল রায় (সম্পাদিত), বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ, কলকাতা। নাভানা, ১ম সংস্করণ - জুন, ১৯৭৬।

শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) মার্কসবাদ ও নন্দন তত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

সোনামণি চক্রবর্ত্তী, শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ১৯৮৫।

'হ'

হরপ্রসাদ মিত্র, সাহিত্য বিচিন্তা, কলিকাতা, এস্. ব্যানার্জী, অ্যান্ড কোং ।

হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ এবং ....., কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ভাদ্র, ১৪০৬।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অনূদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, ভারবি, ১৯৭৫

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজী)

Dr. Arun Kr. Mukhopadhaya, Pramatha Chowdhury, Calcutta, Sahitya Academy.

Amiya Chakraborty, Modern Tendencies in English Literature, Calcutta Book Exchange, 1942.

Buddhadev Bose, An Acre of Green Grass' Calcutta, Papyrus, 1948

Buddhadev Bose, Tagore : portrait of a poet, Calcutta, Papyars, April 1962.

Boris pasternak, Doctor Zivago. Ballantine Books, New York, 1st edition, March 1981.

David Daiches, Critical Approaches to Literature Calcutta Orient, Longman, 1989.

Frank Kermode, Selected Prose of T.S. Eliot (Edited), London-Boston, Faber and Faber, 1st published in 1975

M.H. Abrams, Mirror and the Lamps, W.W. Norton and Co., T.N.C., 1958

M. winternitz, A History of Indian Literature, Vol-1, Part-II, Calcutta, Calcutta University Press, 1978.

Robert Scholes and Robert Kellog, The Nature of Narrative, London, OUP, 1968.

Suniti Kumar Chatterjee, World Literature and Tagore, Calcutta, Visva Bharati Publishing dept., 1971.

T.S. Eliot, To Criticize the Critic, Faber and Faber, London, Boston, 1965.

T.S. Eliot, On Poetry and Poets. London, Faber and Faber, 5th Impression 1969.

William Henry Hudson, An Introduction to the Study of Literature, Ludhiana, Lyall Book Depot, March, 1960.

পত্র-পত্রিকা

অনুষ্টুপ, সমর সেন বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮।

অন্বেষা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা ১৯৮১।

'উত্তরাধিকার', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪-এর নভেম্বর - ডিসেম্বর সংখ্যা ।

'কবিতা' সপ্তম - অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮ - জানুয়ারী ১৯৬৯।

'কবিতা' সংকলন-১, বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), মীনাক্ষী দত্ত (সংকলিত), কলিকাতা, প্যাপিরাস, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

'কবিতা', সংকলন-২ বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), মীনাক্ষী দত্ত (সংকলিত), কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৫।

'কবিতা', সংকলন-৩ বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), মীনাক্ষী দত্ত (সংকলিত), কলিকাতা, প্যাপিরাস, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৯।

কবিতীর্থ, উৎপল ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আষাঢ়, ১৩৬৪, বর্ষ-২১, সংখ্যা-৪।

'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিণ ১৩৬৩, বর্ষ-২১, সংখ্যা-১।

'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), চৈত্র ১৩৬২, বর্ষ-২০, সংখ্যা-৩।

'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), চৈত্র ১৩৪৫, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৪।

'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), পৌষ ১৩৬১, বর্ষ-১৯, সংখ্যা-২।

'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), পৌষ, ১৩৪২, বর্ষ-১, সংখ্যা-২।

বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯, সম্পাদক শেখর বসুরায়, কলকাতা, মুদ্রক, দীপ প্রকাশন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস (সংকলন), ১ম খণ্ড।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ১২ শবর্ষ, মাঘ-চৈত্র / ১৩৮০, জানুয়ারী - মার্চ, ১৯৭৪ ১ম এবং দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮০-৮১ (সম্পাদিত) রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা।

'দেশ', ১৩৬৬, বৈশাখ-শ্রাবণ যুগ্ম সংকলন সাহিত্য সংখ্যা।

'দেশ', ১৩৮৫, সাহিত্য সংখ্যা।

'দৈনিক কবিতা' পঞ্চম সংখ্যা, ২৯ শে বৈশাখ, ১৩৭৩।